হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী

Bangla E-Library

হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী

১২

সম্পাদনায়

গীতা দত্ত
সুখময় মুখোপাধ্যায়

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ॥ কলকাতা-সাত

সূচীপত্র

অমানুষিক মানুষ / ৯
ছোট্ট পমির অভিযান / ১১৯
ভগবানের চাবুক / ১৮১

অমানুষিক মানুষ

হেমেন্দ্র—১২/১

প্রথম

শিকারীর স্বর্গে

কলের গাড়ি, কলের জাহাজ, উড়োজাহাজ আর হাওয়াগাড়ির দৌলতে দুনিয়ার কোন দেশই আজ আর অজানা নয়। ভূগোল সারা পৃথিবীর কোন দেশের কথাই বলতে বাকি রাখে নি। পৃথিবীর বাইরে মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহেরও মানুষ জীব আবিষ্কার করেছে। পণ্ডিতদের বিশ্বাস, ত্রিভুবন আজ তাঁদের নখদর্পণে।

পণ্ডিতদের বিশ্বাসকে অবহেলা করছি না। কিন্তু তবু আমি বিশ্বাস করি যে, পণ্ডিতদের জ্ঞান-রাজ্যের বাইরে এখনো এমন সব অজানা, অচেনা দেশ আছে, ভূগোলে যার কথা লেখা হয় নি। এ-কথার উত্তরে ইস্কুলের মাস্টার-মশাইরা হয়তো আমাকে রুখে বকতে আসবেন—কিন্তু তার আগেই তাঁরা যদি দয়া করে আমার এই আশ্চর্য ইতিহাস শোনেন, তাহলে অত্যন্ত বাধিত হব। মুখের কথায় সত্যকে অস্বীকার করলেও, উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

লোকে বাঙালীকে কুনো বলে। আমার মতে, বাঙালী সাধ করে কুনো হয় নি, কুনো হয়েছে—বাধ্য হয়ে। ভারতবর্ষের আর-সব জাতি পেটের ধান্দায় যত সহজে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে, বাঙালীরা তা পারে না কেন? বাঙালির আত্মসম্মান-জ্ঞান বেশি বলে। উড়িয়ারা বিদেশে গিয়ে পালকি বইতে বা মালী কি বেয়ারা হতে একটুও দ্বিধা-বোধ করে না। মাড়োয়ারিরা কলকাতায় এসে মাথায় ঘিয়ের মটকা, খাবারের থালা বা কাপড়ের মোট নিয়ে পথে-পথে ফিরি করতে লজ্জা পায় না। ভারতের আরো অনেক বড় জাতির লোকেরা ফিজি দ্বীপে, আফ্রিকায় বা দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়ে অম্লানবদনে কুলিগিরি করে।

এইখানে বাঙালীর বাধে। ছোট কাজে সে নারাজ। অন্য জাতের লোকেরা পরে বড় হবার জন্যে আগে ছোট হতে অস্বীকার করে না, কিন্তু বাঙালি বড় হবার লোভেও বিদেশিদের কাছে সহজে মাথা নিচু করতে চায় না। ফিরিওয়ালা হব? কুলিগিরি করব? রামচন্দ্র! এই হল বাঙালিজাতের মনের ভাব। মান বাঁচিয়ে বাঙালি 'কুনো' অপবাদও সইতে রাজি।

তাই আফ্রিকার অনেক জায়গায় গিয়ে ভারতের নানাদেশি লোকদের মধ্যে যখন বাঙালির সংখ্যা দেখলুম খুবই কম, বিশেষ বিস্মিত হলুম না। ভারত থেকে এখানে যারা এসেছে, তাদের অধিকাংশই ভদ্রলোকের কাজ করে না। বাঙালিরা তাদের দলে ভিড়তে চাইবে কেন?

আমিও বাঙালী হয়ে আফ্রিকায় কেন গিয়েছি, এ-কথা তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো। কিন্তু আমার জবাব শুনলে বোধকরি একটু আশ্চর্য হবে। কারণ, আফ্রিকায় চাকরি, কুলিগিরি বা দোকানদারি করতে যাই নি,—আমি গিয়েছিলুম, শিকার করতে।

ভারি আমার শিকারের সখ! অর্থও আছে, অবসরও আছে,—কাজেই ভালো করেই সখ মিটিয়ে নিচ্ছি। ভারতের বনে-জঙ্গলে যত-রকম পশু আছে, তাদের কোন নমুনাই সংগ্রহ করতে বাকি রাখি নি। এবারে হিপোপটেমাস, গরিলা আর সিংহেরা আমার বন্দুকের সামনে আত্মদান করে ধন্য হতে চায় কিনা, তাই জানবার আগ্রহেই আফ্রিকায় আমার শুভাগমন হয়েছে।

বাংলাদেশ তার বাঘ, হাতি, গোখরো সাপ ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুর জন্যে কম বিখ্যাত নয়। পৃথিবীর সব দেশের শিকারীর কাছেই আমাদের সুন্দরবন হচ্ছে স্বর্গের মত। সুন্দরবনের ভিতরে আমিও আমার জীবনের অনেকগুলো দিন কাটিয়ে দিয়েছি সুন্দর ভাবেই। তার অগণ্য জলাভূমি, অসংখ্য নদ-নদী, স্নিগ্ধশ্যাম বনভূমি, নির্জন বালুদ্বীপ, বিজনতার মাধুর্য ও সোঁদা মাটির সুগন্ধ এ-জীবনে কোনকালে ভুলতে পারব না। সেখানে জলের কুমীর গাছের অজগরকে দেখতে পেয়ে বিফল আক্রোশে ল্যাজ

আছড়ায়, সেখানে নলখাগড়ার বনে-বনে হল্‌দে-কালো ডোরা-কাটা বিদ্যুতের মত রয়েল বেঙ্গল টাইগার ছুটোছুটি করে, সেখানে স্যাঁৎসেতে মাটি থেকে বিষাক্ত বাষ্প বা কুয়াশা সুঁদ্‌রী-গাছের মাথা ছাড়িয়ে উঠে আকাশকে আচ্ছন্ন করে দেয়! সুন্দরবনের ভিতরে আসতে না পারলে যে-কোন শিকারীই তার জীবন ব্যর্থ হল বলে মনে করে।

কিন্তু আফ্রিকার বিপুল অরণ্যও হচ্ছে শিকারীর পক্ষে আর-এক বিরাট স্বর্গ। সুন্দরবন তার কাছে কত ক্ষুদ্র! পশুরাজ সিংহ, হস্তী, গণ্ডার, হিপো, জিরাফ, জেব্রা, চিতা, লেপার্ড, প্যান্থার, গরিলা, বেবুন, শিম্পাঞ্জি, ম্যান্‌ড্রিল, বরাহ, নু, উট, উটপাখি, ওকাপি, বনমহিষ, নানাজাতের হরিণ, বানর ও কুমীর—আফ্রিকাকে বিশেষ করে মস্ত এক পশুশালা বললেই হয়, এত পশু পৃথিবীর আর কোথাও একত্রে পাওয়া যাবে না।

আফ্রিকার যে-তিনটি জীবের সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে আমার সবচেয়ে বেশি ঝোঁক, তারা হচ্ছে—গরিলা, সিংহ ও হিপোপটেমাস।

সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে আজকাল আফ্রিকার অত্যন্ত গভীর অরণ্যও মানুষের পক্ষে সুগম হয়েছে। বনের ভিতর দিয়ে ভালো-ভালো পথ ও তাদের উপর দিয়ে ছুটছে বড়-বড় মোটরগাড়ি। আগে তিন বছরেও আফ্রিকার যতটা দেখা যেত না, এখন তার চেয়ে বেশি দেখতে গেলেও তিন মাসেই কুলিয়ে যায়। পদে-পদে যে অজানা বিপদের আনন্দে আগেকার শিকারীদের জীবন হয়ে উঠত বিচিত্র, স্থলে মোটরের ও জলে কলের-নৌকার আবির্ভাবে সে-আনন্দ আজ অনেকটা কমে গেছে। আজকাল কেউ-কেউ আবার উড়োজাহাজে চড়েও আফ্রিকায় যান 'শিকারী' বলে নাম কেনবার জন্যে। এতে যে শিকারের কি আমোদ আছে, সেটা তাঁরাই জানেন! তার চেয়ে তাঁরা তো পশুশালায় গিয়েও বাঘ, সিংহ, গণ্ডার মেরে আসতে পারেন। বিপদহীন শিকার, "শিকার" নামেরই যোগ্য নয়!

কিন্তু কঙ্গো-প্রদেশের কাবেল নামক জায়গায় এসে এ-যুগেও আর

মোটরগাড়ির যাত্রী হওয়া যায় না। এখান থেকে আমি কাফ্রী-কুলিদের মাথায় মোটঘাট চাপিয়ে, পায়ে হেঁটে কঙ্গোর ভিতরদিকে প্রবেশ করলুম—বেশ-কিছুকালের জন্যে সভ্যতার কাছে বিদায় নিয়ে। গরিলা বা হিপো বা সিংহের কবলে পড়ে এ-বিদায়—চিরবিদায় হবারও সম্ভাবনা আছে।

যাত্রাপথে পড়ল বুনিয়নি হ্রদ। এ যে কি সুন্দর হ্রদ, ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। টলটলে নীল জল, ধারে ধারে জলের ভিতর থেকে জেগে উঠছে শরবন। নীল জলের পটে জীবন্ত আঁকা-ছবির মত বড় বড় পদ্ম, তাদের গায়ে মাখানো লালাভ ল্যাভেণ্ডারের রং। তেমন বড় পদ্ম ভারতে ফোটেনা—আকারে তাদের প্রত্যেক মৃণাল দশফুটের কম হবে না এবং তা নারকেল-দড়ির মতো শক্ত। হ্রদের তীর থেকে উঠেছে তৃণশ্যামল উচ্চভূমি, য়ুফোর্বিয়ায় খচিত।

বাংলাদেশের অরণ্য সুন্দর বটে, কিন্তু এমন বিচিত্র নয়। এখানে বনের সঙ্গে সঙ্গে আছে পাহাড়, উপত্যকা, ঝরণা ও হ্রদ, সুন্দরবনে যা নেই। প্রতি পদেই নতুন নতুন দৃশ্য এবং নতুন নতুন বিস্ময়। দিনের পর দিন বনের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি, কিন্তু নতুনত্বের পর নতুনত্বের আবির্ভাবে মনের মধ্যে এতটুকু শ্রান্তি আসছে না!

কিন্তু এখানকার সমস্ত সৌন্দর্যের সঙ্গে মেশানো আছে যেন কোন অভাবিত বিপদের অপচ্ছায়া! মধুর রূপ দেখলেও এখানে কবিত্ব উপভোগ করতে হয় পরম সাবধানে, কবিত্বে বিহ্বল বা একটু অন্যমনস্ক হলেই সর্বনাশের সম্ভাবনা!

একদিন সন্ধ্যার সময়ে একটা নদীর ধারে আমরা তাঁবু ফেললুম। একে সারাদিনের পরিশ্রমে অত্যন্ত শ্রান্ত হয়েছি, তায় সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, তাই কোন্ জায়গায় তাঁবু ফেলা হল সেটা আর লক্ষ্য করবার অবসর ও উৎসাহ হল না। কিন্তু এইটুকু অসাবধানতার জন্যেই সেদিন যে-অঘটন ঘটল, তা ভাবতে আজও আমার গা শিউরে ওঠে!

রাত্রে তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে ক্যাম্প-খাটে শুয়ে

পড়লুম এবং ঘুম আসতে বিলম্ব হল না। জীবনের অধিকাংশই আমার কেটে গিয়েছে পথে-বিপথে, তাই যেখানে-সেখানে খুশি আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারতুম।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম জানিনা, কিন্তু এইটুকু মনে আছে, কি যেন একটা সুখস্বপ্ন দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল!

ঘুমের ঘোর ভালো করে কাটতে না কাটতে শুনলুম, তাঁবুর বাইরে বিষম একটা হট্টগোল ও হুটোপুটির শব্দ!

ঘুমের ঘোর যখন একেবারে কাটল, সমস্ত গোলমাল তখন থেমে গেছে। তাঁবুর ভিতর ঘুটঘুটে অন্ধকার। বসে বসে ভাবতে লাগলুম, গোলমালটা শুনলুম কি স্বপ্নে?

কিন্তু তারপর যা হল সেটা স্বপ্ন নয় নিশ্চয়ই। আমার ডানদিক থেকে খুব জোরে ভোঁস করে একটা আওয়াজ হল!

তাড়াতাড়ি 'টর্চ'টা তুলে নিয়ে জ্বেলেই দেখি, তাঁবুর কাপড়ের দেওয়াল দুলছে!

ঠিক সেই সময়ে আমার বাঁদিক থেকেও তেমনি ভোঁস করে একটা বেজায় শব্দ উঠল—সঙ্গে সঙ্গে সেদিকেও তাঁবুর গা দুলতে লাগল!

ব্যাপার কি? এ কিসের শব্দ? তাঁবু এমন দোলে কেন?

হতভম্ব হয়ে ভাবছি, এমন সময়ে দুইদিক থেকেই আবার দুই-তিন-বার তেমনি শব্দ হল ও তাঁবু ঘন-ঘন কাঁপতে লাগল!

তখনি রাইফেলটা তুলে নিলুম। বাইরে ও কারা এসেছে? এমন শব্দ করে কেন? কী চায় ওরা?······

পরমুহূর্তে কী যে হল কিছুই বুঝতে পারলুল না,—আচম্বিতে যেন ভূমিকম্প উপস্থিত, মাথার উপরে যেন পাহাড় ভেঙে পড়ল! প্রচণ্ড এক ধাক্কায় আমি হাত-কয় দূরে মাটির উপরে ছিটকে পড়ে গেলুম।

অন্য কেউ হলে তখনি হয়তো ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যেত। কিন্তু বহুকাল আগে থেকেই বিপদের সঙ্গে আমার চেনাশোনা, বহুবারই সামনে দেখেছি সাক্ষাৎ মৃত্যুকে, তাই আহত ও আচ্ছন্ন অবস্থাতেই মাটির উপরে পড়েই

আবার সিধে হয়ে উঠে বসলুম !

অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় অবাক হয়ে দেখলুম, দূরে সাদা-মতো প্রকাণ্ড কি-একটা দুম-দুম করে চলে যাচ্ছে—অনেকগুলো পায়ের ভারে পৃথিবী কাঁপিয়ে এবং কোথাও আমার তাঁবুর চিহ্নমাত্র নেই !

ফ্যাল-ফ্যাল করে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চারদিকে তাকাতে লাগলুম, কিন্তু এপাশে ওপাশে, সামনে পিছনে—আমার তাঁবু নেই কোথাও !

অনেক কষ্টে উঠে খোঁড়াতে খোঁড়াতে কয়েক পা এগিয়ে দেখি, এক-জায়গায় কতকগুলো ভাঙা কাঠ ও ছেঁড়া স্থাকড়া পড়ে রয়েছে এবং পরীক্ষা করে বোঝা গেল, সেগুলো হচ্ছে আমারই ক্যাম্প-খাটের ধ্বংসাবশেষ !

আমার সঙ্গে ছিল ত্রিশজন কুলি ও চাকরবাকর, কিন্তু তারাও যেন কোন যাদুমন্ত্রে হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হয়ে মিলে গিয়েছে !

দূরে আবার অনেকগুলো ভারি ভারি পায়ের শব্দ শুনলাম। ফিরে দেখি একদল বড় বড় জীব আমার দিকেই এগিয়ে আসছে !

ভাগ্যে কাছেই একটা প্রকাণ্ড গাছ ছিল, চটপট তার উপরে উঠে বসলুম।

জীবগুলো আর কিছু নয়—একদল হিপো! তারা গদাইলশকরি চালে চলতে চলতে যেখানে আমার তাঁবু ছিল সেইখানে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, তারপরে প্রত্যেকেই দুই-একবার সেই ক্যাম্প-খাটের ভগ্নাবশেষকে ভোঁস ভোঁস শব্দে শুঁকে পরীক্ষা করে, এদিকে-ওদিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায় এবং তারপর নদীর দিকে চলে যায়।

এতক্ষণে ব্যাপারটা স্পষ্ট হল।

বন্য পশুদের জলপান করতে যাবার জন্যে এক-একটা নির্দিষ্ট রাস্তা থাকে—প্রত্যহই তারা সেই চেনা পথ ব্যবহার করে। এটা হচ্ছে হিপোদের জলপান করতে যাবার রাস্তা।

অন্ধকারে ও তাড়াতাড়িতে না দেখে আমরা আস্তানা গেড়েছিলুম হিপোদের এই নিজস্ব রাস্তার উপরেই !

হিপোদের গায়ের জোর ও গোঁয়ার্তুমি যেমন বেশি, বুদ্ধি-শুদ্ধি তেমনি কম। দুটো হিপো আগে এই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ পথের উপরে তাঁবু দেখে বিস্মিত হয়ে দাঁড়ায় এবং তাদের দেখে পালায় আমার লোকজনরা। তখন তারা দুজনে দুদিক থেকে ভোঁস ভোঁস শব্দে আমার তাঁবু শুঁকে হিপো-বুদ্ধিতে স্থির করে—এটা নিশ্চয়ই কোন বিপজ্জনক বস্তু বা জন্তু, নইলে কাল এখানে ছিল না, আর আজ কোথা থেকে উড়ে এসে নদীর পথ জুড়ে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে কেন? অতএব মারো ওটাকে জোরসে এক ঢুঁ!

কিন্তু ঢুঁ মারার সঙ্গে-সঙ্গেই সমস্ত তাঁবুটা যেই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে তাদের সর্বাঙ্গে জড়িয়ে ধরলে, অমনি সমস্ত বীরত্ব ভুলে নাদাপেটা হাঁদারামরা তাঁবু ঘাড়ে করেই অন্ধের মতো দৌড়ে পলায়ন করেছে!

বনের ভিতরে আনাচে-কানাচে এমনিধারা কত যে ধারণাতীত বিপদ সর্বদাই অপেক্ষা করে, তা বলবার কথা নয়! একবারমাত্র অসাবধান হলেই জীবনে আর কখনো সাবধান হবার সময় পাওয়া যাবে না।

পল গ্রেটেজ নামে একজন জার্মান সৈনিক আফ্রিকায় মহিষ শিকার করতে গিয়ে কি ভয়াবহ বিপদে পড়েছিলেন, এখানে সে গল্প বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মহিষ-শিকারের কথা শুনে কেউ যেন অগ্রাহ্যের হাসি না হাসেন। কারণ বন্য মহিষ বড় সহজ জীব নয়, অনেক শিকারীর মতে সিংহ-ব্যাঘ্রের চেয়েও তারা হচ্ছে বেশি সাংঘাতিক! ঘটনাটি মেজর ডবলিউ রবার্ট ফোরানের "Kill : or Be Killed" নামে শিকারের প্রসিদ্ধ পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে। এই সত্য গল্পটি গ্রেটেজ সাহেবের মুখেই শ্রবণ করুন, শিকারের এমন ভয়ানক কাহিনী দুর্লভ :

"আমি তখন রোডেশিয়ার বাংউয়েলো হ্রদে স্টিমারে করে যাচ্ছিলুম। আমার দলে ছিল ফরাসী আলোকশিল্পী অক্টেভ ফিয়ের, কাফ্রী পাচক জেমস ও আর চারজন দেশি চাকর।

সেদিন সকালে ডাঙায় নেমে আমরা প্রাতরাশ আহার করছি, হঠাৎ মুখ তুলে দেখেই বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলুম!

আমাদের কাছ থেকে হাত ত্রিশ তফাতেই তিনটে বন্যমহিষ স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আছে! তারা যে-সে জীব নয়, এমন বিরাটদেহ মহিষ আমি জীবনে কখনো দেখিনি! তারা যে ছায়ার মতো নিঃশব্দে কখন সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, আমরা কেউই তা টের পাই নি।

দুই-এক মুহূর্তের জন্যে আমরা সকলেই নীরব হয়ে রইলুম। এ নীরবতা যেন মৃত্যুরই অগ্রদূত—জীবন ও পৃথিবী যখন শ্বাস রোধ করে থাকে!

পরমুহূর্তেই আমি আমার 'মসার' রাইফেলটা তুলে নিলুম। এবং আমার দেখাদেখি ফিয়েরও তাই করলে। কারণ এই মহিষ তিনটে যদি আগে থাকতে হঠাৎ আক্রমণ করে তাহলে আমাদের কারুরই আর রক্ষা নেই!

আমি বন্দুক ছুঁড়লুম—গাছের পাখিদের শশব্যস্ত করে আওয়াজ হল গুড়ুম! সবচেয়ে বড় মহিষটা ধপাস করে পড়ে গিয়ে যন্ত্রণায় মাথা নাড়া দিলে, তারপর উঠেই ঝোঁপের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল, অন্য দুটোও ছুটল তার পিছনে পিছনে।

খানিক পরে দেখা গেল, অন্য মহিষদুটো অনেক দূরে নদীর ধার দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে! কিন্তু আহত বড় মহিষটার আর দেখা নেই।

কোথায় গেল সে? মারাত্মকরূপে জখম হয়ে সে কি ঝোঁপের ভিতরে কাৎ হয়ে পড়ে আছে?

মাটির উপরে রক্তের দাগ ধরে আমরা খুব সহজেই তার অনুসরণে চললুম, কিন্তু তখন জানতুম না আমরা চলেছি স্বেচ্ছায় মরণের সন্ধানে!

তাকে ধরা সহজ হল না। আমরা চলেছি তো চলেছিই—সে সুদীর্ঘ রক্তের দাগের যেন শেষ নেই!

ছয়ঘণ্টা কেটে গেল, আমাদের শরীর একেবারে কাবু হয়ে পড়ল। খানিকক্ষণ আর বিশ্রাম না করলেই নয়। একটা গাছের ছায়ায় বসে জিরুতে লাগলুম।

সূর্য অস্ত যাবার কিছু আগে হঠাৎ একজন কুলি এসে খবর দিলে যে, খানিক তফাতেই একটা ঝোঁপের ভিতরে সেই আহত মহিষটা পড়ে পড়ে ধুঁকছে!

আমরা দুজনে তখনি সোৎসাহে উঠে সেইদিকে ছুটলুম।

কিন্তু সেই ঝোঁপের কাছে যাওয়া মাত্রই মহিষটা উঠে আগেই আমাদের আক্রমণ করলে।

আমরা দুজনেই একসঙ্গে বন্দুক ছুঁড়লুম—মহিষটা আবার চোট খেলে, কিন্তু তবু থামল না!

তার পথ থেকে আমি সরে দাঁড়াতে গেলুম, কিন্তু দৈবগতিকে একটা গাছের শিকড়ে পা আটকে একেবারে ভূতলশায়ী হলুম।

মূর্তিমান যমদূতের মতো মহিষটা আমার উপরে এসে পড়ল এবং আমাকে শিঙে করে টেনে তোলবার চেষ্টা করলে।

আমি কোনরকমে উঠে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে তার শিংদুটো দুহাতে চেপে ধরলুম! আমার হাত ছাড়াবার জন্যে মহিষটা বিষম এক মাথা-নাড়া দিলে এবং তার একটা শিং প্রবল বেগে আমার গালের ভিতরে ঢুকে গেল! ভীষণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে আমি তার শিংদুটো ছেড়ে দিলুম এবং পর-মুহূর্তে অনুভব করলুম সে আমাকে শূন্যে তুলে ছুঁড়ে দূরে ফেলে দিলে! তারপরে কি হল আর আমি জানি না।

অনেকক্ষণ পরে জ্ঞানলাভ করে দেখলুম, কুলিরা আমাকে নদীর ধারে এনে শুইয়ে দিয়েছে। আমার সর্বাঙ্গে রক্তপ্রবাহ ও অসহ যাতনা। একজন ঠাণ্ডা জল ঢেলে আমার ক্ষত ধুইয়ে দিচ্ছে।

কোনরকমে অস্ফুট স্বরে আমি বললুম, "আমার বন্ধু কোথায়?"

—"তাঁকে ধরাধরি করে এখানে নিয়ে আসা হচ্ছে। তিনি বাঁচবেন না।"

—"মহিষটা?"

—"মরে গেছে।"

কাছেই নদীতে আমাদের মোটর-বোট ভাসছিল।

আমি বললুম, "শীগগির! ওষুধের বাক্সটা নিয়ে এস!" আমার মুখের ভিতর থেকে তখন হু-হু করে রক্ত বেরিয়ে আসছে! আর—আর, সে কী ভয়ানক যাতনা!

ওষুধের বাক্স এল। একজন কুলি আমার মুখের সামনে আরসি ধরলে। নিজের মুখ নিজে দেখেই আতঙ্কে আমি শিউরে উঠলুম!

আমার ডান গালে এত-বড় একটা ছ্যাঁদা হয়েছে যে তার ভিতরে অনায়াসেই হাতের মুঠো ঢুকে যায়! নিচেকার ঠোঁটখানা ছিঁড়ে কাঁপতে কাঁপতে ঝুলছে। তলাকার চোয়াল দুই জায়গায় ফেটে ও ভেঙে গেছে —কান আর ঠোঁটের কাছে। একখানা লম্বা ভাঙা হাড়ও বেরিয়ে ঝুলে আছে, তার উপরে রয়েছে তিনটে দাঁত! তলাকার চোয়ালের সমস্ত মাংস একেবারে হাড় থেকে খুলে এসেছে। আমার জিভখানাও টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। যতবার থুতু ফেলেছি, ছোট-বড় হাড়ের আর ভাঙা দাঁতের টুকরো ঝরে ঝরে পড়ছে!

সেই অবস্থায় যতটা সম্ভব, নিজের হাতে স্চ নিয়ে গাল ও হাড়ের মাংস সেলাই করতে লাগলুম। আজও আমি ভেবে উঠতে পারি না যে, কি করে আমি সেই অসাধ্য সাধন করেছিলুম! যন্ত্রণার উপরে তেমন যন্ত্রণা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব!

কোন রকমে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ফিয়েরের কাছে গেলুম। তার অবস্থা একেবারেই মারাত্মক। তার দেহের তিন জায়গা শিঙের গুঁতোয় ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে। বাঁদিকের বুকের সমস্ত মাংসপেশী ছিঁড়ে ঝল-ঝল করে ঝুলছে! তাকে নিয়েও আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করলুম, কিন্তু সে বাঁচল না।

চার-পাঁচ দিন পরে অনেক দূর থেকে ডাক্তার আনা হল—এবং তারপরে আবার অস্ত্র-চিকিৎসা—আবার নতুন নরকযন্ত্রণা! অনেকদিন ভুগে আমি বেঁচেছি বটে, কিন্তু আমার মুখ হয়েছে চিরকালের জন্যে ভীষণদর্শন!"

আগেই যে মেজর ডবলিউ. রবার্ট ফোরানের নাম করা হয়েছে, বন্ধু

মহিষের ভীষণ বিক্রম সম্বন্ধে চিত্তোত্তেজক কাহিনী বলেছেন, এখানে সেটিও তুলে দিলুম। বলা বাহুল্য এটিও সত্য গল্প এবং এরও ঘটনাস্থল আফ্রিকা।

"একদিন আমার কাফ্রি ভৃত্য হামিসির সঙ্গে আমি জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ খানিক তফাৎ থেকে উত্তেজিত সিংহ ও মহিষের প্রচণ্ড গর্জন ও চিৎকার শুনতে পেলুম!—সঙ্গে সঙ্গে ঘন-ঘন লম্ফ-ঝম্পের আওয়াজ!

বুঝলুম নেপথ্যে বিষম এক পশু-নাট্যের অভিনয় চলছে, যা স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ জীবনে একবারের বেশি আসে না! পা টিপে টিপে অগ্রসর হলুম, পিছনে পিছনে এল হামিসি।

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটা খোলা জমির উপর এসে পড়লুম এবং তারপর যে দৃশ্য দেখলুম তা আমার নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়ে দিলে—এমন কি আমার বন্দুকের কথাও আর মনে রইল না।

আমার চোখের সামনেই মস্ত একটা কেশরওয়ালা সিংহ এবং বিরাট একটা মহিষ মৃত্যু পণ করে বিষম এক যুদ্ধে নিযুক্ত হয়ে আছে! এ যুদ্ধ একজন না মরলে থামবে না। হায়রে, আমার সঙ্গে একটা ক্যামেরা যদি থাকত।

আমার এ পথে আসবার কত আগে থেকে এই মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে তা বুঝতে পারলুম না। তবে যুদ্ধ যে এখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে যোদ্ধাদের রক্তাক্ত দেহ দুটো দেখলেই সে-প্রমাণ পাওয়া যায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্থির নেত্রে তাকিয়ে রইলুম—কিন্তু কতক্ষণ তা জানি না, স্থান ও কালের কথা আমার মন থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

সিংহটা মহিষের কাঁধের উপর রীতিমত জাঁকিয়ে বসে আছে এবং মহিষ তার কাঁধ থেকে শত্রুকে ঝেড়ে ফেলবার যতরকম কৌশল জানে কিছুই অবলম্বন করতে ছাড়ছে না! সেই অবস্থাতেই সিংহ তার মাথার গোটাকয়েক প্রচণ্ড ঢুঁ ও নিষ্ঠুর শিঙের গুঁতো খেলে, কিন্তু তবু সে

অটল!

অবশেষে মহিষটা এক ঝটকান মেরে সিংহটাকে মাটির উপরে পেড়ে ফেললে এবং সে সামনে সরে যাবার আগেই তীক্ষ্ণ শিঙের এক গুঁতোয় শত্রুর দেহটা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিলে! তারপর সে কী ঝটাপটি, কী গর্জন, চিৎকার! আকাশ বাতাস অরণ্য যেন থর থর করে কাঁপতে লাগল! আমার মন স্তম্ভিত, আমার মেরুদণ্ড দিয়ে ছুটছে বিদ্যুৎপ্রবাহ!

কোনরকমে পশুরাজ নিজেকে আবার শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করে নিয়ে সরে গিয়ে দাঁড়াল এবং সরে যাবার আগেই দাঁত ও থাবা দিয়ে মহিষের দেহের অবস্থা এমন শোচনীয় করে তুললে যে সে আর বলবার নয়! মহিষের দেহের মাংস ফালা ফালা হয়ে ঝুলতে লাগল! চতুর্দিকে রক্ত ঝরছে ও ধুলোর মেঘ উড়ছে! দুজনেই পরস্পরের দিকে মুখ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে মণ্ডলাকারে ঘুরছে আর ঘুরছে! প্রত্যেকেই পরস্পরের উপরে আবার লাফিয়ে পড়বার জন্যে সুযোগ খুঁজছে! তাদের ঘোরা আর শেষ হয় না! তারা নিজেদের ক্ষত আর যন্ত্রণার কথা ভুলে গেল, নিঃশ্বাসে তাদের নাসারন্ধ্র স্ফীত, এবং মুখ করছে ক্রমাগত শোণিতবৃষ্টি!

আমি ভাবলুম, বিখ্যাত সিংহ-বিক্রম এইবারে ঠাণ্ডা হয়েছে, পশু-রাজ এখনো ভালোয়-ভালোয় সরে পড়বার চেষ্টা করবে! কিন্তু আমার ধারণা ভ্রান্ত! আচম্বিতে ঠিক বিদ্যুতের মতই আশ্চর্য তীব্র-গতিতে সিংহ আবার লাফ মেরে মহিষের স্কন্ধের উপরে উঠে বসল!

আমি স্থির করলুম, আর রক্ষা নেই—এবারে মহিষেরই শেষ-মুহূর্ত উপস্থিত! পশুরাজ অতঃপর তার ঘাড় কামড়ে ধরবে এবং থাবা দিয়ে তার মাথাটা চেপে ধরে ঘুরিয়ে মুচড়ে দেবে; তারপর ঘাড়-ভাঙা মহিষের মৃতদেহ মাটির উপরে লুটিয়ে পড়বে! সিংহরা এই উপায়েই শিকারের পশুদের বধ করে।

মহিষ দুই হাঁটু গেড়ে ভূমিতলে বসে পড়ল এবং সেই অবস্থাতেই শত্রুকে আবার পিঠের উপর থেকে ঝেড়ে ফেলবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা

করতে লাগল। তারপর চমৎকার বুদ্ধি খাটিয়ে সে টপ করে কাৎ হয়ে শুয়ে পড়ল এবং তার বিষমভারি দেহ নিয়ে সিংহের গায়ের উপর দিয়ে গড়িয়ে গেল! তার দেহের চাপে জব্দ হয়ে সিংহ তাকে ছেড়ে দিতে পথ পেলে না! বুঝি তার ঘাড়টাই মটকে গেল!

কিন্তু সিংহ তখনো কাবু হয় নি! মহিষ তু-পায়ে ভর দিয়ে আবার উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে সিংহ চড়ে বসল পুনর্বার তার কাঁধের উপরে! এবার সে একপাশ থেকে ঝুলে পড়ে শত্রুর দেহ চার থাবা দিয়ে জড়িয়ে ধরে ভীম বিক্রমে বারংবার দংশন করতে লাগল এবং মহিষটা চিৎকার করে কাঁদতে লাগল কাতর স্বরে!

কিন্তু মহিষ তবু হার মানলে না! বারংবার গা-ঝাড়া দিয়েও যখন সে ছাড়ান পেলে না, তখন সে শেষ-উপায় অবলম্বন করলে। হঠাৎ শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে মহিষ উলটে চিৎ হয়ে মাটির উপরে আছাড় খেয়ে পড়ল এবং তার বিপুল ও গুরুভার দেহের তলায় পশুরাজের দেহ গেল অদৃশ্য হয়ে!

মাটি তখন রক্তে রাঙা এবং সমস্ত জায়গাটার উপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেছে! সিংহ ও মহিষ—কেউ আর নড়ছে না, যেন তারা কেউ আর বেঁচে নেই। আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম, পরিণামে কি হবে? একবার পিছন ফিরে হামিসির দিকে তাকালুম—তার মুখ দিয়ে বইছে দর দর ধারে ঘামের ধারা, তুই স্থির চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত, তুই ঠোঁট ফাঁক করা, যেন সে মায়ামন্ত্রে সম্মোহিত! আবার ঘটনাস্থলের দিকে দৃষ্টি ফেরালুম।

ধীরে ধীরে টলতে টলতে মহিষ আবার উঠে দাঁড়াল, এবং হেঁটমুখে শত্রুর দিকে দৃষ্টিপাত করলে!

সিংহের সর্বাঙ্গ তখন থেৎলে ভালগোল পাকিয়ে গেছে, কিন্তু তখনো সে মরে নি। মহিষ শিং নেড়ে আবার তাকে তুই-তিনবার গুঁতো মারলে, সঙ্গে সঙ্গে পশুরাজের প্রাণ বেরিয়ে গেল!

যুদ্ধক্ষেত্র একেবারে স্তব্ধ; কাছের কোন গাছে একটা পাখি পর্যন্ত

ডাকছে না! আমি কেবল আমার দ্রুতচালিত হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতে পেলুম।

মহিষ তখন খুব জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানছে এবং তার দেহ টলমল করে টলছে! সেই অবস্থায় বিজয়ী বীর মৃত্যুকে বরণ করলে। তার দেহ সশব্দে পরাজিত শত্রুর মৃতদেহের উপরে লুটিয়ে পড়ল!

আমাদের তখন আর কথা বলবার শক্তিও ছিল না। অভিভূত প্রাণে বিজেতা ও বিজিতের দেহ সেই নির্জন অরণ্যের মধ্যে ফেলে রেখে আমরা দুজনে পায়ে পায়ে চলে এলুম।

পশু-দেহ হলেও সম্মুখ-যুদ্ধে মৃত সেই দেহ দুটিতে হাত দেওয়া অধর্ম!"

দ্বিতীয়

রাতের অতিথি

সিংহের চেয়ে গরিলা বধ করবার জন্যেই আমার ঝোঁক ছিল বেশি! আফ্রিকার বনে বনে সিংহের অভাব নেই, তাদের দলে দলে বধ করেছে এমন লোকও অসংখ্য। কিন্তু গরিলা হচ্ছে দুর্লভ জীব। পৃথিবীর খুব কম চিড়িয়াখানায় গরিলা দেখতে পাওয়া যায়। আফ্রিকাতেও গরিলার সংখ্যা খুব কম। তার উপরে দৈহিক শক্তিতে ও মানসিক বুদ্ধিতে তারা পশুরাজ্যে অতুলনীয় বলে অধিকাংশ শিকারী তাদের কাছে ঘেঁষতেও ভরসা পায় না।

কিভুর অরণ্য হচ্ছে গরিলাদের রাজত্ব। আমি এখন সদলবলে এই-খানেই এসে হাজির হয়েছি।

একটি ছোট খাত দিয়ে জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে, স্থানীয় ভাষায় তাকে "কানিয়ানামা গুফা" বা "মৃত্যু-খাত" বলে ডাকা হয়। এর এমন

ভয়ানক নাম কেন তা পরীক্ষা করবার সুযোগ পাই নি। এরই আশেপাশে রয়েছে প্রকাণ্ড বাঁশবন—এখানকার ভাষায় যাকে বলে "রুগানো"। এইখানেই সর্বপ্রথমে আমি গরিলার পদচিহ্ন দেখতে পেলুম।

কচি বাঁশের রসাল অঙ্কুর হচ্ছে গরিলার সখের খাবার। এখানে বন বলতেও বুঝায় প্রধানত বাঁশের বন। মাইলের পর মাইল চলে গেছে কেবল বাঁশবনের পর বাঁশবন এবং তাদের ভিতর থেকে মেঘ-ছোঁয়া মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে "মিকেনো", "কারিসিম্বি" ও "বাইশোক" নামে তিনটি আগ্নেয়গিরি। ঐ সব পাহাড়ের দুর্গম স্থানগুলিও বাঁশবনের অধিকারভুক্ত হয়েছে। সেখানে বাঁশের ঝাড় এত ঘন যে, গাছ না কেটে কিংবা হামাগুড়ি না দিয়ে তার ভিতরে ঢোকা বা নড়াচড়া করা যায় না। বাঁশবনের কাছে কাছে নিচে রয়েছে জলবিছুটি গাছ, লালাভ-সাদা ফুসিয়া-জাতীয় পুষ্পগুল্ম, অজস্র ফুলে ভরা দোপাটি গাছ, শ্বেতবর্ণ ভেরোনিকা গুল্ম এবং বেগুনী, হলদে ও আলতা-রঙা রাশি রাশি অর্কিড!

এইসব বনে বেড়িয়ে বেড়ায় দলে দলে গরিলা, মহিষ ও হস্তী। চিতাবাঘ ও অন্যান্য হিংস্রজন্তুর অভাবও এখানে নেই। এক বনের কচি বাঁশ সাবাড় হয়ে গেলেই গরিলারা অন্য বনে গিয়ে আশ্রয় নেয়। মানুষের মতন অনেকটা দেখতে হলেও তারা মানুষের মতো সভ্য নয়, তাই উদর-চিন্তায় তাদের ব্যতিব্যস্ত হতেও হয় না, খাবার কেনবার জন্যে পয়সা রোজগার করতেও হয় না! বনে গাছ আছে, ভেঙে খাও; নদীতে জল আছে, চুমুক দাও! তারপর গাছের ডাল-পাতা ভেঙে নরম বিছানা তৈরি কর, এবং ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দিব্যি আরামে জোরসে নাক ডাকাও! গরিলারা কি সুখেই আছে!

কিভু-অরণ্যে দু-রকম গাছ বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এক-রকম গাছের নাম দেশি-ভাষায় "মুসুঙ্গুরা"। তার পাতাগুলি খুব ছোট এবং তাতে গোলাপের মতন দেখতে হলদে হলদে ফুল ফোটে। লম্বায় পঞ্চাশ-ষাট ফুট উঁচু হয়! আর-একরকম গাছের নাম "মুগেসী"। তার পাতা আখরোট-পাতার মতন এবং তার উচ্চতা একশো ফুট পর্যন্ত হয়!

মার্চ ও এপ্রিল মাসে তাতে ম্যাজেণ্টার আভা মাখানো বেগুনী রঙের থোলো থোলো ফুল ফোটে। পূর্বোক্ত দুই গাছের উপরেই সবুজ ও সোনালী রঙের শৈবালের বিছানা পেতে জেগে থাকে সব রঙিন ও বিচিত্র অর্কিডরা ! এখানে আরো যে কতরকম বাহারী ফুল দেখলুম তা আর বলা যায় না ! এ যেন ফুলের দেশ !

কিন্তু এই ফুলের দেশেই আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি কবিতার খাতা নিয়ে নয়, হত্যাকারী বন্দুক ঘাড়ে করে !

গরিলা শিকারের একটা মস্ত সুবিধা আছে। অনেক খুঁজে কষ্ট পেয়ে তবে সিংহ বা বাঘের পাত্তা মেলে। কিন্তু একবার গরিলাদের দেশে আসতে পারলে তাদের দর্শন পেতে বেশি দেরি হয় না। তার কারণ, তাঁরা থাকে দলবদ্ধ হয়ে। একে তো তাদের প্রত্যেকের গায়ে অসুরের মতন জোর, সিংহও জোরে তাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে কিনা সন্দেহ, তার উপরে তারা যখন দল বেঁধে থাকে, তখন হাতি পর্যন্ত গরিলাদের কাছে তুচ্ছ বলে গণ্য হয় ! তারা নিজেদের এই প্রতাপ ভালো করেই জানে, তাই কোন শত্রু বোকার মতন কাছে এসে উঁকিঝুঁকি মারলে সেটার দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করে না ! সিংহ বা মানুষ দেখলে প্রথমে তারা অবহেলা প্রকাশ করে, কাছে এগিয়ে এলে মুখ খিঁচিয়ে দু-চারবার ধমক দেয়, কিন্তু যে-শত্রু তাতেও সাবধান না হয়, তার কপাল বড় মন্দ ! গরিলা চলে-ফেরে গদাই-লশকরি চালে ধীরে ধীরে, এমন-কি খুব বেশি বিপদে না পড়লে দৌড়াদৌড়ি করে শরীরকে সে ব্যস্ত করতে চায় না। এই-সব কারণে গরিলার পিছু নেওয়া অনেকটা সহজ।

গরিলাদের সন্ধানে কিভু-অরণ্যে এসে এক জাতের মানুষ দেখে অবাক হয়েছি। ইংরেজিতে এদের নাম 'পিগ্‌মি', আমি বালখিল্য বলতে চাই। পৃথিবীতে এই বালখিল্যদের চেয়ে ছোট আকারের মানুষ আর চোখে পড়ে না, মাথায় এরা আমার কোমরের চেয়ে উঁচু নয়। দূর থেকে এই বালখিল্যদের দেখলে মনে হয়, যেন একদল নয়-দশ

বছরের ছেলে-মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে!

বালখিল্যদের রং কুচকুচে কালো, চুল কোঁকড়া, নাক থ্যাবড়া, কোমরে খালি তেলে-চোবানো একটুকরো ন্যাকড়া ঝোলে। ছোট চেহারা হলেও এদের দেহ খুব বলিষ্ঠ, সুদৃঢ় মাংসপেশীগুলো দেহের উপরে ফুলে ফুলে ওঠে! এবং এরা পরম সাহসী। নিজেদের দেহের মতনই ছোট ছোট বর্শা নিয়ে এরা গভীর জঙ্গলে শিকার করতে ঢোকে ও বড় বড় হাতি আর বন্যমহিষ বধ করে! শিকারই এদের একমাত্র জীবিকা। শাকসবজি, শিকড় খেয়েই এরা দিন কাটাতে পারে, যখন মাংস খাবার সাধ হয় তখন তীর-ধনুক বা বর্শা নিয়ে বনে গিয়ে শূকর বা হরিণ মেরে আনে। বালখিল্যরা আফ্রিকার অন্য কোন বাসিন্দাদের সঙ্গে মেলামেশা করে না। সবুজ বনের ভিতরে নৃত্যশীলা নদীর তীরে ছোট ছোট পাতার কুঁড়ে বানিয়ে পরম শান্তিতে তারা সরল জীবন কাটিয়ে দেয় এবং সভ্যতার কোন ধারই ধারে না।

একদিন পথ চলতে চলতে হঠাৎ দেখলুম, এক জায়গায় বড় বড় গাছের তলায় মাটির উপরে পর পর অনেকগুলো বাসা সাজানো রয়েছে। গুণে দেখলুম, ত্রিশটা বাসা। লতা, ডাল ও শুকনো পাতা দিয়ে প্রত্যেকটি বাসা তৈরি।

জিজ্ঞাসা করাতে আমার কুলিদের সর্দার জানালে, এগুলো গরিলাদের বাসা।

আমি বললুম, "শুনেছি গরিলারা এক বাসায় দু-দিন শোয় না?"

সে জানালে,—না, তবে তারা নিশ্চয়ই খুব কাছে আছে। কারণ এ বাসাগুলো টাটকা।

চারিদিকে তাকিয়ে দেখলুম। বাঁশবন ও অন্যান্য নানা জাতের গাছের স্নিগ্ধ ছায়া নরম ঘাসের বিছানার উপরে ঝিলমিল করছে। গাছের ডালে ডালে দাঁড়কাক, কাঠঠোকরা, ঘুঘু, মধুপায়ী 'সূর্যপাখি' ও একরকম গীতকারী চড়াইপাখি বন-মর্মরের সঙ্গে নিজেদের কণ্ঠ মিশিয়ে দিয়ে মিশ্রসঙ্গীত সৃষ্টি করেছে। উঁচু গাছের ঘন পাতার পর্দা সরিয়ে মাঝে

মাঝে মুখ বাড়িয়েই পালিয়ে যাচ্ছে সোনালী বানররা। একপাশ দিয়ে ছোট্ট একটি নদী রুপোর লহর তুলিয়ে এঁকেবেঁকে চোখের আড়ালে চলে গেছে।

সূর্য অস্ত যেতে দেরি নেই। দূর থেকে একটা শব্দ কানে এল— কারা যেন মড়-মড় করে গাছ ভাঙছে!

কুলির সর্দারের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলুম, "কারা গাছ ভাঙছে?"

—"গরিলারা।"

আমি বললুম, "তাহলে এইখানেই ছাউনি ফেলো। জায়গাটি আমার ভালো লাগছে। কাল আমরা গরিলা-শিকারে যাব।"

কিন্তু সেই রাত্রেই আমার জ্বর এল—পরদিন আর শিকারে যাওয়া হল না। পাঁচদিন জ্বরে ভুগে উপোস করে এমন দুর্বল হয়ে পড়লুম যে, আরো দিন-তিনেক সেইখানেই বিশ্রাম করতে হল।

ইতিমধ্যে এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল।

সেদিন সকালে সবে আমি পথ্য করেছি, শরীর বড় দুর্বল। সঙ্গে করে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলী নিয়ে গিয়েছিলুম, মাঝে মাঝে তার পাতা ওলটাই এবং মাঝে মাঝে তাঁবুর বাইরে গিয়ে একখানা ক্যাম্প-চেয়ার পেতে বসি। নদীর নাচ দেখি আর পাখিদের গান শুনি। এমনি ভাবে সারা দিন কাটল। সন্ধ্যার কিছু আগে একদল হাতি বনের ভিতরে মহা সোরগোল তুলে মড়মড়িয়ে গাছ ভাঙতে ভাঙতে খানিক তফাৎ দিয়ে চলে গেল—তারা আমাদের দিকে চেয়েও দেখলে না। এ-সব দৃশ্য এখন আমার চোখেও সহজ হয়ে এসেছে। হাতির পাল কেন, বনের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে মাঝে মাঝে দূরে সিংহদেরও খেলা করতে দেখেছি এবং তারাও আমাদের দিকে বিশেষ দৃষ্টিও দেয়নি বা আক্রমণ করতেও আসেনি।

সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘনিয়ে এল, পাখিদের 'কনসার্ট' ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে থেমে গেল। স্তব্ধ অরণ্যের অন্তঃপুর থেকে একটা চিতাবাঘের গলা জেগে উঠল। আমিও আস্তে আস্তে তাঁবুর ভিতরে এসে ঢুকলুম।

সেদিন গুরুপাক খাবার সইবে না বলে দু-টুকরো রুটি জেলি মাখিয়ে খেয়ে শুয়ে পড়লুম।

আফ্রিকার বনের পাখিরা ভালো করে আলো ফোটবার আগেই এত-বেশি চ্যাঁচামেচি শুরু করে যে, ভোর হতে-না-হতেই ঘুম ভেঙে গেল।

অত্যন্ত ক্ষুধাবোধ করলুম। চাকর-বাকররা তখনো জাগে নি, কাজেই নিজেই উঠে কিঞ্চিৎ খাদ্যসংগ্রহের চেষ্টা করলুম।

প্রথমেই আবিষ্কার করলুম, আমার জেলির টিনটা টেবিলের উপর থেকে অদৃশ্য হয়েছে! তারপর দেখলুম, কাল যে-চারখানা রুটি আমি না খেয়েই শুয়ে পড়েছিলুম, টেবিলের উপরে সেগুলোও নেই!

অত্যন্ত রাগ হল। নিশ্চয়ই কোন চোর ও পেটুক কুলি কাল রাত্রে লুকিয়ে আমার তাঁবুর ভিতরে ঢুকেছিল ভেবে সর্দারকে ডাকলুম।

সব কথা শুনে সর্দার অন্যান্য কুলিদের আহ্বান করলে।

কিন্তু তাদের কেউ দোষ স্বীকার করলে না।

আমি ক্রুদ্ধ স্বরে বললুম, "আচ্ছা, ভবিষ্যতে আমার তাঁবুর ভিতরে যদি কোন চোরকে ধরতে পারি, তাহলে গুলি করে তাকে মেরে ফেলব!"……

সেদিন রাত্রে হঠাৎ ঝম-ঝম করে বৃষ্টি নামল। ঘুমোবার সময়ে আমার বৃষ্টি ভারি মিষ্টি লাগে। পৃথিবী যখন ধারাজলে স্নান করছে, মাটি যখন কাদায় প্যাচ-প্যাচ করছে এবং পথিকদের কাপড়-চোপড় যখন ভিজে স্যাঁৎ-স্যাঁৎ করছে, আমি যে তখন দিব্যি শুকনো ও উত্তপ্ত দেহে পরম আরামে বিছানায় শুয়ে আছি, এই পরিতৃপ্তির ভাবটুকু মনকে খুশি করে তোলে এবং চোখে তন্দ্রাসুখের আবেশ মাখিয়ে দেয়! গাছের পাতায় পাতায় বৃষ্টিবিন্দুর টুপুর-টুপুর শব্দ শুনতে শুনতে আমি ঘুমিয়ে পড়লুম।

পরদিন সকালে উঠে দেখা গেল, বিস্কুটের যে নতুন টিনটা সবে কাল সন্ধ্যায় খোলা হয়েছিল, সেটা আর টেবিলের উপরে নেই!

মন যে কি-রকম ক্ষেপে গেল তা আর বলা যায় না। শহরে এমন খাবার চুরি হলে বিশেষ ভাবনা হয় না। কিন্তু সভ্যতা ও হাটবাজার থেকে এত দূরে এই গহন বনে যেখানে একটা মোহর দিলেও একখানা বিস্কুট কেনা যায় না, সেখানে নিত্য যদি এইভাবে খাবার চুরি যেতে থাকে তাহলে তুদিন পরেই আমাকে যে পাত্তাড়ি গুটিয়ে মানে এখান থেকে সরে পড়তে হবে।

তাঁবুর বাইরে গিয়ে দাঁড়ালুম। সঙ্গে সঙ্গে চোখ পড়ল মাটির উপরে। কাল রাত্রে বৃষ্টি পড়ে তাঁবুর দরজার সামনেকার মাটি নরম করে দিয়েছে এবং সেইখানে কতকগুলো স্পষ্ট পায়ের দাগ। সে পদচিহ্ন মানুষের।

সেদিনও আগে সর্দারকে ডেকে চুরির কথা বললুম ও পায়ের দাগ-গুলো দেখালুম।

সর্দার খানিকক্ষণ ধরে দাগগুলো পরীক্ষা করলে। আফ্রিকার বনে বনে ঘোরা যাদের ব্যবসা, ভূমিতলে পদচিহ্ন দেখে ভালো ডিটেকটিভের মতন তারাও যে অনেক তথ্য আবিষ্কার করতে পারে, এ আমি জানতুম। সুতরাং এই পদচিহ্নগুলো দেখে সর্দার কি বলে তা শোনবার জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

সর্দার হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে দাগগুলো পরীক্ষা করতে লাগল। লক্ষ্য করলুম, তার মুখে চোখে বিস্ময়ের আভাস ফুটে উঠেছে। সর্দারের পরীক্ষা যখন শেষ হল তার মুখ তখন গম্ভীর।

—"কি সর্দার, ব্যাপার কি ?"

সর্দার হতাশভাবে কেবল তুবার মাথা নাড়লে।

—"কিছু বুঝতে পারলে না ? কিন্তু আমি বলছি, এগুলো মানুষের পায়ের দাগ। আর এ দাগগুলো যার পায়ের, সে নিশ্চয়ই কুলিদের দলে আছে। আমরা শেষ-গ্রাম থেকে বিশ মাইল দূরে এসে পড়েছি। রাত্রে এই বিপদজনক বন পার হয়ে সেখান থেকে কোন চোর আসতে পারে না, এ কথা তুমি মানো তো ?"

—"হ্যাঁ হুজুর, মানি।"

—"তাহলে আমাদেরই কোন কুলি এই চুরি করেছে।"

সর্দার আবার প্রবল ভাবে মাথা নাড়া দিয়ে বললে, "না হুজুর, আমাদের কোন কুলিই এ চুরি করে নি!"

—সর্দার, তাহলে তুমি কি বলতে চাও শুনি?"

—"হুজুর, আমি যা বলতে চাই, তা শুনলে হয়তো আপনি বিশ্বাস করবেন না।"

—"কেন?"

—"আপনি ভাববেন আমি অসম্ভব মিথ্যাকথা বলছি!"

—"আচ্ছা, তোমার কি বিশ্বাস বল। আমি বিশ্বাস করব।"

—"হুজুর, কাল রাতে আপনার তাঁবুতে যে চুরি করতে ঢুকেছিল, সে পুরুষমানুষ নয়।"

—"তার মানে?"

—"অন্তত এই পায়ের দাগগুলো যে স্ত্রীলোকের, সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই!"

—"সর্দার, সর্দার! তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? যে বন গ্রাম থেকে বিশ মাইল দূরে, যে বনে গরিলা, হাতি, বুনো মোষ আর বাঘের বাস, সেখানে রাত্রে চুরি করতে আসবে স্ত্রীলোক?"

সর্দার দৃঢ়ভাবে বললে, "ও-সব কথা আমিও ভেবে দেখেছি। কিন্তু এগুলো স্ত্রীলোকের পায়ের দাগ।"

আমি স্তম্ভিত ও স্তব্ধ হয়ে রইলুম। তারপর সর্দার চলে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি তাকে ডেকে বললুম, "শোনো। এ-সব কথা যেন কুলিদের কাছে জানিও না!"

সর্দার অল্প হেসে বললে, "আপনি মানা না করলেও আমি বলতুম না। এ গল্প শুনলে তারা পেত্নীর ভয়ে এখনি আমাদের ছেড়ে পালিয়ে যাবে!"

সর্দারের কথা নিয়ে যতই নাড়াচাড়া করি, কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না। ভয়াবহ কিভু-অরণ্য, যার চতুঃসীমানায় লোকালয় নেই,

যার ভিতর দিয়ে দিনের বেলায় পথিকরা দলবদ্ধ ও সশস্ত্র হয়েও সভয়ে পথ চলে, মানুষের জীবন যেখানে প্রতিমুহূর্তেই হিংস্র জন্তুর দুঃস্বপ্ন দেখে, সেখানে গভীর রাত্রে একাকিনী স্ত্রীলোক,—এ কল্পনা হাস্যকর! সর্দার নিশ্চয়ই ভুল করেছে!

দুপুর-বেলায় একটা বন্দুক নিয়ে বাইরে গেলুম। কাছাকাছি যদি কোথাও দুই-একটা শিকারের পাখি পাওয়া যায় তাহলে আজকের নৈশ-আহারটা সুসম্পন্ন হবে, এই ভেবে নদীর ধার ধরে গাছে গাছে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখে অগ্রসর হলুম।

নদীর জলধারায় ঝরে ঝরে পড়ছে উজ্জ্বল রৌদ্রধারা এবং তার সঙ্গে বাতাসে বাতাসে বয়ে যাচ্ছে শত শত পাখির গানের আনন্দ-ধারা! চারদিকের জীবন্ত স্নিগ্ধতাটুকু আমার এত ভালো লাগল যে, জীবহিংসা করতে আর সাধ হল না। বড়-জাতের একরকম বন-পায়রা আমায় দেখে কাছের গাছ থেকে দূরের গাছে উড়ে গিয়ে বসল, কিন্তু আমি তাকে অনুসরণ করলুম না। মন যেন আমাকে ডাক দিয়ে বললে,—'আজকের এই উত্তপ্ত সূর্যালোকের আনন্দ-সভায় তোমাদের যতটুকু বাঁচবার অধিকার, ওরও অধিকার তার চেয়ে একটুও কম নয়!'

খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে আবার তাঁবুর দিকে ফিরলুম।

হঠাৎ নদীর তীরে কি-একটা চকচকে জিনিস আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, সূর্যালোক তার উপরে পড়ে জ্বলে জ্বলে উঠছে!

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দেখি, আমার বিস্কুটের টিনটা সেখানে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে!

তাড়াতাড়ি সেটা তুলে নিলুম। টিন একেবারে খালি!

নদী তীরের বালির উপরে মানুষের পায়ের অনেকগুলো দাগ!

যে আমার টিন চুরি করেছে, সে লোকালয়ে ফিরে যায় নি, বৃষ্টিসিক্ত গভীর রাত্রে, এই ভীতিসঙ্কুল বন্য নদীর তীরে বসে জমাট অন্ধকারে নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত প্রাণে উদরের ক্ষুধানিবৃত্তি করেছে। কে সে? সে যে আমার কোন কুলি নয় বা স্ত্রীলোক নয়, এটা ঠিক! কিন্তু পুরুষ হলেও

সে কি-রকম পুরুষ ? তার কি কোন মাথা গোঁজবার আশ্রয়ও নেই ? তার মনে কি মানুষের স্বাভাবিক ভয়ও নেই ?

এমনি সব কথা ভাবতে ভাবতে ছাউনিতে ফিরে এসে দেখি, সর্দার একটা গাছতলায় চুপ করে বসে আছে।

তাকে আমার নতুন আবিষ্কারের কথা জানালুম। শুনে তার মুখে নতুন কোন বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠল না! সে আবার খালি হতাশ ভাবে মাথা নাড়লে।

তার ব্যবহার রহস্যজনক। যেন সে কোন গুপ্তকথা জানতে পেরেছে, কিন্তু আমার কাছে প্রকাশ করতে চায় না!

আমিও জানবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করলুম না। তার মনে একটা ভ্রমাত্মক বিশ্বাস জন্মেছে, হয়তো আবার একটা কোন উদ্ভট কথা বলে বসবে!

কেবল বললুম, "সর্দার, এই অদ্ভুত চোরকে ধরতে হবেই। আজ রাত্রে আমি ঘুমবো না, তুমি জেগে সতর্ক হয়ে থাকতে পারবে কি ?"

সর্দার বললে, "আমি স্থির করেছি, আজ রাত্রে এই গাছের উপরে উঠে পাহারা দেব।"

আমি তাকে ধন্যবাদ দিলুম।

সে রাত্রে আহারাদির পর আলো নিবিয়ে আমি শুয়ে পড়লুম। কিন্তু ঘুমলুম না। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলুম, আজ রাত্রে মেঘ ও বৃষ্টি নেই, চাঁদের আলো আছে,—আর বাইরের গাছের টঙে জেগে আছে সতর্ক সর্দার। চোরকে সে অনায়াসেই দেখতে পাবে! আর বিছানায় শুয়ে জেগে আছি আমি—চোরকে অনায়াসেই ধরতে পারব!

বাইরে নিশুত রাতের বুকে দুলছে আর দুলছে একতালে ঝিল্লির ঝঙ্কার! মাঝে মাঝে দূর-বন থেকে ভেসে ভেসে আসছে হস্তীর চিৎকার! আমার তাঁবুর উপর থেকেও দু-তিনবার একটা প্যাঁচা ডাক দিয়ে যেন বলে বলে গেল—হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার!

আমি হুঁশিয়ার হয়েই রইলুম। বাইরের চোখ বুঁজে শুয়ে আছি

বটে, কিন্তু মনের চোখ খোলা আছে। তন্দ্রা অনেকবারই সোহাগ করে আমাকে ঘুম পাড়াতে এসেছিল, কিন্তু আজ আর তার কোন জারিজুরিই খাটল না! আমি জোর করে সারা রাত জেগে রইলুম।

তাঁবুর ফাঁক দিয়ে ভোরের আলো এল, কিন্তু রাত্রের চোর এল না। পাখিদের সমবেত চিৎকার শুনে মনে হল, আমার ব্যর্থতা দেখে তারা যেন আমাকে টিটকারি দিচ্ছে!

বিরক্ত মনে তাঁবুর পর্দা ঠেলে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালুম।

সর্দার কাছের একটা বাঁশঝাড়ের পাশে দাঁড়িয়েছিল। আমাকে দেখে এগিয়ে এসে সেলাম করলে।

আমি তিক্ত স্বরে বললুম, "সারারাত জেগে থাকাই সার হল। বদমাইস চোরটা কাল আসে নি।"

সর্দার বললে, "সে এসেছিল।"

—"এসেছিল!"

—"হ্যাঁ হুজুর, ঐ বাঁশঝাড়ের মধ্যে!"

—"ওর ভিতর দিয়ে রাত্রে বা দিনে কোন মানুষ আসতে পারে না।"

—"হুজুর, তাকে মানুষ মনে করছেন কেন?"

—"কি সর্দার, তুমিও কি তাকে পেত্নী বলে ভাবো?"

"আমি তাকে কি মনে করি, আল্লাই তা জানেন! কিন্তু সে ঐ বাঁশঝাড়ের মধ্যে এসেছিল, আমি কাল রাতে ঐখানে শুকনো পাতায় পায়ের শব্দ শুনেছি! আজ এখনি ঐ জায়গাটা আমি পরীক্ষা করে আসছি। বাঁশঝাড়ের তলাকার জমি এখনো পরশু-রাতের বৃষ্টিতে নরম হয়ে আছে। ঐ জমিতে আমি হাঁটু আর হাতের ছাপ দেখেছি। সে হামাগুড়ি দিয়ে বাঁশঝাড়ের তলা দিয়ে আসছিল। কিন্তু তার চোখ আমাদের চেয়ে ঢের-বেশি তীক্ষ্ণ, সে চোখ তো এখন আর মানুষের চোখ নয়! গাছের উপরে আমাকে সে নিশ্চয় দেখে ফেলেছে। তারপর আর কি সে বাঁশঝাড় ছেড়ে বাইরে বেরোয়?"

রুদ্ধ আক্রোশে আমি স্তব্ধ হয়ে রইলুম।

সর্দার আবার শুধোলে, "হুজুর, আমাদের তাঁবু তুলে এখান থেকে আজ রওনা হবার কথা। কখন যাবেন ?"

আমি দৃঢ়স্বরে বললুম, "আগে ঐ চোরকে ধরব, তবে এখান থেকে এক পা নড়ব! যদি একমাস এখানে থাকতে হয়, তাও থাকব! সর্দার, আজ তোমার তাঁবুটা আমার তাঁবুর পাশে এনে খাটিয়ে ফেলো। আজ রাত্রে তুমি আর গাছে চোড়ো না, নিজের তাঁবুর ভিতরে জেগে বসে থেকো। আমার তাঁবুতে আমিও জেগে থাকব। আমার ডাক শুনলেই তুমি বেরিয়ে এস।"

সর্দার ঘাড় নেড়ে জানালে, আচ্ছা।

সে রাতেও আবার জাগবার পালা। আকাশে চাঁদ জাগছে, বনে রক্তপিপাসা জাগছে, তাঁবুতে আমার চোখ জাগছে, বাঁশঝাড়ে চোর জাগছে! আর জাগছে নদী—যেন ঘুমপাড়ানি গান শোনাতে শোনাতে!

সর্দার বলে কি ?—'তাকে মানুষ মনে করছেন কেন ?' সে মানুষ নয়! সর্দারেরও মনে কুসংস্কারের উদয় হয়েছে ? আশ্চর্য কি, সেও তো আফ্রিকারই লোক! এই আফ্রিকা হচ্ছে বিশ্বের সমস্ত কুসংস্কারের স্বদেশ! এখানে আকাশে বাতাসে জলে স্থলে ঘুরে বেড়ায় শুধু ভূত আর পেত্নী! যে নরখাদক জন্তু বেশি মানুষ মারে, সে আর এখানে সাধারণ জন্তু থাকে না, লোকে বলে—দুষ্ট মানুষই নাকি ঝাড়ফুক তুকতাকের গুণে জন্তুর দেহ ধরে নর-নারীর ঘাড় ভাঙছে! তাই এদেশে ভূতের চেয়ে রোজার দল ভারি!

কাল সারা রাত কেটেছে অনিদ্রায়, আজও রাত দুপুর হয়ে গেছে। এইসব ভাবতে ভাবতে কখন যে তন্দ্রার আমেজ এসেছে বুঝতে পারি নি। হঠাৎ তাঁবুর ভিতরে খটমট করে জিনিস-নড়ার আওয়াজ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে চট করে আমার তন্দ্রার ঘোর কেটে গেল!

ঘরের ভিতরে কেউ এসেছে! ঘুটঘুটে অন্ধকারে তাকে দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু বিষম একটা পূতিগন্ধে চারিদিক বিষাক্ত হয়ে উঠেছে!

মানুষের গা দিয়ে এ-রকম দুর্গন্ধ বেরোয় না!

আমি শ্বাস রোধ করে পাথরের মতন স্থির ভাবে শুয়ে রইলুম। যে ঘরের ভিতরে এসে ঢুকেছে সেও নিসাড়,—তন্দ্রা ছুটে যাবার সময়ে হয়তো আমি সামান্য চমকে উঠেছিলুম, হয়তো সে দাঁড়িয়ে আমাকে তীক্ষ্ণনেত্রে পরীক্ষা করছে, হয়তো সে অন্ধকারেও দেখতে পায়!

এইভাবে মিনিট-পাঁচেক কাটল। নীরবতার ভিতরে কেমন-একটা বন্য শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ আমার কানকে আঘাত করতে লাগল বারংবার! আর সেই পূতিগন্ধ! উঃ, অসহনীয়!

আবার খট-খট করে শব্দ হল! কেউ আমার টেবিলের উপরে জিনিস-পত্তর নাড়াচাড়া করছে! আমি ঘুমোচ্ছি ভেবে নিশ্চয় সে নিশ্চিত হয়েছে!

আগে আন্দাজ করে নিলুম, চোর আমার টেবিলের কোন দিকে আছে। তারপর কোনরকম জানান না দিয়ে আচম্বিতে এক লাফ মেরে টেবিলের সেইদিকে লাফিয়ে পড়লুম এবং চোরকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরতে গেলুম—

—সঙ্গে সঙ্গে দুখানা অত্যন্ত-সবল বাহু আমাকে এমন প্রচণ্ড এক ধাক্কা মারলে যে, আমি আবার ছিটকে বিছানার উপরে এসে পড়লুম!

—দৈবগতিতে আমার হাত পড়ল 'ইলেকট্রিক টর্চের উপরে,—বন্দুকের সঙ্গে এটাকেও আমি প্রতি রাত্রে পাশে নিয়ে শয়ন করি।

টর্চটা তুলে নিয়েই টিপলুম চাবি এবং পর-পলকেই বৈদ্যুতিক আলো-প্রবাহের মধ্যে আমার চোখের সুমুখে যে-মুখখানা জেগে উঠল, তার স্মৃতি আমি জীবনে ভুলতে পারব না!

রাশীকৃত উচ্ছৃঙ্খল কিলবিলে কালো সাপের মতন কেশগুচ্ছের মধ্যে একখানা ভয়ানক কালো মুখ! সে মুখ স্ত্রীলোকের এবং সে মুখ মানুষের —এবং সে মুখ মানুষের নয়! ঐ অগ্নিবর্ষী দুটো ভাঁটার মতন ক্ষুধিত চক্ষু—তা মানুষের চোখ নয় কখনো! ঐ দংশনোদ্যত ক্রুদ্ধ নিষ্ঠুর দন্ত-গুলো—ওগুলো কি মানুষের দাঁত?

হঠাৎ তীব্র আলোক-ছটায় মূর্তির চোখছুটো নিশ্চয় অন্ধ হয়ে গিয়েছিল!

আমি চিৎকার করে ডাকলুম—"সর্দার, সর্দার, সর্দার!"

কান-ফাটানো ভয়াবহ এক গর্জনে আমার তাঁবুর ভিতরটা পরিপূর্ণ হয়ে গেল—কোন মানুষেরই কণ্ঠ সে-রকম অমানুষী গর্জন করতে পারে না!

শিউরে উঠে বিছানা থেকে তাড়াতাড়ি বন্দুকটা তুলে নিলুম এবং সেই মুহূর্তেই মূর্তিটা সাঁৎ করে তাঁবুর ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল!

এবং তারপরেই বাহির থেকে শুনলুম, ঘন ঘন হিংস্র গর্জন ও সর্দারের গলায় আর্তনাদের পর আর্তনাদ!

ঝড়ের বেগে বন্দুক নিয়ে বাইরে ছুটে গেলুম!

চাঁদের আলোয় সভয়ে দেখলুম, তাঁবুর দরজার সামনেই সর্দার মাটির উপরে পড়ে গোঁ-গোঁ ও ছটফট করছে এবং একটা ঘোর-কালো বিভীষণা নগ্ন মূর্তি সর্দারের দেহ বৃহৎ সর্পের মতন ছুই কৃষ্ণ বাহু দিয়ে চেপে রেখে তার টুঁটি কামড়ে ধরেছে প্রাণপণে! মূর্তিমতী হিংসা!

বন্দুক ছোঁড়বার উপায় নেই—সর্দারের গায়ে গুলি লাগবার ভয়ে। বন্দুক তুলে আমি সেই ভীষণ মূর্তির মাথায় কুঁদো দিয়ে করলুম প্রচণ্ড এক আঘাত!

মূর্তিটা তীব্র—তীক্ষ্ণ স্বরে পশুর মতন একটা বিশ্রী আর্তনাদ করে ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল—তার মাথার এলানো ঝাকড়া-চুলগুলো চারিদিকে ঠিক্‌রে পড়ল—তারপর সে আমাকে লক্ষ্য করে আহত কেউটের মতন এক লাফ মারলে—আমি ছুই পা পিছিয়ে এলুম এবং সে আবার ঘুরে মাটির উপরে আছাড় খেয়ে পড়ে মড়ার মতন স্থির হয়ে রইল।

সর্দারের কাছে দৌড়ে গেলুম, কিন্তু সে নিজেই উঠে বসল।

—"সর্দার, সর্দার, তোমার গলা দিয়ে রক্ত ঝরছে!"

সর্দার কাপড় দিয়ে ক্ষতস্থান চেপে ধরে বললে, "বেশি কামড়াতে

পারে নি, কিন্তু আপনি আর একটু দেরি করলেই আমি মারা পড়তুম! …কিন্তু—কিন্তু—ও কিসের আওয়াজ?" সে অত্যন্ত ভীত ভাবে চারিদিকে তাকাতে লাগল!

সত্য! নিঝুম রাত্রে আচম্বিতে অরণ্য যেন সজাগ হয়ে উঠেছে! মাটি থরথর করে কাঁপছে, বনের গাছ মড় মড় করে ভেঙে পড়ছে, বাঁশঝাড় টলমল করে টলছে! সঙ্গে সঙ্গে একটা একটানা অব্যক্ত, অদ্ভুত ও ভীতিময় সমবেত কণ্ঠধ্বনি ধীরে ধীরে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে!

ততক্ষণে আমাদের সমস্ত কুলি ঘটনাস্থলে এসে হাজির হয়েছে। প্রায় পরিপূর্ণ চন্দ্র তখন মাঝ-আকাশে সমুজ্জ্বল মহিমায় বিরাজ করছে, আলোআঁধারিমাখা অপূর্ব বনভূমির ধার দিয়ে চকচকে রুপোলি পাড়ের মতন নদীটি আপন মনে বয়ে যাচ্ছে কলসঙ্গীতে মুখর হয়ে, এবং তৃণ-শ্যামল ভূমির উপরে আঁচল বিছিয়ে দিয়েছে স্বপ্নময় জ্যোৎস্না!

কিন্তু এই সমস্ত সৌন্দর্যকেই ব্যর্থ করে দিলে সেই ক্রমবর্ধমান অজ্ঞাত সম্মিলিত কণ্ঠের ভয়-জাগানো কোলাহল! আমরা সকলে মিলে কি-একটা আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় অভিভূত হয়ে আড়ষ্ট নেত্রে অরণ্যের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম,—সর্দারও তাড়াতাড়ি উঠে আমার পাশে এসে দাঁড়াল তার চোখদুটো তখন ভয়ে যেন ঠিকরে পড়ছে!

পূর্বদিকের অরণ্যের ভিতর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ভীত পাখিরা ব্যাকুল স্বরে চিৎকার করে বাসা ছেড়ে উড়ে পালালো, গোটাকয়েক সোনালী বানর ও একটা চিতাবাঘ সামনের জমি পার হয়ে পশ্চিম দিকে বেগে দৌড় দিলে!

সর্দার অস্ফুট স্বরে কাঁপতে কাঁপতে বললে, "হুজুর, ঐদিকে! ঐদিক থেকেই ওরা আসছে!"

অভাবিত কোন বিভীষিকায় আমার গলা শুকিয়ে এসেছিল, কোন-রকমে জিজ্ঞাসা করলুম, "ওরা? ওরা মানে কারা?"

কিন্তু সর্দারের গলা দিয়ে আর কোন কথা বেরুলো না,—তার মুখ মড়ার মতন সাদা।

সেই বিপুল—অথচ অব্যক্ত কোলাহল তখন খুব কাছে এসে পড়েছে এবং মাটিতে তখন লেগেছে যেন ভূমিকম্পের ধাক্কা! আমি এমন অপার্থিব কোলাহল আর কখনো শুনিনি—এ মানুষের কোলাহল নয়, কিন্তু এ-রকম কোলাহল তুলতে পারে এমন কোন জন্তুও পৃথিবীতে আছে বলে জানি না!

হঠাৎ পূর্বদিকের বাঁশঝাড়ে যেন ঝড়ের মাতন লাগল—কতকগুলো খুব-বড় বাঁশ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে গেল!

তারপরেই—ও কি ও? ওরা কারা? জ্যোৎস্নাময় রাত্রে অরণ্যের স্বচ্ছ ছায়ায় দেখা যাচ্ছে এক জমাট অন্ধকারের জীবন্ত প্রাচীর!

স্তম্ভিত নেত্রে ভালো করে তাকিয়ে দেখলুম, সেই অন্ধকার-প্রাচীরের যেন অসংখ্য বাহু আছে—বাহুগুলো মানুষের বাহুর মতন!

এমন সময়ে আমার পাশ থেকে একটা কালো বীভৎস মূর্তি বিদ্যুতের মতন ছুটে বেরিয়ে গেল—সে ছুটছে ঐ অগণ্য বাহুকণ্টকিত জীবন্ত অন্ধকার-প্রাচীরের দিকেই!

এক পলকের জন্যে ফিরে দেখলুম, মাটির উপরে সেই অচেতন দানবী-মূর্তিটা আর নেই—কখন তার জ্ঞান হয়েছে আমরা কেউ দেখতে পাই নি, দেখবার সময়ও ছিল না!

দেখতে দেখতে মূর্তিটা সেই বিরাট অন্ধকার-প্রাচীরের ভিতরে মিলিয়ে গেল!

আমি সেইদিকে লক্ষ্য করে বন্দুক তুলে গুলির পর গুলি ছুঁড়তে লাগলুম,—উত্তেজনায়, দুর্ভাবনায়, ভয়ে ও বিস্ময়ে আমি যেন পাগলের মতন হয়ে উঠলুম—কাল রাত্রে টোটার মালা পরেই শুয়েছিলুম—বন্দুকে গুলি ভরি, আর ছুঁড়ি! নৈশ আকাশ আমার বন্দুকের ঘন ঘন গর্জনে বিদীর্ণ হয়ে যেতে লাগল, কতবার যে বন্দুক ছুঁড়লুম তা আমি জানি না!

হঠাৎ সর্দার আমার হাত চেপে ধরে বললে, "হুজুর, মিথ্যে আর টোটা নষ্ট করছেন কেন?"

তখন আমার হুঁশ হল। চক্ষের উদভ্রান্ত ভাব কেটে গেল, পূর্বদিকে তাকিয়ে আর সেই জীবন্ত অন্ধকার-প্রাচীরকে দেখতে পেলুম না! সেই অব্যক্ত ভীম-কোলাহলের বিভীষিকাও আর নেই এবং বাঁশঝাড়ও আঁকা-ছবির মতন একেবারে স্থির!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি মাটির উপরে বসে পড়লুম।

শ্রান্ত স্বরে বললুম, "ওরা কারা আসছিল?"

—"গরিলারা।"

—"গরিলারা? কেন?"

—"টানাকে নিয়ে যাবার জন্যে।"

—"টানা আবার কে?"

—"যে চুরি করতে রোজ আপনার তাঁবুর ভিতরে ঢুকত!"

—"সর্দার, তুমি কি পাগল হয়ে গিয়েছ? তুমি কি বলছ কিছুই বুঝতে পারছি না!"

—"হুজুর, টানা হচ্ছে মানুষের মেয়ে। তার বয়স যখন একবছর, গরিলারা তখন তাকে চুরি করে নিয়ে পালায়। সে আজ পনেরো বছর আগেকার কথা। সেইদিন থেকেই সে গরিলাদের সঙ্গে সঙ্গে আছে, মানুষ হলেও তার ব্যবহার এখন গরিলারই মতন। অনেকদিন আগে আমি এই গল্প শুনেছিলুম, কিন্তু টানাকে আজ প্রথম দেখলুম। আল্লার কাছে প্রার্থনা তাকে যেন আর কখনো না দেখতে হয়।"

চন্দ্রলেখায় সুদূর বনভূমিকে পরি-পুরীর মতন দেখাচ্ছে। মানুষের মেয়ে টানা,—কিন্তু মানুষ এখন তার কাছে শত্রুর জাতি! হয়তো বনের ভিতরে বসে টানার গরিলা-অভিভাবকরা এখন তার মাথার ব্যাথায় আদর করে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে! আচ্ছন্নের মতন বনের দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে বসে রইলুম! কী বিস্ময়কর এই বিচিত্র জগৎ।

তৃতীয়

সিংহের গহ্বরে

আমি তখন আফ্রিকার উগাণ্ডা প্রদেশে।

একটা সিংহ আমার বন্দুকের গুলিতে জখম হয়ে পালিয়ে গিয়েছে,—মাটির উপরে রক্তের দীর্ঘ রেখা রেখে। সেই রক্তের দাগ দেখে দেখে আমি সিংহের খোঁজে এগিয়ে চলেছি। আমার সঙ্গে আছে কাফ্রি-জাতের কয়েকজন লোক।

সামনেই মস্ত এক পাহাড়। একটা পথ সমতল ক্ষেত্র থেকে পাহাড়ের উপরে উঠে মিলিয়ে গেছে। সেই পথ দিয়েই যে সিংহটা পলায়ন করেছে, তার স্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পেলুম।

আমি পাহাড়ের উপরে ওঠবার উপক্রম করছি,—এমন সময়ে কাফ্রিদের দলের সর্দার আমাকে বাধা দিয়ে বললে, "হুজুর, ও পাহাড়ে উঠবেন না!"

"কেন?"

—"ও হচ্ছে শয়তানের পাহাড়!"

বিস্মিত হয়ে বললুম, "শয়তানের পাহাড়! সে আবার কি?"

সর্দার মুখখানা বেজায় গম্ভীর করে বললে, "ও পাহাড়ের শেষ নেই। ওর ভেতরে কারা থাকে তা আমি দেখি নি, কিন্তু শুনেছি তারা মানুষ নয়।"

—"তা আর আশ্চর্য কি? বনে-জঙ্গলে তো মানুষের বাস না-থাকবারই কথা। আর আমি তো এখানে মানুষ শিকার করতে আসিনি!"

—"না, হুজুর! আপনি আমার কথা বুঝতে পারছেন না! ও পাহাড়ের ভেতরে আছে জুজুদের রাজ্য। তাদের চেহারা দেখলেই মানুষের প্রাণ

বেরিয়ে যায়!"

—"কি বলছ সর্দার, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে! জুজু-টুজু আমি মানি না,—আমি ওখানে যাবই! এস আমার সঙ্গে!"

সর্দার ভয়ে আঁৎকে উঠে দু-পা পিছিয়ে গিয়ে বললে, "আমি? এত তাড়াতাড়ি মরতে রাজি নই! আমার দলের কেউই ওখানে যাবে না, —হুজুর বরং নিজেই জিজ্ঞাসা করে দেখুন!"

আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতেও হল না—দলের সবাই একবাক্যে বলে উঠল, "আমরা কেউ যাব না!"

ফাঁপরে পড়ে গেলুম। যে-সিংহটার পিছু নিয়েছি, তেমন প্রকাণ্ড সিংহ বড়-একটা চোখে পড়ে না। বন্দুকের গুলিতে সে এমন সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়েছে যে, আর বেশিদূর পালাতে পারবে বলেও মনে হয় না। এমন একটা শিকারকে হাতছাড়া করব?

যা থাকে কপালে, এগিয়ে পড়ি! এই ভেবে বললুম, "আচ্ছা সর্দার, তোমরা তবে আমার জন্যে এইখানেই অপেক্ষা কর,—আমি সিংহটাকে শেষ করে ফিরে আসছি!"

সর্দার বললে, "হুজুর আমার কথা শুনুন, ঐ জুজু-পাহাড়ে গেলে কোন মানুষ আর বাঁচে না!"

অসভ্যদের কুসংস্কার দেখে আমার হাসি পেল। আমি আর কোন জবাব না দিয়ে, রক্তের চিহ্ন ধরে ধীরে ধীরে পাহাড়ের পথ বেয়ে উপরে উঠতে লাগলুম।

আহত ব্যাঘ্র বা সিংহ যে কি বিপদজনক জীব প্রত্যেক শিকারীই তা জানে। কাজেই খুব হুঁশিয়ার হয়ে বন্দুক তৈরি রেখেই আমি এগিয়ে চলেছি।

প্রায় তিন-শো ফুট উপরে উঠে দেখলুম, রক্তের দাগ হঠাৎ পথ ছেড়ে ডানদিকের এক জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে ঢুকেছে। সে এমন ঘন জঙ্গল যে, তার ভিতরে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই অসম্ভব।

আমাকে তখন শিকারের নেশায় পেয়ে বসেছে। একটুও ইতস্তত

না করে আমি হাঁটু গেড়ে বসে পড়লুম, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে জঙ্গল ভেদ করে অগ্রসর হলুম। জঙ্গলের নিবিড়তা দেখে বেশ বোঝা গেল, এ তল্লাটে কোনদিন কোন মানুষের পা পড়েনি। চারদিক ভয়ানক নির্জন। যেখান দিয়ে যাচ্ছি, দিনের বেলাতেও সেখানে আলো ঢোকে না।

হঠাৎ বাধা পেলুম। পাহাড়ের গায়ে সুমুখেই একটা গুহা রয়েছে এবং রক্তের দাগ গিয়ে ঢুকেছে সেই গুহার মধ্যেই।

আহত সিংহটা আছে তাহলে ঐ গুহার ভিতরেই? হয়তো ঐ গুহাটাই হচ্ছে তার বাসা!

গুহার ভিতরে কী অন্ধকার! অনেক উঁকিঝুঁকি মেরেও কিছুই দেখতে পেলুম না। সিংহটারও কোন সাড়া নেই। হয়তো ভিতরে বসে সেও আমার গতিবিধি লক্ষ্য করছে! হয়তো আচম্বিতে মহা ক্রোধে আমার উপরে সে লাফিয়ে পড়বে!

কাছে ইলেকট্রিক টর্চ ছিল। টর্চটা জ্বেলে গুহার ভিতরে আলো ফেললুম। সঙ্গে সঙ্গে দেখলুম, গুহার মুখ থেকে হাত-পাঁচেক তফাতেই প্রকাণ্ড একটা সিংহের দেহ মেঝের উপরে কাৎ হয়ে পড়ে রয়েছে!

টর্চের তীব্র আলোতেও সিংহটা একটুও নড়ল না। খানিকক্ষণ লক্ষ্য করতেই বুঝলুম, তার দেহে শ্বাস-প্রশ্বাসেরও লক্ষণ নেই! সিংহটা মরেছে!

কিন্তু সাবধানের মার নেই। আহত জন্তুরা অনেক সময়ে এমনি মরণের ভান করে। তারপর হঠাৎ শিকারীর ঘাড়ের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরণ-কামড় বসিয়ে দেয়! কাজেই টর্চটা কৌশলে জ্বেলে রেখেই সিংহটার দেহের উপরে আরো দু-দুটো গুলিবৃষ্টি করলুম। তার দেহ তবু একটুও নড়ল না। তখন নিশ্চিন্ত হয়ে আমি গুহার ভিতরে প্রবেশ করলুম। এত কষ্ট সার্থক হল বলে আমার প্রাণ তখন আমোদে মেতে উঠেছে!

গুহাটা ছোট। কিন্তু কী ভীষণ স্থান! মাথার উপরে কালো পাথর, আশে পাশে কালো পাথর, পায়ের তলায় কালো পাথর—আর তাদের

গায়ে মাখানো কালো অন্ধকার! সেই কালোর ঘরে চারিদিকে বিশ্রী ভয়াবহ ভাব সৃষ্টি করে মেঝের উপরে সাদা-ধবধবে যে-জিনিসগুলো পড়ে রয়েছে, সেগুলো মাংসহীন হাড় ছাড়া আর-কিছুই নয়! হয়তো তার ভিতরে মানুষেরও হাড়ের অভাব নেই!

মানুষের কথা মনে হতেই আর-একটা জিনিস আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে।

গুহার কোণে হাড়ের রাশির সঙ্গে কালো-রঙের কি-একটা পড়ে রয়েছে। বন্দুকের নল দিয়ে নেড়েচেড়ে বোঝা গেল সেটা একটা জামা ছাড়া আর-কিছুই নয়!

জামা! কোট! তাহলে এ সিংহটার মানুষ খাওয়ারও অভ্যাস ছিল!

বন্দুকের সাহায্যে কোটটাকে উপরে তুলতেই কি-একটা জিনিস তার ভিতর থেকে মাটিতে পড়ে গেল।

হেঁট হয়ে দেখি, একখানা পকেট বই! সিংহের আক্রমণে যার প্রাণের প্রদীপ নিবে গেছে, নিশ্চয়ই এটি সেই হতভাগ্যেরই সম্পত্তি!

খুব সম্ভব এটি কোন শ্বেতাঙ্গ শিকারীর জিনিস। ওর ভিতরে হয়তো তার পরিচয় লেখা আছে, এই ভেবে আমি পকেট-বইখানা কৌতূহলী হয়ে কুড়িয়ে নিলুম।

পকেট-বইখানা খুলে, তার উপরে টর্চের আলো ফেলেই চমকে উঠলুম!

এর পাতায় পাতায় যে বাংলাতে অনেক কথা লেখা রয়েছে!

আমার মন বিপুল বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল! কোথায় বাংলা-দেশ, আর কোথায় উগাণ্ডার সিংহ-বিবর! ঘরমুখো বাঙালী এতদূরে ছুটে এসেছে নিষ্ঠুর সিংহের ক্ষুধার খোরাক যোগাবার জন্যে!

তারপরেই মনে হল,—এ ব্যাপারে আর যে-কেহ অবাক হতে পারে, কিন্তু আমার আশ্চর্য হওয়া উচিত নয়। কারণ, আমিও তো বাঙালী—এবং আমিও তো আজকেই সিংহের খোরাক হলেও হতে পারতুম। তার-পর ঐ হতভাগ্যের মতন আমারও হাড়গুলো হয়তো এখানকার অস্থি-

স্তূপকে আরো-কিছু উঁচু করে দিত। সে হাড়গুলো দেখে কেউ আমার কোন পরিচয়ই জানতে পারত না!

সেই ভীষণ গুহার—হিংসার ও হত্যার গুহার এবং তার সামনেকার জঙ্গলের ভিতর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে বাইরের খোলা হাওয়ায় এসে দাঁড়ালুম।

তারপরেই মনে পড়ল কাফ্রিদের ভয়ের কথা—শিকারের উত্তেজনায় এতক্ষণ যে-কথা ভুলে গিয়েছিলুম!

ওরা এই পাহাড়টাকে জুজু-পাহাড় নাম দিয়েছে। কেন? ওরা বলে, এখানে যারা থাকে, তাদের দেখলেই মানুষ মরে যায়। কেন? এ-মুল্লুকের কোন মানুষই এ-পাহাড়ের ত্রিসীমানায় আসে না। কেন?

তীক্ষ্ণ চোখে চারিদিকে তাকিয়ে এই-সব 'কেন'র জবাব খোঁজবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই আবিষ্কার করতে পারলুম না। নির্জন পথ, নির্জন পাহাড়, নির্জন অরণ্য! নিস্তব্ধতা ও নির্জনতার উপরে ধীরে ধীরে গোধূলির ম্লান আলো নেমে আসছে। এই নিস্তব্ধতা ও নির্জনতা কেমন অস্বাভাবিক বলে মনে হল। তা ছাড়া আমার মনে কোনরকম ভয়ের ভাবই জাগল না।

সন্ধ্যা আসছে,—এখানে আর অপেক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত নয়। তাড়াতাড়ি পাহাড় থেকে নেমে এলুম।

কাফ্রিদের সর্দারের মুখের ভাব দেখেই বুঝলুম, আমি যে আবার ফিরে আসব, এ আশা সে করে নি!

আমি হেসে বললুম, "সর্দার, আমার মুখের পানে অমন হাঁ করে তাকিয়ে আছ কেন? ভয় নেই, এখনো আমি ভূত হই নি!"

সর্দার খুব ভীত কণ্ঠে খুব মৃদুস্বরে বললে, "আপনি তাদের দেখেছেন?"

—"কাদের?"

—"যারা মানুষ নয়?"

—"হ্যাঁ, মানুষ নয় এমন একটা জীবকে আমি দেখেছি বটে!"

সর্দার ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল, তার মুখ দিয়ে আর কথা বেরুলো না!

তার ভাব দেখে আমি হো-হো করে হেসে উঠে বললুম, "হ্যাঁ সর্দার! মানুষ নয় এমন একটা জীবকে আমি সত্যিই দেখেছি—আর সে-জীবটা হচ্ছে আমাদেরই সেই আহত সিংহটা! একটা গুহার ভেতরে সে মরে কাঠ হয়ে আছে!"

সর্দারের যেন বিশ্বাস হল না। থেমে থেমে বললে, "আর কিছুই দেখেন নি হুজুর?"

—"কিছু না—কিছু না—একটা নেংটি ইঁদুর পর্যন্ত না!"

সর্দার তখন আশ্বস্ত হয়ে বললে, "তাহলে আপনি ভাগ্যবান পুরুষ। ও পাহাড়ে যারা যায়, তারা আর ফেরে না।"

আমি বললুম, "আচ্ছা সর্দার, বলতে পারো, আমার আগে ও-পাহাড়ে আর কোন বাঙালী কখনো গিয়েছিল?"

—"হ্যাঁ হুজুর, গিয়েছিল। ঠিক এক বছর আগে! আমিই তাকে পথ দেখিয়ে এখানে নিয়ে এসেছিলুম। আপনার মতন সেও আমার কথা শোনে নি। আমার মানা না মেনেই সেই বাবু ঐ পাহাড়ের ভেতরে যায়। কিন্তু সে বাবু আর ফিরে আসে নি।"

আমি বললুম, "কেমন করে সে ফিরবে? তার হাড় যে সিংহের গর্তের ভিতরে পড়ে রয়েছে!"

কিন্তু সেই বাঙালী বাবুর প্রাণ গেছে যে সিংহের কবলে, সর্দার একথা বিশ্বাস করতে চাইলে না। সে 'শয়তান', 'জুজু' ও আরো কত কি নাম করে নানান কথা বলতে লাগল—কিন্তু সে-সব কথায় আমি আর কান পাতলুম না।

পকেট-বুকখানা এখন আমার পকেটেই আছে। ঠিক করলুম 'ক্যাম্পে' ফিরেই সেখানা ভালো করে পড়ে মৃত বাঙালীটির পরিচয় জানবার চেষ্টা করব।

আহা, বেচারী! হয়তো তার মৃত্যু-সংবাদ এখনো তার আত্মীয়-স্বজনরা জানতেও পারে নি!

চতুর্থ

পিপের চোখ

খাওয়া-দাওয়ার পর রাত্রে ক্যাম্প-খাটে শুয়ে সেই পকেট-বুক বা ডায়েরিখানা পড়তে শুরু করলুম।

যতই পড়ি, অবাক হয়ে যাই! এ এক অদ্ভুত, বিচিত্র, অমানুষিক ইতিহাস বা আত্মকাহিনী, গোড়ার পাতা পড়তে আরম্ভ করলে শেষ পাতায় না গিয়ে থামা যায় না। এমন আশ্চর্য কাহিনী জীবনে আর কখনো আমি শুনিনি—শুনব বলে কল্পনাও করি নি!

শহরে বসে কারুর মুখে এ-কাহিনী শুনলে কখনো বিশ্বাস করতুম না। কেউ একে সত্য বলে চালাবার চেষ্টা করলে তাকে নিশ্চয়ই আমি পাগলা-গারদে পাঠাতে বলতুম।

কিন্তু এইখানে,—আফ্রিকার এই বনে! এখানে বসে আজ সবই সম্ভব বলে মনে হচ্ছে! তাঁবুর পর্দা তুলে একবার বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলুম।

কী পরিষ্কার রাত! আকাশে যেন জ্যোৎস্নার সমুদ্র এবং বাতাসে যেন জ্যোৎস্নার ঝরণা! ঐ তো জুজু-পাহাড়,—তার মেঘ-ছোঁয়া শিখরের উপরে পূর্ণচাঁদের রৌপ্য-মুকুট! পাহাড়ের নিচের দিক গভীর জঙ্গলে ঢাকা—মানুষ যার মধ্যে ভরসা করে ঢোকে না। কিন্তু ফুটফুটে চাঁদের আলোয় এই ভয়াল গহন-বনকেও দেখাচ্ছে আজ চমৎকার।

এই আনন্দময় সুন্দর চন্দ্রালোকের মধ্যেও যে অরণ্যের চিরন্তন নাট্যলীলা বন্ধ হয়ে নেই, তার সাড়াও কানের কাছে বেজে উঠছে অনবরত। কাছে, দূরে, আরো-দূরে বনের মাটি কাঁপিয়ে ঘন ঘন বজ্র-ধ্বনির মতন সিংহদের ক্ষুধার্ত গর্জন শোনা যাচ্ছে, সভয়ে হুদ্দুড়িয়ে

জেব্রার দল পলায়ন করছে—তাদের অসংখ্য ক্ষুরের শব্দ! হায়েনারা থেকে থেকে রাক্ষুসে অট্টহাসি হাসছে! গাছের উপরে বানরদের পাড়ায় কিচির-মিচির আওয়াজ এবং হয়তো সাপের মুখে পড়ে কোন পাখি মৃত্যু-যাতনায় আর্তনাদ করে উঠল ও তাই শুনে আশপাশের পাখিরা সচকিত হয়ে ডানা ঝাপটা দিলে! মাঝে মাঝে তক্ষকের মতন কি-একটা জীব ডেকে উঠে যেন জানিয়ে দিচ্ছে, এই জীবনযুদ্ধক্ষেত্রে সেও একজন যোদ্ধা! প্যাঁচারা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে উড়ে যাচ্ছে—রাত্রিকে যেন বিষাক্ত করে! এই সব শব্দ রেখার মতন এসে পড়ছে যেন শব্দময় আর-একখানা বিরাট পটের উপরে এবং তা হচ্ছে অনন্ত অরণ্যের অশ্রান্ত, অব্যক্ত ধ্বনি! শব্দ-পটের উপরে শব্দ-রেখা পড়ে এঁকে যাচ্ছে এক বিচিত্র শব্দচিত্র!

তাঁবুর দরজা থেকে অল্প তফাতে হিংস্র পশুদের ভয় দেখাবার জন্যে আগুন জ্বেলে, বসে বসে গল্প করছে কাফ্রি বেয়ারা ও কুলিরা। তাদের কালো কালো মুখগুলোর খানিক খানিক অংশ আগুনের আভায় লাল দেখাচ্ছে। তাদের ভাষা জানিনা, তারা কি গল্প করছে তাও জানিনা, তবে একটা বিশেষ কথা বার বার আমার কানের কাছে বাজতে লাগল। তারা বারংবার উত্তেজিত স্বরে বলে বলে উঠছে, "জুজু! জুজু! জুজু!"

বুঝলুম, এখনো তাদের ভিতরে ঐ জুজু-পাহাড় নিয়েই আলোচনা চলছে! এরা হচ্ছে সরল অসভ্য মানুষ,—শহুরে সভ্য মানুষের মনের মতন এদের মন নানা চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে নেই, তাই এদের মাথার ভিতরে একটা কোন বিশেষ নতুন চিন্তা ঢুকলে এরা সহজে আর সেটা ভুলতে পারে না।

কিন্তু জুজু-পাহাড়ের যে-বিভীষিকা এদের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, সত্যসত্যই সেটা কি কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়?

এই অজানা বাঙালীর লেখা ডায়েরিখানা পড়বার পর সে কথা তো আর জোর করে বলতে পারি না! এ ডায়েরি যিনি লিখেছেন তিনি ওদের মতন অসভ্য নন। লেখার ভাষা দেখেই বুঝেছি, তিনি সুশিক্ষিত

ব্যক্তি। তিনি যে কোন ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের বর্ণনা দেন নি, লেখা পড়লে তাও জানা যায়। কিন্তু যে-সব কথা তিনি লিখেছেন—

হঠাৎ তাঁবুর পর্দা ঠেলে কাফ্রিদের সর্দার ভিতরে প্রবেশ করল। তার মুখে ভয় ও উদ্বেগের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে !

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "কি ব্যাপার, সর্দার ?"

সে বললে, "আপনি কি এখানে শিকারের জন্যে আরো কিছুদিন থাকবেন ?"

—"হ্যাঁ। এখানে দেখছি খুব সহজেই শিকার পাওয়া যায়। দিন-পনেরো এখানেই থেকে যাব মনে করছি।"

সর্দার বললে, "তাহলে আমাদের বিদায় দিন। আমরা কাল সকালেই এখান থেকে পালাতে চাই !"

আশ্চর্য হয়ে বললুম, "সে কি ! কেন ?"

সর্দার বললে, "এ-জায়গায় জ্যান্ত মানুষের থাকা উচিত নয় ! এখানকার ইট-কাঠ-পাথরের ওপরেও জুজুর অভিশাপ আছে !"

আমি হেসে উঠে বললুম, "সর্দার ! আবার তুমি পাগলামি শুরু করলে ?"

সর্দার মাথা নেড়ে বললে, "না হুজুর, না ! এ পাগলামির কথা নয়। আজ এইমাত্র স্বচক্ষে যা দেখলুম !"

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "স্বচক্ষে কী তুমি দেখেছ ? ভূত? জুজু ? পেত্নী ? না রাক্ষস ?"

সর্দার অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললে, "না হুজুর, না ! এ-সব ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা করা ভালো নয়। আজ আমি স্বচক্ষে যা দেখেছি, আর একবার তা দেখলে আমি আর বাঁচব না !"

অধীর ভাবে বললুম, "কিন্তু তুমি কি দেখেছ, আগে সেই কথাটাই বল না !"

—"আমরা জানতুম হুজুর, জুজুরা ঐ পাহাড়ের বাইরে আসে না। তাই আমরা নির্ভয়ে এদিকে-ওদিকে চলা-ফেরা করে বেড়াচ্ছিলুম।

কিন্তু আজ দেখছি, জুজুরা পাহাড় ছেড়ে নিচেও নামে। বোধহয় এটা আপনার দোষেই। আপনি আমাদের বারণ শুনলেন না। মানুষ হয়েও পাহাড়ে উঠে জুজু-পাহাড়ের পবিত্রতা নষ্ট করলেন! তাই আপনাকে শাস্তি দেবার জন্যে তারা পাহাড় ছেড়ে নেমে এসেছে।"

আমি শুয়েছিলুম। এইবারে উঠে বসে বিরক্ত স্বরে বললুম, "সর্দার! হয় তুমি কি দেখেছ বল, নয় এখান থেকে চলে যাও! তোমার বাজে বকুনি শোনবার সময় আমার নেই।"

সর্দার বললে, "একটু আগে আমি নদী থেকে এক বালতি জল আনতে গিয়েছিলুম। ফেরবার সময়ে ঠিক আমার সুমুখ দিয়েই একটা জিনিস গড়াতে গড়াতে তীরবেগে এধার থেকে পথ পার হয়ে ও-ধারের জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে গেল। ধবধবে চাঁদের আলোয় সে-জিনিসটাকে আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম।"

—"সে জিনিসটা কি? কোন জন্তু-টন্তু?

—"না।"

—"মানুষও নয়?"

—"না। একটা ছোট পিপে।"

আমি বাধো-বাধো স্বরে বললুম, "একটা—ছোট—পি-পে?"

—"হ্যাঁ হুজুর। একটা ছোট পিপে। কে কবে দেখেছে, পিপে আবার জ্যান্ত হয়ে গড়িয়ে বেড়ায়?"

—"হয়তো কেউ তোমাকে ভয় দেখাবার জন্যে পিপেটাকে ধাক্কা মেরে গড়িয়ে দিয়েছিল!"

—"না হুজুর! আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি, সেখানে আমি ছাড়া আর জনপ্রাণী ছিল না। তারপর, আরো শুনুন। আমি বেশ ভালো করেই দেখেছি, সেই চলন্ত পিপেটার ভেতর থেকে দু-দুটো জ্বলন্ত রাক্ষুসে চোখ ভয়ানক ভাবে কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে! জলের বালতিটা সেখানেই ফেলে চোঁ-চা দৌড় মেরে আমি পালিয়ে এসেছি। পিপে যেখানে হেঁটে বেড়ায় আর চোখ-কটমটিয়ে

তাকায়, সেখানে আর আমাদের থাকা চলে না। আমরা কাল সকালেই এ মুলুক ছেড়ে সরে পড়ব !"—এই বলে সর্দার চলে গেল।

এবার আর সর্দারের কথা আমি হেসে উড়িয়ে দিতে পারলুম না। কারণ এই ডায়েরিখানা আমি পড়েছি। সর্দারের কথা মিথ্যা বললে, যিনি ডায়েরি লিখেছেন তাঁকেও মিথ্যাবাদী বলতে হয় !

অবশ্য ডায়েরির অনেক জায়গায় চোখ বুলিয়ে আমার সন্দেহ হয়েছে বটে যে, আমি যেন কোন ছেলে-ভুলানো হাসির গল্প বা মজার রূপকথা পড়ছি, কিন্তু তবু লেখককে একেবারে অবিশ্বাস করতে পারছি না। হয়তো মাঝে মাঝে বর্ণনার অত্যুক্তি বা অতিরঞ্জন আছে,—সত্যিকার জীবনের কথা লিখতে বসেও অধিকাংশ লেখক যে লোভ সম্বরণ করতে পারেন না ! কিন্তু···কিন্তু, বিংশ শতাব্দীর কলেজে-পড়া মোটরে-চড়া বিজ্ঞান-জানা সভ্য মানুষ আমি, একটা অসভ্য কাফ্রীর কথা শুনে এবং একজন অচেনা মৃত ব্যক্তির ডায়েরির পাতা উল্টে এমন-ধারা অদ্ভুত কাণ্ডকে ধ্রুবসত্য বলে একেবারে বিনা-দ্বিধায় মেনে নেব ?

কে জানে, ডায়েরি যিনি লিখেছিলেন, তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল কিনা ? কে জানে, তিনি "গালিভারের ভ্রমণ-কাহিনী"র মতন একখানা কাল্পনিক উপন্যাস রচনা করে গেছেন কিনা ? হয়তো আজ তিনি এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারতেন। কিন্তু মৃত্যু যাঁর মুখ বন্ধ করে দিয়েছে, তাঁর কাছ থেকে আর কোন উত্তর পাবারই আশা নেই।

তারপরেই মনে হল, তবু সর্দার আজ এখনি যে গল্প বলে গেল, তার সত্য-মিথ্যা তো আমি পরীক্ষা করে দেখতে পারি ? ডায়েরির গল্পের সঙ্গে সর্দারের গল্পের কিছু-কিছু মিল আছে। কেমন করে এমন মিল সম্ভবপর ? সর্দারের গল্প যদি সত্য হয়, তাহলে ডায়েরির গল্প সত্য বলে মানা যেতে পারে। এমন একটা অসম্ভব বিস্ময়কর সত্যের সঙ্গে চাক্ষুস পরিচয়ের এই সুযোগ ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় !

তখনি 'ক্যাম্প' খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালুম এবং শিকারের পূর্ণ-পোশাক পরতে লাগলুম। পোশাক পরতে পরতে মনের ভিতরে কেমন

একটা বিপদের সাড়া জেগে উঠল। কিন্তু সে ভাবটাকে আমি মনের ভিতরে স্থায়ী হতে দিলুম না।

বাংলার সবুজ কোলের শান্তি ছেড়ে যে লোক সুদূর আফ্রিকার নিবিড় জঙ্গলে কালো অন্ধকারের ভিতরে সিংহ, হাতি, গণ্ডারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছে নির্ভয়ে এবং যার হাতে আছে বুলেট-ভরা বন্দুক ও কোমরে আছে ছ-নলা রিভলভার আর শিকারের ছোরা, বিপদের সামনে যেতে সে কেন ইতস্তত করবে? এই বিপদের গভীর আনন্দকে সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় উপভোগ করতে পারে বলেই পৃথিবীতে মানুষ আজ শ্রেষ্ঠ জীব হতে পেরেছে! উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু, আমেরিকা, উড়ো-জাহাজ ও ডুবো-জাহাজ প্রভৃতি আজ আবিষ্কৃত হয়েছে কেন? বিপদের দৌলতে! এই সব আবিষ্কারের জন্যে কত মানুষ হাসতে হাসতে প্রাণ দিয়েছে এবং কত মানুষ হাসতে হাসতে মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা ভোগ করেছে! অধিকাংশ আবিষ্কারের মূলেই আছে এই বিপদের আনন্দ! যে-জাতি এই বিপদের সাধনা শিখতে পারে, সে-জাতির উন্নতির পথে কোন বাধাই টঁ্যাকে না।

এমনি সব ভাবতে ভাবতে পোশাক পরা শেষ হল। কোমরের বেল্টে একটা টর্চ তো গুঁজে নিলুমই, তার উপরে পেট্রল-জ্বলা একটা স্থির-বিদ্যুতের মতন অতি-উজ্জ্বল আলোর লণ্ঠনও নিতে ভুললুম না! আধা-অন্ধকারে অনেক সময়ে একটা বৃক্ষশাখার আবছায়া নড়লেও অন্য-কিছু বলে ভ্রম হয়। স্পষ্ট আলো সন্দেহ দূর করে।

তাঁবুর বাইরে এসেই দেখি, কাফ্রি কুলীরা তাদের মোটমাট বাঁধতে বসেছে। সর্দারকে ডেকে শুধলুম, "এ-সব কি হচ্ছে?"

সর্দার বললে, "ওরা সবাই ভয় পেয়েছে। অনেকে আজ রাতেই পালাবে। ...কিন্তু আপনি কোথায় যাচ্ছেন?"

আমি বললুম, "নদীর ধারে।"

—"নদীর ধারে! কেন হুজুর?"

—"তুমি আমার কাছে যা বলে এলে, তা সত্যি কিনা দেখবার জন্যে!"

সর্দারের মুখ দেখে মনে হল, সে যেন নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছে না।…খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সে বললে, "হুজুর অমন কাজ করবেন না! নদীর ধারে আজ জুজুর অভিশাপ জেগে উঠেছে, জ্যান্ত মানুষ সেখানে গেলে আর ফিরবে না। আজ সেখানে একলা গেলে আপনার মৃত্যু নিশ্চিত!"

—"কেন, একলা কেন, তুমিই আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল—কোন ভয় নেই।"

সর্দার আঁৎকে উঠে বললে, "আমি যাব আপনার সঙ্গে? বলেন কি হুজুর। আমি তো পাগল হই নি! ঘরে আমার বউ-ছেলে আছে, আমি কি সখ করে আত্মহত্যা করতে পারি?"

—"বেশ, তুমি যেয়োনা। কিন্তু নদীর কোন্ পথে তুমি সেই ব্যাপারটা দেখেছিলে?"

সর্দার আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, "এই সামনের পথ দিয়েই চলে যান। নদী খুব কাছেই। …কিন্তু হুজুর, এখনো আমার কথা শুনুন, মানুষ হয়ে জুজুর সামনে যাবেন না।"

আমি তার কথার জবাব না দিয়ে অগ্রসর হলুম।

আজ যে পৃথিবীময় চাঁদের আলোর ছড়াছড়ি, একথা আগেই বলেছি। চারিদিক ধবধব করছে। নদীর ধারে যাবার পথের রেখা একটা ঘুমন্ত ও অতিকায় অজগরের মতন এঁকে-বেঁকে স্থির হয়ে আছে। পথের দু-ধারে ঘন জঙ্গল চাঁদের আলোয় যেন স্বপ্ন-মাখানো। সেই জঙ্গলের মাঝখানে জুজু-পাহাড়ের মাথা উঁচু হয়ে উঠে যেন নীল-আকাশকে ছুঁ মারতে চাইছে।

চারিদিক নির্জন হলেও নিস্তব্ধ নয়। অরণ্যের রহস্যময় বিচিত্র শব্দগুলো এখনো অবিরাম জেগে আছে—হায়নার রাক্ষুসে হাসি, বানরদের ভীত স্বর, প্যাঁচার চিৎকার—এবং আরো কত কি, হিসাব করে বলা অসম্ভব। কেবল আফ্রিকার এ-অঞ্চলের জঙ্গলের যা প্রধান বিশেষত্ব, সিংহদের সেই মাটি-কাঁপানো ঘন ঘন মেঘের-মতন গর্জন এখন

আর একেবারেই শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু এটা ভরসার কথা নয়, ভয়ের কথা! কারণ আফ্রিকার অভিজ্ঞ শিকারী মাত্রই জানেন, সিংহরা স্তব্ধ হলেই অত্যন্ত সাবধান হওয়া উচিত। কেননা, সামনে বা কাছে শিকারের দেখা বা সাড়া পেলেই সিংহরা একেবারেই চুপ মেরে যায়। তারপর চোরের মতন চুপিচুপি এসে শিকারের উপর লাফিয়ে পড়ে! কে জানে, কাছের কোন জঙ্গলেই লুকিয়ে কোন দুর্দান্ত পশুরাজ আমাকে দেখে আসন্ন ফলারের লোভে উন্মুখ হয়ে উঠেছে কিনা?

লণ্ঠনটা সামনের দিকে বাড়িয়ে পথের দু-পাশে সতর্ক দৃষ্টি রেখে নদীর দিকে এগিয়ে চললুম। কিন্তু আমার মাথার ভিতরে তখন সিংহের জন্যে কোন ভয়-ভাবনাই প্রবল হয়ে উঠতে পারলে না,—আমি ভাবছিলুম কেবল ডায়েরির ও সর্দারের কথা! জুজু এবং জীবন্ত পিপে!

দূরে—পথের পাশ থেকে ওপাশে চিতাবাঘের মতন কি-একটা জন্তু তাড়াতাড়ি চলে গেল। একটা ঝুপসী গাছের ভিতর থেকে ডাল-পাতা সরিয়ে চার-পাঁচটা বেবুন সবিস্ময়ে মাথা বাড়িয়ে মুখ খিঁচিয়ে উঠল—এই বিজন ও ভীষণ অরণ্য পথে রাত্রিবেলায় আমার মতন একাকী মানুষকে দেখবার আশা তারা যেন করে নি!

একটু তফাতে আচম্বিতে গাছপালার আড়ালে অনেকগুলো পাখি ব্যস্ত ভাবে চেঁচিয়ে উঠল। প্রত্যেক শিকারীই পাখিদের এইরকম আকস্মিক চিৎকারের অর্থ বোঝে। নিশ্চয়ই তারা কোন হিংস্র জীব-জন্তুর সাড়া পেয়েছে। যেখানে পাখিদের গোলমাল উঠেছে সেইখানে লক্ষ্য করে দেখলুম, জঙ্গলটা দুলে দুলে উঠল,—যেন কোন অদৃশ্য জন্তু তার ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছে!

আমিও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলুম। কিন্তু আর কোন-কিছু নজরে পড়ল না। আবার অগ্রসর হলুম। জঙ্গলের সেই জায়গাটা যখন পার হয়ে গেলুম, মনের ভিতরে কেমন অস্বস্তি হতে লাগল!

নির্জনতা, জ্যোৎস্না-ধোয়া পাহাড়, বন, নদী এবং চাঁদের-তিলক-পরা-নীলিমা! মাঝে মাঝে বনফুলেরও অভাব নেই! মাসিকপত্রের

কবিদের মুখে শুনি, তাঁরা নাকি এইসব প্রাণের মত ভালোবাসেন! কিন্তু তাঁদের দলের ভিতর থেকে কারুকে ধরে এনে আজ যদি এইখানে একলা ছেড়ে দি এবং বলি, "কবি এইবারে একটি কবিতা লেখো তো! তুমি যা যা ভালোবাসো এখানে সে-সবের কিছুরই অভাব নেই। এইবারে একটি চাঁদ ওঠার, ফুল-ফোটার আর মলয় বাতাস-ছোটার বর্ণনা লেখো তো বাপু!"—তাহলে কবি কবিতা লেখেন, না পিঠটান দেন, না ভিরমি যান, সেটা আমার দেখবার সাধ হয়।

নদীর ধারে এসে পড়লুম। কিন্তু এখন পর্যন্ত অস্বাভাবিক কোন ব্যাপারই চোখে পড়ল না। বন-জঙ্গলে যে সব ভয় থাকা স্বাভাবিক এখানে তার অভাব নেই, কিন্তু এ-সব তো থাকবেই এবং এমন ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য তো শিকারীর কাছে পরম লোভনীয়ই। কিন্তু আমি যা দেখবার জন্যে আজ প্রস্তুত হয়ে এসেছি, ডায়েরির পাতায় পাতায় যে-সব অলৌকিক ঘটনা লেখা আছে এবং আজ সর্দারের মুখেও যার কিঞ্চিৎ বর্ণনা শুনেছি, তার ছিটে-ফোঁটাও তো এখন পর্যন্ত দেখতে পেলুম না! মনে মনে হেসে মনে মনেই বললুম—'পক্ষীরাজ ঘোড়া রূপকথায় আর শিশুর স্বপ্নেই দেখা যায়! আমি হচ্ছি একটি নিরেট বোকা, তাই সারা-দিন পরিশ্রমের পর রাত্রের সুনিদ্রা নষ্ট করে বদ্ধপাগলের মতন এখানে ছুটে এসেছি!'

নদীর তীরে নজর গেল। একটা মস্তবড় কুমীর ডাঙার উপরে দেহের খানিকটা তুলে স্থির ভাবে আমার পানে তাকিয়ে আছে। যেন সে বলতে চায়—'বন্ধু কি আর বলব! আমার কাছে আর-একটু সরে এসে দেখ না, ক্ষিদে পেলে আমি কি করি?

মাঝ-নদীতে জীবন্ত 'বয়া'র মতন একদল হিপো ভাসছে। তিন-চারটে বাচ্চা হিপো জল-খেলা খেলছে,—কেউ তার মায়ের কুপোর মতন পেটে গিয়ে ঢুঁ মারছে, কেউ-বা জলের ভিতরেই উল্টে পড়ে চমৎকার ডিগ্‌বাজি খাচ্ছে।

এমন সময়ে আচম্বিতে আমার মনে হল এখানে কেবল এই কুমীর

আর হিপোর পালই নেই,—যেন আরো সব অদৃশ্য জীব আনাচে-কানাচে গা-ঢাকা দিয়ে আমাকে লক্ষ্য করছে।

মনের মধ্যে এই সন্দেহ হতেই চারিদিকে তাকিয়ে দেখলুম; কিন্তু সারা পথটা জনশূন্য ও চন্দ্রালোকে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে এবং পথের দু-ধারের বন-জঙ্গলের ভিতর থেকেও কোনকিছুই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল না।

তবু বুকের কাছটা কেমনধারা করতে লাগল। এতক্ষণ এমন হয় নি, এখনই বা হচ্ছে কেন? এখানে আর কে থাকতে পারে? সিংহ? ব্যাঘ্র? গণ্ডার?

আশ্চর্য নয়! নদীর ধারে হয়তো কোন বড় জন্তু জলপান করতে এসে আমাকে দেখে আর বাইরে বেরুতে পারছে না। কিংবা হয়তো সুমুখেই তৈরি খাবার দেখে জঙ্গলের আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে জলপানের আগেই আমার ঘাড়ের উপরে একটি লম্ফত্যাগ করবে কিনা!

তা এখানটা পড়তে তোমাদের যতই ভালো লাগুক না কেন, ব্যাপারটা তখন আমার মোটেই ভালো লাগছিল না। লণ্ঠনটা মাটির উপরে রাখলুম। টর্চটা কোমরবন্ধ থেকে খুলে পথের দু-পাশের ঝোঁপ-ঝাপের উপরে আলো ফেলে পরীক্ষা করতে লাগলুম। হঠাৎ এক জায়গায় টর্চের আলো পড়তেই আমি চম্‌কে উঠলুম।

কী ও-দুটো? একটা ঝাঁকড়া ঝোপের ভিতর থেকে দুটো অগ্নিময় গোলা আমার পানেই তাকিয়ে আছে। দুটো হিংসা ও ক্ষুধা ভরা জলন্ত ও ভয়ানক চক্ষু!

ও দুটো সিংহের, না ব্যাঘ্রের চক্ষু? যার চক্ষুই হোক্, আমি আর এক মুহূর্তও নষ্ট করলুম না, তাড়াতাড়ি বন্দুক বাগিয়ে ধরে সেই দুটো অগ্নিগোলকের দিকে উপর-উপরি দুইবার গুলি বৃষ্টি করলুম!

তারপরেই ভয়ঙ্কর এক আর্তনাদ—পৃথিবীর কোন সিংহ-ব্যাঘ্রই সে-রকম আর্তনাদ করতে পারে না! এবং পর-মুহূর্তেই একটা অদ্ভুত শব্দ হল—যেন পিপের মতন কি-একটা বড় জিনিস গড়গড় করে ক্রমেই দূরে

চলে যাচ্ছে!

এবং সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত জঙ্গলের ভিতর থেকে কারা যেন অসংখ্য কণ্ঠে অমানুষিক স্বরে চিৎকার করতে লাগল—সেই সমস্বরের অপার্থিব চিৎকার শুনলে অতি বড় সাহসীরও বুকের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায়,—মানুষের কান তেমন চিৎকার কোনদিন শোনে নি!

কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতন ভাবছি,—কারা ওরা, অমন চিৎকার করতে পারে এমন কোন জীব এই পৃথিবীতে আছে?—ঠিক সেই সময়ে আবার যে-কাণ্ডটা হল, তাতে আমার সমস্ত বুদ্ধি-সুদ্ধি যেন একেবারেই লোপ পেয়ে গেল!

আমি দাঁড়িয়েছিলুম পথের মাঝখানে। সেখান থেকে সামনের জঙ্গল ছিল প্রায় দশ-বারো হাত তফাতে! জঙ্গলের ভিতর থেকে যদি কোন জন্তু আমাকে আক্রমণ করতে আসে, তবে তাকে এই দশ-বারো হাত জমি আমার চোখের সামনে পার হয়ে আসতে হবে!

কিন্তু হঠাৎ জঙ্গলের ভিতর থেকে মোটা সাপের মতন কি-একটা বিদ্যুৎ-বেগে শূন্যপথে উড়ে আমার বাঁ হাতের উপরে এসে পড়ল, আমার বন্দুকটা তখনি সশব্দে পথের উপরে ঠিকরে পড়ে গেল এবং তারপরেই কে যেন বজ্র-মুষ্টিতে আমার হাত চেপে ধরে আমাকে জঙ্গলের দিকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যেতে লাগল!

প্রথমটা আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম! তারপর কতকটা সামলে নিয়ে সেই বজ্র-মুষ্টি থেকে ছাড়ান পাবার চেষ্টা করলুম—কিন্তু পারলুম না! তারপর প্রায় যখন জঙ্গলের কাছে গিয়ে পড়েছি, তখন আমার মাথায় বুদ্ধি জোগালো! আমার ডানহাত তখনো মুক্ত ছিল, ক্ষিপ্র হাতে কোমরবন্ধ থেকে রিভলবারটা বার করে নিয়ে আবার বার-তিনেক গুলিবৃষ্টি করলুম এবং অমনি আমার বাঁ-হাতের উপর থেকে সেই বজ্র-মুষ্টির বাঁধনটা খুলে গেল!

অমন দশ-বারো হাত জমি পেরিয়ে সেটা যে কী এসে আমার হাত ধরলে ও ছেড়ে দিলে, কিছুই আমি ভালো করে বুঝতে বা দেখতে পেলুম

না, কারণ তখন আমি বিস্ময়ে হতভম্ব ও আতঙ্কে অন্ধের মতন হয়ে গিয়েছি!

ভালো করে কিছু বোঝবার বা দেখবার ভরসাও আর হল না,—যে পথে এসেছিলুম আবার তীরের মতন সেই পথেই ছুটতে লাগলুম আমার তাঁবুর দিকে! পিছনে তখনো বহু কণ্ঠে সেই অমানুষিক চিৎকার বন-জঙ্গল, আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলছে!

সে চিৎকার বোধ হয় আমার তাঁবুর লোকেদেরও কানে গিয়েছিল কারণ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে তাঁবুর কাছে এসে দেখি, আমার কাফ্রী-কুলিরা আগুনের চারিপাশে ভয়-বিহ্বলের মতন দাঁড়িয়ে গোলমাল করছে!

আমাকে অমন ঝড়ের মতন বেগে ছুটে আসতে দেখে কুলীরা বোধ হয় স্থির করলে যে, যাদের ভয়ে আমি পালিয়ে আসছি, তারাও হয়তো আমার পিছনে পিছনেই ছুটে আসছে। তারা কি ভাবলে ঠিক তা জানি না, তবে আমাকে দেখেই কুলিরা একসঙ্গে আর্তনাদ করে উঠে যে যেদিকে পারলে পলায়ন করলে। তারপর তাদের আর কারুরই দেখা পাই নি।

কুলিদের কাপুরুষ বলে দোষ দিতে পারি না। আমি আজ স্বচক্ষে যা দেখলুম হয়তো তারাও এর আগেই তার কিছু কিছু দেখেছে বা শুনেছে! সে রাতটা তাঁবুর ভিতরে বসে দুশ্চিন্তায়, আতঙ্কে ও অনিদ্রায় যে-ভাবে কেটে গেল, তা জানি খালি আমি এবং আমার ভগবানই!··· পরের দিন সকালেই এই অভিশপ্ত দেশ ত্যাগ করলুম। আমার দামী বন্দুক আর লণ্ঠনটা নদীর ধারে পথেই পড়ে রইল। দিনের আলোতেও এমন সাহস হল না যে, ঘটনাস্থলটা আর-একবার পরীক্ষা করে নিজের জিনিস আবার কুড়িয়ে নিয়ে আসি! বিপদেই মানুষের চরিত্র বোঝা যায় বটে, কিন্তু বিপদেরও একটা সীমা আছে তো? বিপদকে ভালো-বাসলেও, সাঁতার না জেনে কে জলে ঝাঁপ দিতে যায়?

ডায়েরিতে যা লেখা আছে, আমি এইখানে তা উদ্ধার করে দিলুম। কাহিনীটি তোমরাও শোনো। যদি বিশ্বাস করতে ইচ্ছা না হয়, তবে

অবিশ্বাস করো।

ডায়েরির লেখক তাঁর গল্পটিকে বেশ গুছিয়ে বলেছেন। আমি তাঁর কোন কথাই বাদ দিই নি, কেবল সকলের সুবিধার জন্যে গল্পটিকে কয়েকটি পরিচ্ছেদে ভাগ করে দিলুম।

পঞ্চম

ডায়েরির গল্প শুরু হল

কুলিদের কথা যে সত্য, সে-বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নেই!

অসম্ভবও যে সম্ভব হয়, স্বচক্ষে আমি তা দেখেছি। আমার যদি যথেষ্ট মনের জোর না থাকত, তাহলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই আমি বদ্ধপাগল হয়ে যেতুম।

সময়ে সময়ে নিজেরই সন্দেহ হয়েছে যে, আমি কোন বিদঘুটে স্বপ্ন দেখছি না তো? কিন্তু সেই অদ্ভুত দেশে গিয়ে আমি যে সব ছবি এঁকেছিলুম, সেগুলো এখনো আমার কাছে রয়েছে। ছবিগুলো তো আর স্বপ্ন হতে পারে না!

এই গল্পটি আমি তাড়াতাড়ি লিখে রাখলুম। আমার শরীরের যে অবস্থা হয়েছে, তা আর বলবার নয়। আজ সাত দিন আমি কোন নিরেট খাবার খেতে পাইনি—আর জলপানের সুযোগ পাইনি তিনদিন! পাহাড়ের এদিকটা মরুভূমির মতন শুকনো। আমার আর এক পা চলবার শক্তি নেই।

এ গল্পের গোড়ার দিকটা যতই ভয়াবহ হোক, এর শেষ দিকটা হয়তো অনেকেরই কাছে প্রহসনের মতন হাসির খোরাক যোগাবে। অনেকেই হয়তো একে প্রহসনের মতই হালকা ভাবে নেবেন। কিন্তু মানুষের এই জীবনটাই হচ্ছে প্রহসনের মতন! একজনের হাসি আর

একজনের কাছে মৃত্যুর মতন সাংঘাতিক ! গল্পের শেষ ঘটনাগুলি পড়ে পাঠকরা যখন হাসবেন, তখন তাঁরা হয়তো মনেও করতে পারবেন না যে, ঘটনার সময়ে আমার মনের মধ্যে হাস্যরসের একটা ফোঁটাও বর্তমান ছিল না !

আমার এই কাহিনীর নাম দেওয়া যেতে পারে—'দুঃস্বপ্নের ইতিহাস' ! মানুষ স্বপ্নে যে-সব ভয়ঙ্কর ও অলৌকিক দৃশ্য দেখবার সময়ে অত্যন্ত ভয় পায়, জেগে উঠে তার কথা মনে করে হাসি আসে ! আমারও অবস্থা এখন অনেকটা সেইরকম ! কেবল দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, আমি যা দেখেছি তার কথা ভেবে অনেককাল ধরে হাসবার মতন পরমায়ু আমার নেই।

কোনরকমে পাহাড়ের এই গুহার ভিতরে আশ্রয় নিয়ে আমার এই দুঃস্বপ্নের ইতিহাস লিখছি ! আমি যে আর বেশীক্ষণ বাঁচব, এমন আশা রাখি না। তবু আমার ইতিহাস লিখে রেখে গেলুম এইজন্যে, কোন-না-কোন দিন হয়তো এটা অন্য মানুষের চোখে পড়বে।

কুলিরা কেউ আমার সঙ্গে আসতে রাজি হল না। সকলেরই মুখে এক কথা—"জুজু-পাহাড়ে মানুষ যায় না।"

আমার রোখ বেড়ে উঠল। জুজু-পাহাড়ের ভিতরে কি রহস্য আছে, না-জেনে এখান থেকে ফিরব না,—এই পণ করে কুলিদের পিছনে ফেলেই আমি একলা পাহাড়ের উপরে উঠতে লাগলুম।

উঠছি, উঠছি, উঠছি ! জুজু বলে কোন-কিছুর অস্তিত্ব দেখতে পেলুম না বটে, কিন্তু এই প্রকাণ্ড পাহাড়টা কি আশ্চর্যরকম নির্জন ! কোথাও মানুষের একটা চিহ্নও নেই !

আরো-খানিকটা উপরে ওঠবার পর আমার কেমন ভয়-ভয় করতে লাগলো। এ পাহাড়ে মানুষের পদচিহ্ন পর্যন্ত নেই কেন এবং কোন মানুষ এখানে আসে না কেন ? সূর্যের সোনার আলোয় ঝলমলে এমন সুন্দর পাহাড়; এখানে-ওখানে কৌতুকময়ী ঝরণা রুপোর ধারা কুলকুচো

করতে করতে ও নীলাকাশকে নিজের গানের ভাষা শোনাতে শোনাতে পাথর থেকে পাথরের উপরে লাফিয়ে নাচতে নাচতে পৃথিবীর কোলের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে নিচে—আরো নিচে নেমে যাচ্ছে ;—ফলে-ফুলে রঙিন ও লতায়-পাতায় সাজানো, নরম ঘাসের সবজে সাটিনে ঢাকা আনন্দময় উপত্যকা, এ তো কবির স্বর্গ, ভ্রমণকারীর তীর্থ! তবু মানুষ এই পাহাড়কে পরিত্যাগ করেছে কেন? এত-বড় একটা চমৎকার পাহাড়, তবু কোথাও এর বর্ণনা শুনি নি কেন?

আর-একটা অদ্ভুত ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে আমি উপরে উঠছি। আশ-পাশ, আনাচ-কানাচ, বন-জঙ্গলের আড়াল দিয়ে যেন আরো কারা সব নিঃশব্দ পদে আমার সঙ্গে সঙ্গেই উপরে উঠছে! এখানে মানুষ নেই, অন্য কোন জীবেরও সাড়া নেই,—তবু যেন আমি একলা নই! কারা যেন অদৃশ্য হয়ে আমার সমস্ত গতিবিধি সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে! এদিকে তাকাই ওদিকে তাকাই, সামনে ফিরি পিছনে ফিরি—এমন কি হঠাৎ ঝোঁপেঝাপে গিয়েও উঁকি মারি, তবু জনপ্রাণীকেও দেখতে পাই না! তবু আসছে, আসছে,—অদৃশ্য আত্মারা আমার সঙ্গে সঙ্গে আসছে আর আসছে আর আসছে!······এই অদ্ভুত ভাবটাকে কোনরকমেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারলুম না! কী অসোয়াস্তি!

ঘণ্টা-চারেক এগিয়ে যাবার পর হঠাৎ এক জায়গায় একটি ব্যাপার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

দু-ধারের পাহাড় কেটে কারা যেন একটা সরু রাস্তা তৈরি করেছে। রাস্তার মাঝে মাঝে শুকনো কাদা রয়েছে। তার উপরে মানুষের পায়ের ছাপ আছে কিনা দেখবার জন্যে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলুম। মানুষের পায়ের একটিমাত্র ছাপও সেখানে নেই। তার বদলে কাদার উপরে অনেকগুলো টানা টানা বিচিত্র চিহ্ন দেখলুম। মাটি যখন ভিজে ছিল, তখন এই পথ দিয়ে যেন অনেকগুলো পিপের মতন জিনিস কারা গড়িয়ে গড়িয়ে নিয়ে গেছে! কিন্তু যারা নিয়ে গেছে, তাদের পায়ের চিহ্নগুলো কোথায় গেল?······অদ্ভুত রহস্য!

পরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ আমার পা গেল ফস্কে! যেখানে দাঁড়িয়েছিলুম, ঠিক তার পাশেই ছিল একটা গভীর খাদ। কোনরকমেই নিজেকে সামলাতে না পেরে আমি সেই খাদের ভিতরে গিয়ে পড়লুম।

গড়াতে গড়াতে পাতালের ভিতরে নেমে যাচ্ছি! দেহের উপরে আঘাতের পর আঘাত! চারিদিক অন্ধকার-- যন্ত্রণায় চিৎকার করছি!

হঠাৎ পাথরের উপরে মাথা ঠুকে অজ্ঞান হয়ে গেলুম!

ষষ্ঠ

ষোল-হাত-লম্বা হাত

যখন আমার জ্ঞান হল, দেখলুম আমি একটা টেবিলের উপরে শুয়ে আছি। পরে জেনেছিলুম সেটা হচ্ছে 'অপারেশন টেবিল'—অর্থাৎ যাকে বলে রোগীকে অস্ত্র করবার টেবিল!

ভালো করে চেয়ে দেখি, আমি টেবিলের উপরে শুয়ে নেই—টেবিলটাই আছে আমার পিঠের উপরে! কড়িকাঠ থেকে এক ঝোলানো টেবিলে পিঠ রেখে আমি ঘরের মেঝের দিকে মুখ করে আছি! আমার হাত-পা বাঁধা নেই, তবু আমি পড়ে যাচ্ছি না! যদিও পরে এই রহস্যেরও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শুনেছিলুম—কিন্তু তখন আমি অত্যন্ত আশ্চর্য ও আড়ষ্ট হয়ে ভাবতে লাগলুম, বোধ হয় আমি দুঃস্বপ্ন দেখছি!

হঠাৎ চেয়ে দেখি, ঘরের মেঝেতে একটা পিপের ভিতর থেকে একখানা অদ্ভুত মুখ উঁকি মারছে! ছবিতে গোল চাঁদের ভিতরে চোখ-নাক-ঠোঁট এঁকে দিলে যে-রকম হয়, সেই মজার মুখখানা ঠিক সেইরকম দেখতে! তখন আমার দৃঢ়-ধারণা হল যে, আমি স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই দেখছি না!

চাঁদমুখো লোকটা একটু হাসলে। বললে, "এই যে, তোমার জ্ঞান

হয়েছে দেখছি। অমল, তোমার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, তুমি ভাবছ এ-সব স্বপ্ন,—না ?"

আমি হতভম্বের মতন বললুম, "আপনি কি বলতে চান যে, আমি স্বপ্ন দেখছি না ?"

—"না।"

—"এখন আমি কোথায় ? এইটুকু আমার মনে আছে যে, আমি পাহাড়ের খাদে পড়ে গিয়েছিলুম !"

—"ঠিক তাই। তোমাকে আমরা সেইখান থেকেই কুড়িয়ে এনেছি। তুমি নিশ্চয়ই বাঁচতে না। তোমার মেরুদণ্ড আর দুখানা পা ভেঙে গিয়েছিল। আমি বৈজ্ঞানিক উপায়ে আবার তোমাকে বাঁচিয়ে তুলেছি।"

লোকটা বলে কি ? আমি স্বপ্ন দেখছি না তো এ কি দেখছি ? মানুষ কখনো ঝোলানো টেবিলে এমনভাবে পিঠ রেখে শূন্যে শুয়ে থাকতে পারে ? আর নিচে ঐ যে প্রকাণ্ড চাঁদের মতন মুখখানা আমার সঙ্গে কথা কইছে, ও-রকম মুখ দুনিয়াতে কেউ কখনো দেখেছে ? আমার মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল।

পিপের মুখ আবার বললে, "অমল, এখন তুমি আরোগ্য লাভ করেছ।"

আমি বললুম, "আপনি আমার নাম জানলেন কি করে ?"

—"তোমার পকেট-বই দেখে।···রোসো তোমাকে নামিয়ে দিচ্ছি।" —এই বলেই সেই চাঁদমুখো কেমন করে কি কল টিপলে জানিনা, কিন্তু আমাকে সুদ্ধ নিয়ে টেবিলটা ধীরে ধীরে ঘুরে সোজা হয়ে মাটির উপরে গিয়ে দাঁড়াল।

চাঁদমুখো বললে, "এইবার তুমি নিচে নামতে পারো !"

আমি আস্তে আস্তে উঠে বসে টেবিল ছেড়ে নেমে পড়লুম।

পিপের ভিতর থেকে একখানা হাত বেরুলো—সেই হাতে একটা কাঁচের গেলাস। চাঁদমুখো বললে, "নাও, এইটুকু পান কর।"

গেলাসে সবুজ রঙের কি-একটা তরল পদার্থ ছিল। যেমনি তা পান

করলুম, অমনি আমার দেহের ভিতর দিয়ে যেন একটা জ্বালাময় বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটে গেল!

আমি সভয়ে বলে উঠলুম, "এ আমায় কি খাওয়ালেন?"

চাঁদমুখো হেসে বললে, "ভয় নেই—ভয় নেই! ওতে তোমার উপকারই হবে!"

আমি আবার জিজ্ঞাসা করলুম, "আমি এখন কোথায় আছি?"

—"আফ্রিকার এক গুপ্ত দেশে।"

—"আপনি বাংলা শিখলেন কোথা থেকে?"

—"এখানে সবাই বাংলা বলে। আমাদের ইতিহাস পরে বলব অখন, এখন যা বলি শোনো। আমি জানি তুমি বাঙালী। কিন্তু এ দেশে বিদেশীদের প্রবেশ নিষেধ। তবু যে তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি, তার কারণ তোমাকে নিয়ে আমি একটা নতুন-রকম পরীক্ষা করতে চাই! কিন্তু মহারাজা তোমাকে এখানে থাকতে দেবেন কিনা জানি না। শীঘ্রই মহারাজার সভা বসবে। সেই সভায় স্থির হবে, তোমাকে এদেশে থাকতে দেওয়া হবে কি তোমাকে হত্যা করা হবে!"

আমি চমকে উঠে বললুম, "হত্যা?"

চাঁদমুখো বেশ স্থির ভাবেই বললে, "হ্যাঁ। এদেশে কোন বিদেশী এলে তাকে হত্যা করাই হচ্ছে এখানকার আইন।"

চমৎকার আইন! আমার বুক ভারি দমে গেল।

চাঁদমুখো বললে, "কিন্তু অমল, এ কথা ভেবে এখন তুমি মাথা খারাপ কোরো না। তোমাকে যাতে হত্যা করা না হয়, আমি প্রাণপণে সে চেষ্টা করব।"

আমি কৃতজ্ঞ স্বরে বললুম "ধন্যবাদ। কিন্তু আপনার নামটি জানতে পারি কি?

চাঁদমুখো বললেন, "এ রাজ্যে কেউ আমার নাম ধরে ডাকে না। তুমি আমাকে পণ্ডিত-মশাই বলে ডেকো। আমি মহারাজার প্রধান পণ্ডিত—জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করাই আমার কাজ।"—বলেই পণ্ডিত-

মশাই ঘরের ভিতরে পায়চারি করতে লাগলেন।

এতক্ষণ পরে হঠাৎ একটা ব্যাপার দেখে আমার চক্ষুস্থির হয়ে গেল! কি সর্বনাশ, পিপের ভিতর থেকে বেরিয়েছে তিনখানা মানুষের পা আর পিপের একদিকে আছে পণ্ডিত-মশাইয়ের চাঁদ-মুখ—এবং এই মুখ-পা-ওয়ালা পিপেটা আমার চোখের সামনে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল।

একটা জাপানী রূপকথায় আশ্চর্য এক চায়ের কেটলির বর্ণনা পড়েছিলুম। সেই চায়ের কেটলিটার বিষম এক বদ অভ্যাস ছিল। মাঝে মাঝে হাত-পা-মুখ বার করে সে নাচের নানারকম প্যাঁচ দেখাতো! কিন্তু সে-সব হচ্ছে তো ছেলেভুলানো বাজে গল্প! আজ আমার চোখের সুমুখে হাত পা-মুখ-ওয়ালা যে জ্যান্তো পিপেটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, একে তো গাঁজাখোরের নেশার খেয়াল বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না কিছুতেই!

আমি হাঁ করে অবাক হয়ে চেয়ে আছি দেখে পণ্ডিত-মশাই মুচকে হেসে বললেন, "আমার দেহটা একটু নতুন-রকম দেখাচ্ছে? আচ্ছা, এ-সব কথা নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে অখন, আপাতত একটু কাজে আমি বাইরে যাচ্ছি। ততক্ষণ আমার মেয়ের সঙ্গে তুমি গল্প কর—আমি গেলেই সে আসবে!"

কাগজের একরকম সাপ দেখেছ? যখন জড়ানো থাকে তখন খুব ছোট। তারপর ছেলেরা যেই ফুঁ দেয় অমনি ফুড়ুৎ করে হাত-খানেক লম্বা হয়ে যায়। ঠিক সেই ভাবেই পিপে-পণ্ডিতের পাশ থেকে ফুড়ুৎ করে একখানা হাত বেরিয়ে পড়ল এবং একটানে ঘরের দরজাটা খুলে ফেলেই হাতখানা চোখের নিমিষে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। পণ্ডিত-মশাই যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেখান থেকে ঘরের দরজাটা ছিল ষোলো-সতেরো হাত তফাতে!

তারপরেই দেখি, পণ্ডিত-মশাইয়ের ঠ্যাং তিনখানাও গুটিয়ে পিপের ভিতরে ঢুকে গেল এবং পিপেটা মাটির উপরে গড়াতে গড়াতে ঘরের

দরজার ভিতর দিয়ে বেরিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল !

নিজের চোখকেও আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না—এও কখনো সম্ভব হয় ?

বিস্ফারিত নেত্রে দরজার দিকে তাকিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছি আর ঘেমে উঠছি, এমন সময়ে হঠাৎ দেখি, সেখানেও এক অপূর্ব নতুন মূর্তির আবির্ভাব !

সপ্তম

মায়াময়ী কমলা

এবারে যার আবির্ভাব হল, তাকে দেখে ভয় পাবার কোন কারণ ছিল না। কারণ তাকে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায় আর প্রাণ-মন খুশি হয়ে উঠে। পরমা সুন্দরী সে—যেন রূপকথার রাজকুমারী !

পরমা সুন্দরী মেয়ের কথা অনেক উপকথায়, অনেক কাব্যে এবং অনেক গল্প-উপন্যাসে পাঠ করেছি। কিন্তু এ মেয়েটির রূপ সে-সব বর্ণনার চেয়েও ঢের বড় ! এর চেয়ে সুন্দর রঙ, গড়ন ও নাক-চোখ-মুখের কল্পনাও করা অসম্ভব। সৃষ্টিছাড়া পিপে-জগতে স্বপ্নালোকের এই মানস-কন্যাকে দেখে যেন মোহিনী-মন্ত্রে আমার মন অভিভূত হয়ে গেল।

আমার কাছে এসে মধুর হাসি হেসে সে বললে, "আপনিই বুঝি আমার বাবার অতিথি ? আপনার নাম কি ?"

—"অমলকুমার সেন।"

—"আপনি বুঝি খুব ভয় পেয়েছেন ?"

—"এখানে এসে ভয় পায় না, এমন মানুষ দুনিয়ায় আছে নাকি ? যে জীবটি এখনি এখান থেকে চলে গেল, তাকে বোধহয় তুমি দেখ নি ?

মেয়েটি খিল-খিল করে হেসে উঠে বললে, "বাঃ, কেন দেখব না ?"

—"তা দেখেও জিজ্ঞাসা করতে চাও, কেন আমি ভয় পেয়েছি! অমন আরো কতগুলো চাঁদমুখ তোমরা পিপেয় পুরে বন্ধ করে রেখেছ?"

—"অনেক। তা আর গুণে বলা যায় না।"

—"বল কি! ওদের নিয়ে তোমরা কি কর?"

—"কি আবার করব? ওদের কেউ আমার বন্ধু, কেউ আমার শত্রু, কেউ আমার খেলার সাথী, কেউ আমার বাবা—"

—"তোমার বাবা! চাঁদের মতন গোল মুখ, যোল-হাত-লম্বা হাত, পিপের মতন দেহ আর তিনখানা পা,—উনিই কি তোমার বাবা?"

—"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, উনিই আমার বাবা!"

—"কিন্তু তুমি তো দেখছি আমাদেরই মতন মানুষ!"

—"যা দেখছেন এ চেহারা আমার আসল চেহারা নয়।"

আমি হতভম্বের মতন বললুম, "তার মানে?"

—"আমি আমার পূর্বপুরুষদের চেহারা নকল করেছি। আমার নিজের চেহারা আমি পছন্দ করি না।"

মেয়েটি পাগলী নাকি! চেহারার আবার আসল-নকল কি? বললুম, "তোমার আসল চেহারা কি-রকম শুনি?"

—"ঐ বাবার মতনই আর কি! তবে বাবার গোঁফ আছে, আমার নেই! মাঝে মাঝে আমাকেও সেই মূর্তি ধারণ করতে হয়, কারণ এই নকল দেহ নিয়ে বেশিক্ষণ থাকা চলে না। কষ্ট হয়।"

মেয়েটি বলে কি? পূর্ব-পুরুষদের চেহারার নকল, বাবার মতন মূর্তি-ধারণ,—এ-সব উদ্ভট কথা শুনলেও যে পেটের পিলে চমকে ওঠে! এ কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছে? কিন্তু তার সরল নির্দোষ শিশু-মুখের পানে তাকালে তো সে কথা মনে হয় না!......তবে আমি কি সত্য-সত্যই কোন প্রেতলোকে এসে পড়েছি? পৃথিবীর অনেক বড় বড় পণ্ডিত বলেন, ইহলোকের পর পরলোক বলে যে জগৎ আছে, সেখানে প্রেত আর প্রেতিনী বাস করে! এই কি সেই পরলোক? জুজু-পাহাড়ের খাদের মধ্যে পড়ে গিয়ে আমার কি অনেকক্ষণ আগেই মৃত্যু হয়েছে—

এখন কি আমিও আর ইহলোকের মানুষ নই এবং এই ভয়ানক সত্য-কথাটা এখনো বুঝতে পারি নি? না, গল্পের বিখ্যাত অ্যালিসের মতন আমিও এখন 'ওয়াণ্ডার-ল্যাণ্ডে' ঘুরে বেড়াচ্ছি—নিজের অজ্ঞাতসারে স্বপ্নের ঘোরেই?······কিন্তু মনের এই সব দুর্ভাবনা আমি মুখে না প্রকাশ করেই বললুম, "তাহলে তুমিও পিপের ভেতরে থাকো?"

—"হুঁ। কাছিমরা যেমন খোলের ভেতরে থাকে, আমরাও তেমনি পিপের ভেতরে থাকি! তবে তোমাদের মতন তো আমাদের দেহে হাড় নেই, তাই ইচ্ছে করলেই যে-কোনরকম মূর্তি ধারণ করতে পারি! আমাদের দেহ হচ্ছে রবারের মতন—খুশি মতন কমানো-বাড়ানো যায়। "এই দেখনা"—বলেই সে গলাটাকে ক্রমেই বেশি লম্বা করতে লাগল! দেখতে দেখতে তার গলাটা আমাদের রাস্তায় জল-দেবার নলের মতন এতটা লম্বা হয়ে উঠল যে, তার মাথাটা জানলার বাইরে গিয়ে হাজির হল!

আমি ভয়ানক ভড়কে গিয়ে খুব চেঁচিয়ে বললুম, "থামো থামো—আর দেখতে পারি না, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে!"

এক-মুহূর্তে তার গলা গেল আবার ছোট্ট হয়ে এবং তার মাথাটা হাসতে হাসতে রবারের বলের মতন এক লাফে আবার যথাস্থানে এসে হাজির!

সে বললে, "আবার ইচ্ছে করলে আমার চোখ দুটোকে নিয়ে এই ভাবে খেলা করতে পারি"—কথা শেষ হবার আগেই তার চোখ দুটো কোটর থেকে প্রায় ছয় ইঞ্চি বেরিয়ে এসেই আবার সুড়সুড় করে নিজের কোটরে ফিরে গেল!

আতঙ্কে আমার প্রাণ ধড়ফড় করতে লাগল! রূপকথার রাক্ষস-রাক্ষসীরা খুশি মতন নানারকম মূর্তি ধারণ করতে পারে, তবে কি আমি কোন রাক্ষস-রাজ্যে এসে পড়েছি? আমার মাথার চুল ও গায়ের রোম-গুলো পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠল! এখন যে আর স্বপ্ন দেখছি না, এটুকু আমি বেশ বুঝেছি,—কিন্তু···কিন্তু···এ-সব কী অসম্ভব কাণ্ড!

মিনতি-ভরা স্বরে বললুম, "লক্ষ্মীমেয়েটি, তুমি অমন করে আর

আমাকে ভয় দেখিও না, তার চেয়ে আমাকে একেবারে মেরে ফেল!"

সে আবার খিল-খিল করে হেসে উঠে বললে, "ও! বুঝেছি, এ-সব দেখলে তুমি ভয় পাও? আচ্ছা, এই ঘাট মানছি, আর এ-কাজ করব না! কিন্তু সত্যি বলছি, এতে ভয় পাবার কিচ্ছু নেই, এখানে দুদিন থাকলেই সব তোমার অভ্যাস হয়ে যাবে! এখন তাহলে আসি।" সে চলে গেল।

মেয়েটি দেখছি ভারি গায়ে-পড়া! এই একটু আগে 'আপনি' বলছিল, আর এখনি 'তুমি' বলতে সুরু করেছে! কাল থেকেই হয়তো আমাকে 'তুই-তোকারি' করবে!

হঠাৎ দরজার দিকে চেয়েই দেখি, চাঁদমুখো পণ্ডিত-মশাই তিনপায়ে দাঁড়িয়ে পিপের ভিতর থেকে মুখ টিপে টিপে হাসছেন।

তিনি বললেন, "কি, অমন করে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছ যে? কমলা বুঝি তোমার সঙ্গেও দুষ্টুমি করছিল? হ্যাঁ, ও দুষ্টুমি না করে থাকতে পারে না!······তারপর? কমলার চেহারা বোধহয় তোমার খুব পছন্দ হয়েছে? তা তো হবেই! তোমাদের মতে ঐ-রকম চেহারাই খুব সুন্দর! কিন্তু আমরা তা বলি না। কেন বলি না জানো? আচ্ছা সংক্ষেপে আগে আমাদের ইতিহাস শোনো!"

অষ্টম

জুজু-রাজ্যের ইতিহাস

পণ্ডিত-মশাই বলতে লাগলেন:

"জানো তো, বাংলার বিজয়সিংহ সমুদ্র-পথে সিংহলে এসে বাহুবলে সেখানকার রাজা হন? আমাদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন সেই সিংহল-জেতা বিজয়সিংহের সঙ্গে।

সমুদ্রে হঠাৎ ঝড় উঠে বিজয়সিংহের নৌবাহিনীর একখানা জাহাজকে বিপথে নিয়ে যায়। অনেকদিন সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে সেই জাহাজখানা শেষটা আফ্রিকায় এসে কূল পায়।

সেই জাহাজে যিনি ছিলেন প্রধান, তাঁর নাম হচ্ছে চন্দ্র সেন। তিনি কেবল সাহসী যোদ্ধাই ছিলেন না। নানা শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। বৈজ্ঞানিক রহস্য নিয়ে সর্বদাই আলোচনা করতেন। এমন সব ব্যাপার তিনি জানতেন, তোমাদের এখনকার বড় বড় পণ্ডিতও যার কোনই খবর রাখেন না।

মানুষের দেহ আর মনকে উন্নত করে তাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলবার এক গুপ্ত পদ্ধতি তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। সে-পদ্ধতি এখানে ব্যাখ্যা করলেও তুমি বুঝতে পারবে না, তা বড়ই জটিল। সে-রহস্য জানবার জন্যে যদি তোমার কৌতূহল হয়, তাহলে এখানকার যাদুঘরে গিয়ে দেখো।

জাহাজে যে-সব সঙ্গীরা ছিল, চন্দ্রসেন তাদের নিয়েই নিজের পদ্ধতিটিকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। সেই পরীক্ষার ফলেই আমাদের সৃষ্টি হয়েছে!

সুতরাং বুঝতেই পারছ, আমরা একসময়ে ছিলুম তোমাদেরই মতন বাঙালি এবং সেকেলে মানুষ! কিন্তু আমরা এখন তোমাদের মতন অক্ষম আর অসম্পূর্ণ মানুষ নই। আমাদের মন দেহের চাকর নয়, আমাদের মন দেহের প্রভু! আমাদের দেহে একখানাও হাড় নেই, কারণ তা অনাবশ্যক। এই দেহ নিয়ে আমরা যা খুশি করতে পারি,—কমলা বোধহয় তার দু-একটা দৃষ্টান্ত তোমাকে না দেখিয়ে ছাড়ে নি? তোমাদের মতন আমাদের brain—অর্থাৎ মগজ, খুলির ভিতরে চেপ্টে বন্দী হয়ে থাকে না। সে সম্পূর্ণ স্বাধীন! তাই দেহের উপরে আমাদের অবাধ অধিকার। আমার এই একখানা মুখকে আমি কতরকম করতে পারি—দেখ! (এই বলে পণ্ডিতমশাই কতগুলো এমন ভীষণ ভীষণ নমুনা

দেখালেন যে, আমার সর্বাঙ্গ ছম ছম করতে লাগল!) যখন যতগুলো দরকার, তখন ততগুলো হাত আর পা আমরা সৃষ্টি করতে পারি! (এই বলে পণ্ডিতমশাই আমার বিস্মিত চোখের সামনে দু-কুড়ি হাত-পা বার করে নেড়ে-চেড়ে দেখালেন!) আমি তোমার মতন ধীরে ধীরে হাঁটতেও পারি, আবার দরকার হলে দৌড়ে মটরগাড়িকেও হারাতে পারি। আমি কতকাল বাঁচব, সেটাও আমার নিজের ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে!

রাবণ-রাজা থাকতেন লঙ্কাদ্বীপে—অর্থাৎ সিংহলে। তাঁর দশ মুণ্ড আর বিশখানা হাত ছিল। আবার দরকার হলে তিনি সাধারণ মানুষের রূপও ধারণ করতে পারতেম। রাবণ-রাজার ভাই কুম্ভকর্ণের দেহ ছিল তালগাছের চেয়েও উঁচু। এসব হচ্ছে দেহের উপরে মনের প্রভুত্বের দৃষ্টান্ত। তোমরা হচ্ছ সাধারণ মানুষ। তাই এসব ব্যাপারকে গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দাও। কিন্তু এ হচ্ছে তোমাদেরই বোকামি। রামায়ণ ও মহাভারত যাঁদের লেখা, তাঁরা কোনকালে গাঁজা খেতেন বলে প্রমাণ নেই।

খুব সম্ভব রাবণ-রাজার দেশে গিয়েছিলেন বলেই চন্দ্রসেন সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ মানুষ সৃষ্টি করবার গুপ্ত পদ্ধতিটি আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। তখনো সিংহলের কোন কোন পণ্ডিত হয়তো ঐ গুপ্ত পদ্ধতি নিয়ে নাড়াচাড়া করতেন। এ পদ্ধতি এখন খালি আমরাই জানি। তুমি যদি আমাদের সঙ্গে কিছু কাল থাকো, তাহলে তুমিও হয়তো অনেক নতুন জ্ঞান অর্জন করতে পারবে!

অমল, আজ আর বেশি-কিছু বলব না। একদিনে বেশি কথা শুনলে তোমার অসম্পূর্ণ ছোট্ট মগজ হয়তো গুলিয়ে যাবে। আজ এই পর্যন্ত। এস আমার সঙ্গে!"

পণ্ডিতমশাইয়ের সঙ্গে আমি পাশের ঘরে গিয়ে হাজির হলুম। সেখানে দুখানা জলচৌকির মতন ছোট ছোট টেবিলে রাশীকৃত ফল-মূল সাজানো রয়েছে। পণ্ডিত তাঁর পিপে-দেহের একদিকটা মাটির উপরে বসিয়ে পা তিনখানা ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়ে বললেন, "বোসো

অমল, খেতে বোসো। আমরা খাওয়া-দাওয়ায় বেশি সময় নষ্ট করি না।" বলেই তিনি অজগর সাপের মতন মস্ত-একটা হাঁ করে মিনিট-দুয়েকের মধ্যে প্রায় একঝুড়ি ফল উদরস্থ করে ফেললেন। তারপর জলপান করে বললেন, "ব্যস, খাওয়া তো হলো,—এইবারে ওঠ!"

খাওয়া হল না ছাই হল! এঁরা খাওয়া-দাওয়ায় বেশি সময় নষ্ট না করতে পারেন, কিন্তু দু-মিনিটে যারা দশজন লোকের খোরাক গপ গপ করে গিলে ফেলতে পারে, তাদের আর বেশি সময়ের দরকার কি? এই চাঁদমুখো পণ্ডিতের সঙ্গে খেতে বসলে আমাকে উপোস করে মরতে হবে দেখছি! তাড়াতাড়ি করেও দু-মিনিটে আমি দুটো আপেল পার করতে পারলুম না। কি আর করি, পণ্ডিত যখন চোখ বুঁজে জলপান করেছিলেন, তখন আমি, গোটাকয়েক ফল টপ টপ করে পকেটে পুরে ফেললুম!

পণ্ডিত মুখ মুছতে মুছতে বললেন, "বেশি খেলে মগজ ভোঁতা হয়ে যায়। তাই আমি নামমাত্র খাই। কিন্তু আমাদের দেশেও এমন অনেক নিরেট বোকা আছে, যারা মনে করে বেশি খেলে দেহের তেজও বেশি হয়! এদের বুদ্ধির গলায় দড়ি। ঐযে, নাম করতে করতেই ঐ দলের একটি নির্বোধ আমাদের দিকেই আসছে!"

ফিরে দেখি, প্রকাণ্ড একজন পিপে-মানুষ হেলে-দুলে হাঁসফাস করতে করতে এদিকেই এগিয়ে আসছে। তার পিপেটা এমন ভয়ানক মোটা যে ওর মধ্যে পণ্ডিতের মতন দু-দুজন লোকের ঠাঁই হতে পারে! তার মুখখানাও সব-চেয়ে-বড় বারকোসের মতন। কপালে গালে বড়ীর মতন বড় বড় আঁচিল আর তার ঠোঁটে এমনি ন্যাকামি-মাখানো হাসি যে দেখলেই গা যেন জ্বলে যায়! লোকটাকে মোটেই আমার পছন্দ হল না!

সে এসে একবার সবিস্ময়ে আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললে, "প্রিয় পণ্ডিতমশাই, এই বুঝি সেই জীবটা? বটে! আমি এটাকেই দেখতে এসেছি!"

পণ্ডিত বললেন, "এই ভদ্রলোকের নাম শ্রীঅমলকুমার সেন, নিবাস বাংলাদেশ! ভোম্বল, এঁর সম্বন্ধে তুমি ও-রকম ভাষায় কথা কোয়ো না!"

ভোম্বল অমনি সুর বদলে চোখ মটকে বললে, "নিশ্চয়, নিশ্চয়! আপনার বন্ধু তো আমারও বন্ধু!......হ্যাঁ, ভালো কথা কমলা কোথায়?"

পণ্ডিত বললেন, "এতক্ষণে সে বোধহয় মন্ত্রী-মশাইয়ের বাড়িতে গিয়েছে। আপাতত তুমি এক কাজ করতে পারো ভোম্বল? অমলকে নিয়ে খানিকটা বেড়িয়ে আসবে?"

ভোম্বল বললে, "নিশ্চয়, নিশ্চয়! আপনার কথায় আমি প্রাণ দিতে পারি, এটা তো অতি তুচ্ছ ব্যাপার! আসুন অমলবাবু, আমার সঙ্গে আসুন! আপনাকে আমি যাদুঘরে নিয়ে যাব। সেখানে একটা ভালো হোটেল আছে, একটু-আধটু খাওয়া-দাওয়াও করা যাবে—কি বলেন?" বলেই সে মহা মুরুব্বির মতন আমার পিঠ চাপড়ে দিলে।

পণ্ডিত বললেন, "সন্ধ্যের আগেই ওকে আবার ফিরিয়ে আনা চাই। মনে রেখো, ওর ভার এখন তোমার উপরে, ওর জন্যে তুমি দায়ী হবে!" বলেই তিনি হাত-পা ভিতরে গুটিয়ে নিয়ে গড়াতে গড়াতে ঘর থেকে বেগে বেরিয়ে গেলেন।

নবম

নর-ডিম্ব

ভোম্বল চোখ দুটো নাচাতে নাচাতে বললে, "যখন পণ্ডিতের হুকুম, পালন করতেই হবে! অমলবাবু, তাহলে আপনি হচ্ছেন একটি মনুষ্য? আমাদের দেখে আপনার কি মনে হয়?"—বলেই সে দন্তবিকাশ করে

হাসলে।

আমি জবাব দিলুম না।

সে আবার দন্তবিকাশ করে হেসে বললে, "আপনি গড়িয়ে গড়িয়ে হাঁটতে পারেন ?"

আমি চটে গিয়ে বললুম, "নিশ্চয়ই পারি না। দেখতেই পাচ্ছেন আমি পিপে নই !"

—"তাহলে উপায় নেই—আমাকেও দেখছি আপনার সঙ্গে ছোট লোকের মতন পায়ে হেঁটে মরতে হবে। পায়ে হাঁটা এক ঝকমারি! হাঁপ ধরে।...আসুন, এই পথে।"

ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে দেখি, একটা পথ ঢালু হয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে। সেটা হচ্ছে সিঁড়ি! এদের সিঁড়িতে ধাপ নেই—তাই গড়িয়ে নামবার সুবিধা হয়। আমার কিন্তু একটু মুশকিল হল। ঢালু পথ দিয়ে নামতে গিয়ে দুচারবার হুমড়ি খেয়ে পড়বার মতন হলুম। এবং শেষ পর্যন্ত টাল সামলাতে পারলুমও না। খানিকটা সড়-সড় করে নেমে গিয়ে মস্ত-একটা ডিগবাজি খেয়ে দড়াম করে নিচের চাতালের উপরে আছাড় খেয়ে পড়লুম।

ভোম্বলের কিন্তু কোনই বালাই নেই। সে হাত-পা ভিতরে গুটিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চোখের নিমিষে নিচে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর দন্তবিকাশ করে ন্যাকামির হাসি হেসে বললে, "দেখছেন, শ্রীখোলের ভেতরে থাকার কত সুবিধে !"

আমি রাগে মুখ ভার করে বললুম, "আমাদের দেশে গেলে আপনিও বুঝতেন কত ধানে কত চাল! আমাদের সিঁড়ি দিয়ে নামতে হলে আপনার খোলা ফেটে চৌচির হয়ে যেত !"

ভোম্বল বললে, "আপনাদের দেশে যাচ্ছে কে ? অসভ্য দেশ !"

আমি আর কিছু বললুম না। তার সঙ্গে বাড়ির বাহির হয়ে রাজ-পথের উপরে গিয়ে দাঁড়ালুম।

সে এক নতুন দৃশ্য! রাজপথের দুধারে সারি সারি বাড়ি—কিন্তু

কোন বাড়ির সঙ্গেই কোন বাড়ির গড়ন মেলেনা। প্রত্যেক বাড়ির উপর দিকটা খিলানের আকারে গড়া—আঁকা-বাঁকা, কিম্ভূতকিমাকার!

কলকাতার আপিস-অঞ্চলে যেমন আকাশমুখো মস্ত মস্ত বাড়ি আছে, এখানেও তার অভাব নেই। কিন্তু এদেশী ঢ্যাঙা বাড়িগুলোর আমাদের চিলের ছাদের মতন ঢালু সিঁড়ির কথা ভেবে আমার বুক কাঁপতে লাগল! ও-সব সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময়ে এরা হয়তো যথেচ্ছভাবে বিশ-পঁচিশ-খানা অসম্ভব ও ভূতুড়ে হাত-পা বার করে উপরে উঠে যায়, কিন্তু ও-সব সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নাবা করতে গেলে গতর চূর্ণ হয়ে আমার মৃত্যু সুনিশ্চিত!

রাস্তায় আমাদের দেশের মতন গোলমালও নেই। পথ দিয়ে ধীরে ধীরে বা দ্রুতবেগে পিপের পর পিপে গড়িয়ে যাচ্ছে, খুব কম লোকই পায়ে হেঁটে চলছে! যারা পদব্রজে যাচ্ছে, তাদের প্রত্যেকেরই তিনখানা করে পা দেখে বোঝা গেল যে, ইচ্ছামত পদবৃদ্ধি করতে পারলেও সাধারণত এরা তিনখানা পদই ব্যবহার করে।

গরুর গাড়ির চাকার মতনই বড় অনেকগুলো চক্রও রাস্তার উপর দিয়ে বন বন করে ছুটছে! এক-একখানা চাকা আবার এত বড় যে, মাপলে আট-দশ হাতের কম চওড়া হবে না! চাকাগুলো ছুটে যাচ্ছে ঠিক মটর-গাড়ির বেগে। এমন কায়দায় তারা এঁকেবেঁকে ছোট ছোট পিপের পাশ কাটিয়ে ছুটছে যে দেখলে তারিফ করতে হয়! কিন্তু পিপেদের সঙ্গে ধাক্কা লাগলেও কোন পক্ষ থেকেই এখানে যে আপত্তি হয় না, সে প্রমাণও পাওয়া গেল। কারণ একবার একখানা চাকা বিপরীত দিক থেকে ধাবমান একটা পিপের উপরে উঠে আবার গড়িয়ে নেমে চলে গেল, তবু কোন পক্ষ থেকেই কোন গোলমাল হল না—যেন এ ব্যাপারটা এতো বেশি তুচ্ছ যে, লক্ষ্য করবার মতনই নয়!

আমার পাশের হৃষ্টপুষ্ট জীবটি—অর্থাৎ ভোম্বলদাস লকলকে জিভ দিয়ে ঠোঁটটা একবার চেটে নিয়ে বললে, "কি অমলা, আমাদের দেশ দেখে তুমি যে দেখছি থ হয়ে গেলে!"

অমলা! আমি খাপ্পা হয়ে বললুম, "আপনি আমাকে অমলা বলে ডাকছেন যে? আমার নাম অমল।"

ভোম্বল দন্তবিকাশ করে বললে, "ঠাট্টা করলে চটো কেন? ও অমল আর অমলা একই কথা!"

আমি বললুম, "না, অমল আর অমলা একই কথা নয়! ওরকম ঠাট্টা আমি পছন্দ করি না!"

ভোম্বল বললে, "বাপরে তুমি তো ভারি বেরসিক কাঠ-গোঁয়ার হে? একটুতেই এত বেশি চটো কেন? তোমার মুখখানা এখন কি-রকম দেখতে হয়েছে জানো? এইরকম!"—বলেই ভোম্বল তার মুখখানা বিকৃত করতে লাগল। এবং আমার চোখের সামনেই দেখতে দেখতে তার অদ্ভুত মুখখানা অবিকল আমার মুখেরই মতন হয়ে উঠল! সে যে কি প্রাণ চমকানো ব্যাপার, ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ তা বুঝবে না। আমার চোখের সুমুখেই আর একজন "আমি"র আবির্ভাব! শেষটা আমি আর সইতে পারলুম না, বলে উঠলুম, "ক্ষান্ত হন মশাই, ক্ষান্ত হন! আমি ঘাট মানছি!"

ভোম্বলের মুখ আবার ভোম্বলেরই মতন কুৎসিত হয়ে গেল। দন্তবিকাশ করে হেসে বললে, "দেবরাজ ইন্দ্র যে বিদ্যার জোরে মহর্ষি গৌতমের মূর্তি ধারণ করেছিলেন, আমিও সেই বিদ্যা জানি! হ্যাঁ, আর পণ্ডিতের মেয়ে কমলাও এ-বিদ্যায় ভারি পাকা। এ রাজ্যে এই বহুরূপী-বিদ্যায় আমাদের আর জুড়ী নেই—আমাদের মতন ভালো নকল আর কেউ করতে পারে না!···না, মিছে কথায় সময় কাটানো হচ্ছে—আমার ক্ষিধে পেয়েছে! চল যাদুঘরে যাই। চাকা। এই চাকা!" বলেই সে এমন তীক্ষ্ণ শীস দিল যে আমার মনে হল কানের কাছে বুঝি কোন কলের গাড়ির ইঞ্জিন বাঁশী বাজালে!

কোথা থেকে সোঁ সোঁ করে দুখানা মস্ত চাকা আমাদের সামনে এসে হাজির! তাদের চক্রনাভির মধ্যে—অর্থাৎ মাঝখানে দু-জন পিপে-মানুষ কি কৌশলে নিজেদের সংলগ্ন করে রেখেছে এবং হাতে করে পাখির

দাঁড়ের মতন বেয়াড়া এক বসবার আসন ধরে আছে।—

লোকে যেমন করে ব্যাগ বা পোর্টম্যাণ্টো গাড়ির উপরে উঠিয়ে দেয়, ভোম্বল ঠিক তেমনি ভাবেই ধরে আমাকে সেই দাঁড়-আসনে তুলে বসিয়ে দিলে। তারপর নিজেও আমার পাশে এসে বসে হেঁকে বললে, "এই! যাদুঘর—শীগগির!"

বোঁ করে চাকা ছুটল—কে যেন আমাকে এক হ্যাঁচকা-টান মেরে দাঁড় থেকে ফেলে দেয় আর কি! কী কষ্টে যে ঝোঁক সামলে নিলুম, তা আর বলবার নয়! চাকা দুখানা ছুটল ঠিক আমাদের পাঞ্জাব-মেলের মতন, হু-হু হাওয়ার তোড়ে নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। দাঁড়ের উপর বসে থাকে, কার সাধ্য!—ভোম্বলের কিন্তু কোনই খেয়াল নেই—দন্তবিকাশ করে হাসতে হাসতে সে দিব্যি আরামেই যাচ্ছে! গাড়ির পায়ে নমস্কার!

আচমকা গাড়িখানা দাঁড়িয়ে পড়ল। এবং এবারে আমি কিছুতেই টাল সামলাতে পারলুম না—দাঁড় থেকে ঠিকরে দশ হাত দূরে খুব নরম কি একটা জিনিসের উপর গিয়ে পড়লুম এবং পর মুহূর্তেই সে জিনিসটাও আমাকে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

খনখনে গলায় কে বলে উঠল, "কি-রকম লোক মশাই আপনি?"

আমি নিশ্চয় কারুর ঘাড়ের উপরে গিয়ে পড়েছিলুম। তাড়াতাড়ি মাটি থেকে উঠে গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বললুম, "আমাকে মাপ করবেন! আমি—"

—"আপনি কি দেখতে পান নি যে, আমি এখন আমার শ্রীখোলের ভেতরে নেই? আপনি কি চোখের মাথা খেয়েছেন? আপনি কি—ও হরি, এটা যে সেই মানুষটা!"

এতক্ষণ পরে আমি একটু দম পেলুম এবং আমার চোখের ধোঁয়া ধোঁয়া ভাবটা কেটে গেল। ভালো করে তাকিয়ে দেখি, একটা পিপে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

অনুতপ্ত স্বরে বললুম, "দেখুন, এ-রকম দাঁড়ে চড়ার অভ্যাস আমার

কোন কালেই নেই। তাই—”

—“আরে গেল, এ যে আমার শ্রীখোলের সঙ্গে কথা কয়! মশাই কথা কইতে হয় তো আমার সঙ্গে কথা বলুন।”

তখন ডানদিকে ফিরে দেখি, পথের উপরে জেলি-মাছের মতন কি-একটা পড়ে রয়েছে! তার মাঝখানে একখানা থলথলে মুখ থরথর করে কাঁপছে! এবং তার চোখ ছুটো ক্রোধে ও রুদ্ধ আক্রোশে আমার পানে তাকিয়ে যেন জ্বলে জ্বলে উঠছে! মুখখানা এক-একবার ফুলছে, আবার হাওয়া বেরিয়ে গেলে ফুটবলের ব্লাডারের অবস্থা যেমন হয়, তেমনি চুপসে যাচ্ছে!

এখন ভোম্বলের হাসির ঘটা দেখে কে! হাসতে হাসতে তার চোখ দিয়ে জল ঝরছে। অনেক চেষ্টার পর হাসি থামিয়ে সে বললে, “অমল, তুমি একেবারে ও-বেচারার মাঝখানে গিয়ে ঝাঁপ খেয়েছ, আর ওর দম তাই ফুরিয়ে গেছে!···ওহে নস্থ! ভায়া, এ-লোকটি জেনেশুনে এ কাজ করে নি, তুমি ঠাণ্ডা হও! আর এও বলি, রাস্তার মাঝখানে শ্রীখোল থেকে বেরিয়ে আসা তোমার উচিত হয় নি!”

নস্থ মুখ ভেংচে বললে, “খুব তো মুখসাবাসি করছ, নিজে এ-দশায় পড়লে টের পেতে! আমার গা-টা নদী না পুকুর, যে ও-লোকটা এসে অমন করে ঝাঁপ খাবে! যাও, যাও—আমার পিলে একেবারে চমকে গেছে!” এমনি বক-বক করতে করতে সে উঠে নিজের পিপের ভিতরে গিয়ে ঢুকল এবং তিনখানা ঠ্যাং ও খানকয়েক হাত বার করে বারকয়েক ছুঁড়লে এবং তারপর হঠাৎ সব গুটিয়ে নিয়ে গড়গড়িয়ে পথ দিয়ে ছুটে চলল!

ভোম্বল বললে, “এই হচ্ছে আমাদের যাদুঘর। যাও, তুমি ভেতরে ঢুকে চারিদিক ভালো করে দেখে এস-গে যাও। মানকে! তুই এই ভদ্র-লোককে সমস্ত দেখিয়ে আন!”—এই বলে সে একদিকে এগিয়ে চলল।

ভোম্বল আমাকে ‘তুমি’ বলে ডাকছে, তাই আমিও বললুম, “ওহে ভোম্বল, তুমি কোথায় চললে?”

—"হোটেলে, আর যৎকিঞ্চিৎ পেটে না দিলে চলে না! যাদুঘর দেখে-শুনে তুমি আবার আমার কাছে এস। সে আর আমার দিকে ফিরেও তাকালে না—খাবারের গন্ধ বোধহয় তার নাকে ঢুকেছে!

আমারও পেটে এখন আগুন জ্বলছে! একবার ভাবলুম আমিও হোটেলে গিয়ে ঢুকি, কিন্তু এদেশে আমাদের টাকা-পয়সা যদি না চলে, তবে খাবারের দাম দেব কেমন করে? এমনি সাত-পাঁচ ভেবে শ্রীমান মানকের সঙ্গে আমি যাদুঘরের ভিতরেই প্রবেশ করলুম।

যাদুঘরের ভিতরে ঢুকে আমি যে কত রকমের অজানা জিনিস দেখলুম তা আর গুণে উঠা যায় না! এই অদ্ভুত জীবদের স্রষ্টার নিজের-হাতে-আঁকা অনেকগুলো ছবিতে বুঝিয়ে দেওয়া আছে, মানুষের দেহের উপাদান থেকে কেমন করে এদের দেহ গড়া হয়েছে, কেমন করে তাদের মাংসের ভিতর থেকে হাড় বাদ দেওয়া হয়েছে, দ্রব্যগুণের মহিমায় এদের মগজের শক্তি কেমন করে বাড়িয়ে তোলা হয়েছে প্রভৃতি। সে-সব এখানে অকারণে বর্ণনা করে লাভ নেই, কারণ আসল ছবিগুলো না দেখলে কেউ কিছু বুঝতে পারবেন না!

অনেকগুলো পাথরের কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি রয়েছে। সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় এই পিপে-মানুষগুলোর চেহারা কি-রকম ছিল, সেই মূর্তি-গুলোর সাহায্যে তাই-ই দেখানো হয়েছে।

এক জায়গায় একটা যন্ত্র দেখলুম, তার নাম "নরডিম্ব-প্রস্ফুটন-যন্ত্র"। তার পাশে রয়েছে উটপাখীর ডিমের মতন মস্ত-একটা ডিম—উপরে লেখা "নর-ডিম"! দেখে আমার মাথা ঘুরে গেল বললেও কম বলা হয়!—ওরে বাবা! ঘোড়ার ডিমের কথা তো লোকের মুখে শুনেছি, মানুষের ডিম আবার কি? এর কথা তো ঠাট্টা করেও কেউ বলে না!

অনেকক্ষণ সেই ডিম আর যন্ত্রের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম। কিন্তু তবু কোন হদিস না পেয়ে স্থির করলুম—নিশ্চয়ই এটা একটা বড়-রকমের কৌতুক! যাদুঘরে এ-রকম গাঁজাখুরি কৌতুক থাকা উচিত নয়!

আর-একটা ঘরে গিয়ে দেখলুম চন্দ্রসেনের প্রকাণ্ড প্রতিমূর্তি। চন্দ্রসেন—এই অদ্ভুত জীবদের স্রষ্টা। সে মূর্তি দেখে মনে কিছুমাত্র শ্রদ্ধার উদয় হল না। বয়সের ভারে ঝুঁকে-পড়া, শীর্ণদেহের এক বৃদ্ধ—তার দুই চক্ষে ঠিক যেন হিংসা-পাগল হত্যাকারীর দৃষ্টি! দেখলেই ভয়ে বুক শিউরে ওঠে! আমার মনে হল চন্দ্রসেনের চোখদুটো যেন কুটিল ভাবে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। এ রাজ্যে সাধারণ মানুষের আবির্ভাব দেখে চোখদুটো যেন মোটেই খুশি নয়!

ঘরের ভিতরটা তখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে। ভয়ে ভয়ে পিছন-পানে তাকিয়ে দেখি, সেই মানকে বলে লোকটা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

তার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে বললে, "এ ঘরে আর বেশিক্ষণ থাকবেন না।"

আমি বললুম "কেন?"

মানকে ভয়ে ভয়ে খুব চুপিচুপি বললে, "অন্ধকার হলে এ ঘরে আর কেউ আসে না।"

—"কেন?"

একটা হাত তুলে চন্দ্রসেনের মূর্তি দেখিয়ে সে বললে, "ওঁর ভয়ে!"

আমি আবার মূর্তির দিকে তাকালুম। কোন জানলার ফাঁক দিয়ে একটি ক্ষীণ আলোকের টুকরো মূর্তির ঠোঁটের উপরে এসে পড়েছে। আমার মনে হল, চন্দ্রসেনের মুখে যেন একটা রক্তপিপাসু নিষ্ঠুর হাসির রেখা ফুটে উঠেছে!

ফিরে বললুম, "ওঁর ভয়ে কি-রকম? ওটা তো পাথরের মূর্তি!"

সে বললে, "অন্ধকার হলেই ঐ মূর্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে। তখন সকলেই শুনতে পায় কে যেন ভারি ভারি পাথুরে পা ফেলে ঘরময় চলে বেড়াচ্ছে। আসুন, আমি আর এখানে থাকব না।"

আমি তার কথা বিশ্বাস করলুম না বটে, কিন্তু এই ঘরে—এমন কি যাদুঘরেও আর থাকতে ইচ্ছা হল না। একেবারে বাইরে বেরিয়ে

হোটেলের দিকে গেলুম ভোম্বলের খোঁজে।

সেখানে গিয়ে দেখি, ভোম্বল ততক্ষণে মহা ধুমধাড়াক্কা লাগিয়ে দিয়েছে। তার খাবার টেবিলের উপরে পঁচিশ-ত্রিশখানা থালা পড়ে রয়েছে এবং একটা ঘটীতে মুখ দিয়ে ঢক ঢক করে কি পান করছে।

আমাকে দেখেই ভোম্বল টেবিল চাপড়ে খুব স্ফূর্তির সঙ্গে বলে উঠল, "এই যে অমলা! এস, এস, একটু ভাং খাবে এস!"

মনের রাগ কোনরকমে সামলে বললুম, "আমি সিদ্ধি ছুঁই না। সন্ধ্যের আগে আমার ফেরবার কথা, আমাকে নিয়ে চল।"

ভোম্বল তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "ভাগ্যিস মনে করিয়ে দিলে! চল, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। নইলে পণ্ডিত-বুড়োটা রাগ করবে, আর তার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে না!"

—"মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবে না মানে?"

—"ওহো, তুমি জানোনা বুঝি? কমলার সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ যে স্থির হয়ে আছে!"

কমলা! অমন সুশ্রী মেয়ের সঙ্গে এই বিটকেল জন্তুটার বিয়ে হবে! আশ্চর্য!

ভোম্বল বললে, শোনো। আমি যে ভাং খাই, পণ্ডিত-বুড়োকে এ-কথা বোলো না। যদি বল, তাহলে তুমি বিপদে পড়বে! এখন চল।"

আমরা দুজনে হোটেল থেকে বেরিয়ে এলুম।

ভোম্বল বেজায় টলছিল। তাই বোধহয় তিনখানা পায়ে আর টাল সামলাতে না পেরে খান ছয়েক পা বার করে হাঁটতে লাগল। তারপর চারখানা হাত বার করে চার হাতে তালি দিতে দিতে গাইতে লাগল—

ও তার   নামটি যে ভাই অমলা!
ও সে   নয়কো তবু অবলা!
তাকে   দাওনা সবাই কানমলা—
কানমলা হো! কানমলা—
কানমলা! তার নাম অমলা!

ঠ্যাং আছে তার মোটে দুটো,
মগজে তার মস্ত ফুটো,
বুদ্ধিতে তাই ডাহা ঝুটো—
করনা তাকে চ্যাং-দোলা!
ও তার নাম রেখেছি অমলা!

হয় কুপোকাৎ চড়লে গাড়ি,
ভবঘুরের নেইকো বাড়ি,
কী চেহারা! ঠিক আনাড়ি!
খোরাক খালি কাঁচকলা!

ও তার নাম রেখেছি অমলা!
ও সে নয়কো তবু অবলা!
তাকে দাওনা জোরে কানমলা,
কানমলা হো! কানমলা—
কানমলা! তার নাম অমলা!

আমার এমন রাগ হতে লাগল ইচ্ছা হল, মারি তার গালে ঠাস করে এক চড়! কিন্তু হতভাগা এখন মত্ত, একে মারা না-মারা দুই-ই সমান। কাজেই মুখ বুঁজে তার সব অসভ্যতা সহ্য করতে হল।

আমি নতুন মানুষ হব

পরের দিন সকালে পাখির গানে আমার ঘুম ভেঙে গেল।

জানলার ধারে পুচ্ছ নাচিয়ে একটি চমৎকার রঙিন পাখি মিষ্টি সুরে গান গাইছিল।

আমাদের চেনা পৃথিবীর পাখি দেখে চোখ যেন জুড়িয়ে গেল! ভাগ্যিস, চন্দ্রসেনের মগজে এখানকার পাখিদের দেহকেও উন্নত করবার খেয়াল গজায়নি!

এমন সময়ে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে সুন্দরী কমলা। তার মুখখানি কেমন যেন ম্লান-ম্লান।

আমি শুধালুম, "তোমার মুখ অমন কেন? অসুখ করেছে নাকি?"

কমলা বললে, "না! বাবা আমার ওপরে রাগ করেছেন।"

—"কেন?"

—"আমি এইরকম মূর্তি ধরেছি বলে। তিনি বললেন, আমি যদি শ্রীখোলের ভেতরে না থাকি তাহলে আমার পাপ হবে। একথা কি সত্যি?"

—"তোমার যদি ভালো না লাগে, তবে কেন তুমি খোলার ভেতরে থাকবে?"

—"আমিও তাই বলি। বাবা কিন্তু বোঝেন না। বাবা ভারি একরোখা মানুষ। আচ্ছা, বাবা যে বলেন, তুমি নাকি আমাদের মতন হরেক-রকম মূর্তি ধরতে পারো না, তোমার দেহ নাকি হাড়ে হাড়ে ভরা, আর তুমি নাকি গড়াতে পারো না? এ কথা কি সত্যি?"

—"সত্যি।"

—"তোমার শ্রীখোল নেই ?"

—"নিশ্চয়ই নেই ! আমাদের দেশে খোলার ভেতরে থাকে কেবল কচ্ছপ, কাঁকড়া, শামুক আর গেঁড়ি-গুগলিরা।"

—"আমি কেতাবে তোমার মতন জীবের কথা পড়েছি বটে, কিন্তু এর আগে চোখে কখনো দেখি নি। আচ্ছা, তোমাদের দেশে সব মানুষই কি একরকম দেখতে ?"

—"হ্যাঁ।"

—"তোমার চেহারা আমার খুব ভালো লাগে। আচ্ছা, তোমাদের দেশের মেয়েদেরও দেখতে কি আমাদেরই মতন ?"

—"হ্যাঁ। তবে তারা তোমার মতন এত সুন্দর নয়।"

আমার কথা শুনে কমলা খুব খুশি হয়ে হাসতে লাগল।

জানালা দিয়ে দূরের একখানা বাড়ি দেখিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "আচ্ছা কমলা, ঐ যে মস্ত বাড়িখানা দেখা যাচ্ছে, ওখানে কি হয় ?"

কমলা একবার উঁকি মেরে দেখে বললে, "ও হচ্ছে স্ফুটনাগার !"

—"সে আবার কি ?"

—"দূর, তুমি ভারি বোকা ! কিচ্ছু জানো না ! ওখানে যে ছেলে-মেয়েরা জন্মায় !···আমার পিঠ কট কট করছে, আমি এখন শ্রীখোলের ভেতরে ঢুকতে চললুম। আমার সে মূর্তি আমি তোমাকে দেখাব না, তাহলে তুমি আমাকেও ঠাট্টা করবে !"—পিঠে কালো কেশমালা দুলিয়ে কমলা একছুটে চলে গেল।

আমি দুই চোখ মুদে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলুম, স্ফুটনাগার আবার কাকে বলে ? কমলার কথায় তো কিছুই স্পষ্ট হল না !

হঠাৎ ঘরের ভিতরে পণ্ডিত-মশাই ও আর-একজনের গলা পেলুম। আমি উঠে বসতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু তারপরেই ভাবলুম ওরা কি বলাবলি করে চুপিচুপি শোনাই যাক্ না !

খানিক পরেই বুঝলুম, ওরা আমার সম্বন্ধেই কথা কইছে ! ওরা বোধহয় ভেবেছে, আমার ঘুম এখনো ভাঙে নি, আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছি না !

অচেনা গলায় কে বললে, "পণ্ডিতমশাই, আপনার এই নমুনাটি বেশ সরেস নয়।"

পণ্ডিত বললেন, "তা না হতেও পারে। কিন্তু এই নিরেস নমুনা নিয়েই আমরা যদি কেল্লা ফতে করতে পারি, তাহলে তো আমাদের সুনাম আরো-বেশিই হবে! আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে একবার অস্ত্র করলেই আমি ওর দেহকে ঠিক বদলাতে পারব।"

—"তারপর?"

—"আরো অনেক মানুষ ধরে এনে এই একই উপায়ে আমাদের জাতির জীবনী-শক্তি বাড়িয়ে তুলব। এ ছাড়া আর উপায় নেই—বহু বৎসরের পুরানো হয়ে পড়েছে বলে এখানকার সকলেরই জীবনী-শক্তির অবস্থা হয়ে আসছে ক্রমেই ক্ষীণ।"

—"অস্ত্র করবার আগে ঐ লোকটাকে কি সব কথা জানানো হবে?"

"অমরচন্দ্র, তুমি একটি আস্ত গাড়ল। আমাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারলে অমল মোটেই খুশি হবে না!"

—"কি পদ্ধতিতে আপনি কাজ করবেন?"

—"প্রথমে অমলের দেহকে আমি লম্বালম্বি ভাবে ফালা ফালা করে কাটব। তারপর দেহের সেই খণ্ডগুলোকে বাজের আগুনে তাতিয়ে হাড়-গোড় সব বার করে নেব।"

এতক্ষণ শান্ত ভাবে চুপ করে সব শুনছিলুম, কিন্তু এই পর্যন্ত শুনেই আতঙ্কে আমি প্রায় চিৎকার করে উঠেছিলুম আর কি! ওরে চাঁদমুখো বুড়ো রাক্ষস, তোর মনে মনে এত শয়তানি?

অমরচন্দ্র বললে, "কিন্তু পণ্ডিতমশাই, মনে আছে তো, গেল বছরে সেই তুর্কী লোকটার উপরে অস্ত্রাঘাত করে আপনি বিফল হয়েছিলেন? সেই থেকে মহারাজা হুকুম দিয়েছেন, এ রাজ্যে কেউ আর এরকম পরীক্ষা করতে পারবে না?"

—"হুঁ। কিছুই আমি ভুলি নি। কিন্তু আমি কাজ সারব খুব লুকিয়ে। তারপর যদি সফল হই, মহারাজা আর আমার উপরে রাগ

করতে পারবেন না। সেবারের পরীক্ষা ব্যর্থ হয়েছিল বলেই তো অত গোলমাল হয়!"

—"এখানকার অনেক পণ্ডিতও আপনার শত্রু, এ-কথাটাও মনে রাখবেন! আর রাজসভায় ভোম্বলদাসের খুবই পসার, সেও আপনার বিশেষ বন্ধু নয়।"

পণ্ডিত বললেন, "সবই আমার মনে আছে। যেদিন অস্ত্র করব, তুমি হাজির থাকবে তো?"

—"নিশ্চয়! প্রমোদকেও নিয়ে আসব।"

—"হ্যাঁ, তাকেও দরকার হবে বৈকি,—ছুরি চালাতে ছোকরা খুব মজবুৎ!"

অমরচন্দ্র বললে, "ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আপনার এবার-কার পরীক্ষা যেন সার্থক হয়—চন্দ্রসেনের প্রেতাত্মা যেন আমাদের সাহায্য করেন!"

তারপর পায়ের শব্দে বুঝলুম, দুই শয়তান ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হুঁ, তাহলে আমার দেহকে লম্বালম্বি ভাবে ফালাফালা করে কেটে, বাজের আগুনে তাতিয়ে, হাড়গোড় বার করে নিয়ে নতুন এক পরীক্ষা করা হবে? ওঃ, কী সুমধুর কথা রে, শুনে অঙ্গ যেন জল হয়ে গেল!

আমি ভয় পেয়েছি? ধেৎ, ভয় তো খুব ছোট কথা, আমার বুকটা এরি মধ্যে কুঁকড়ে যেন শুকনো চামড়ার মতন শক্ত হয়ে উঠেছে!

এমন সময়ে ঘরের ভিতরে আবার পায়ের শব্দ!

ইনি আবার কোন অবতার? এখানে এসে বুক ধড়াস-ধড়াস করেই প্রাণটা বেরিয়ে যাবে দেখছি! সর্বদাই নতুন-নতুন বিপদের ভাবনায় মনটা অস্থির হয়ে আছে। যে সৃষ্টিছাড়া দেশ!

কান পেতে মটকা মেরে পড়ে রইলুম।

তারপরেই ভোম্বলদাসের ভরাট ভারিক্কে গলায় শুনলুম, "আরে ওকি! ওহে অমল, তোমাদের দেশের লোকেরা কি এত বেলা পর্যন্ত বিছানায় কাৎ হয়ে থাকে?"

আমি উঠে বসে নির্বাক হয়ে রইলুম—ভোম্বল কালকে যে-গানটা গেয়েছিল, সেটা এখনো আমি ভুলতে পারি নি। আমার নাম অমলা? আমায় দেবে কানমলা? বটে!

ভোম্বল তার কাৎলা মাছের মতন ড্যাবডেবে চোখে আমার মুখের পানে চেয়ে বুঝতে পারলে যে, আমি তার উপরে একটুও খুশি নই। সে আমার কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বললে, "অমল! ভায়া! কাল সন্ধ্যের সময়ে আমি ঝোঁকের মুখে একটা গান গেয়ে ফেলেছিলুম! তা ভাই, বন্ধুত্ব থাকলে অমন হয়েই থাকে। তুমি কিছু মনে কোরো না।"

আমি নিজের মুখখানা আরো-বেশি গোমড়া করে তুললুম। আর সত্যি বলতে কি, এই ভুতুড়ে জন্তুটা আমাকে তার বন্ধু মনে করে শুনে আমার রাগ যেন আরো বেড়ে উঠল! আমি হব এই-সব অপরূপ চেহারার বন্ধু? তা আর জানি না—কচুপোড়া খাও!

আমি এখনো কথা কইলুম না দেখে ভোম্বল আরো দমে গিয়ে বললে, "হ্যাঁ ভাই অমল, তুমি কি সত্যি-সত্যি আমাকে মাপ করবে না? দেখ, এই আমি আট হাত বার করলুম! আট হাত জোড় করে আমি মাপ চাইছি এমন কাজ আর কখখনো করব না! বল তো আমি চার-পাঁচটা নাক বের করে চার-পাঁচটা নাকে খৎ দেব!"

ধাঁ-করে আমার মাথায় এক বুদ্ধি এল! আমি বেশ বুঝলুম ভোম্বলের সিদ্ধি খাওয়ার কথাটা পণ্ডিতের কানে তুলে দিলে পাছে কমলার সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধটা ভেঙে যায়, সেই ভয়েই সে আমার কাছে এত কাকুতি-মিনতি করছে! নইলে মনে মনে সে নিশ্চয়ই আমাকে দু-চক্ষে দেখতে পারে না! হাতে যখন পেয়েছি, তখন আর একে হাতছাড়া করা নয়! এই ভীষণ শত্রুপুরীতে একে দিয়েই কাজ করিয়ে নিতে—অর্থাৎ কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে।

কাজেই এইবারে আমি মুখ খুলে বললুম, "ও-রকম গান তুমি আর-কখনো গাইবে না?"

—"না, না, না! এই তিন সত্যি!"

—"আচ্ছা, এবারের মতন তোমাকে মাপ করা গেল!"

—"কালকের কথা কারুকে বল না?"

—"না।……কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার কি রাজ-সভায় যাতায়াত আছে?

—"খুব আছে! রাজা যে আমাকে বড় ভালবাসেন।"

—"আচ্ছা ভোম্বল, তুমি অমরচন্দ্রকে চেনো?"

—"খুব চিনি! কিন্তু একথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?"

—"তুমি বোধহয় ঐ অমরচন্দ্র আর আমাদের পণ্ডিতকে দেখতে পারো না?"

ভোম্বলের মুখ শুকিয়ে গেল। চারিদিকটা একবার দেখে নিয়ে ভয়ে ভয়ে বললে, "এ কথা তুমি জানলে কেমন করে?"

আমি বললুম, "যেমন করে হোক জেনেছি। আচ্ছা ভোম্বল, জ্যান্ত মানুষের দেহ নিয়ে ছুরি দিয়ে কাটাকুটি করা কি ভালো?"

ভোম্বল বললে, "কে কাটছে, আর কাকে কাটছে, তা না জেনে মত দি কেমন করে? এই ধর, যদি কেউ বলে যে আমি বেঁচে থাকতে থাকতেই ছুরি দিয়ে কেউ আমার দেহ ব্যবচ্ছেদ করবে, তাহলে আমি এমন চেঁচিয়ে আপত্তি করব যে আকাশ ফেটে যাবে। কিন্তু তোমার দেহ ব্যবচ্ছেদ করলে আমি আপত্তি না করতেও পারি!"

আমি চোখ রাঙিয়ে বললুম, "বটে, বটে! তাই নাকি?"

থতমত খেয়ে ভোম্বল বললে, "না ভাই, আমি ঠাট্টা করছিলুম!"

—"এ ঠাট্টাটা তোমার কালকের গানের চেয়েও খারাপ।"

—"যাইই বল ভাই, তুমি ভারি বদরসিক! ঠাট্টা বোঝোনা। এদেশের লোকরা খুব ঠাট্টা বোঝে। আমি একবার ঠাট্টা করে একজনের চারটে হাত কেটে নিয়েছিলুম। সে কিছু বলে নি।"

—"বলবে কেন? চারটের জায়গায় তার আবার আটটা নতুন হাত গজিয়ে উঠেছিল!"

—"হ্যাঁ, এ কথা সত্যি বটে।…কিন্তু দেখ অমল, তোমার আজকের

কথা শুনে আমার আর একটা কথা মনে পড়ে গেল। কিছুদিন আগে একটা তুর্কী পথ ভুলে আমাদের দেশে এসে পড়েছিল। পণ্ডিত-মশাই সেই তুর্কীটার জ্যান্ত দেহ নিয়েই কাটাকুটি করেছিলেন।"

এর সঙ্গে যেন আমার নিজের কোন সম্পর্কই নেই, এমনি উদাসীন ভাবে আমি বললুম, "কেন?"

—"কেন, তা ঠিক জানি না! তবে গুজবে শুনেছিলুম, আমাদের চেয়েও নাকি নতুন একরকম মানুষ তৈরি করবার চেষ্টা হচ্ছিল।"

আমি শিউরে উঠে বললুম, "তারপর?"

—"নতুন মানুষ তৈরি হল না ছাই হল! মাঝখান থেকে সেই তুর্কী-বেচারাই দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে মারা পড়ল! সেই থেকে এখানে আইন হয়েছে, যার দেহ কাটাকুটি করা হবে, কাটবার আগে তার নিজের মত না নিলে চলবে না।"

একটা অস্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম, বুকের উপর থেকে মস্ত-একটা বোঝা নেমে গেল! পণ্ডিত যদি খুব আদর-মাখা মিষ্টি সুরেও বলেন—"অমল, তুমি লক্ষ্মীছেলে। আমি তোমার দেহখানি লম্বালম্বি ভাবে ছুরি দিয়ে কেটে ফালা ফালা করতে চাই। আশা করি আমার এ অনুরোধ তুমি রাখবে।" —তখন আমি নিশ্চয়ই বলব না যে, "আপনার আদেশ আমি মাথায় পেতে নিলুম! তবে আর দেরি কেন? দয়া করে ছুরি উঁচিয়ে এগিয়ে আসুন, আমি ধন্য হই!"

ভোম্বল বললে, "দেখ, আজ কদিন ধরে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছি! তুমি যার নাম করলে, ঐ অমরা-ব্যাটা আর পণ্ডিত প্রায়ই একসঙ্গে কি গুজগুজ করে। ওরা বোধহয় আবার কোন শয়তানি করবার চেষ্টায় আছে!"

আমি মনের ভাব লুকিয়ে বললুম, "না না, আমাদের পণ্ডিতমশাই খুব সাধু লোক! দয়ার শরীর!"

—"হেঃ, সাধু লোক! দয়ার শরীর! তুমি তাহলে লোক চেন না! জুজুবুড়ো—জুজুবুড়ো, পণ্ডিত হচ্ছে, একটি জুজুবুড়ো!···যাক সে কথা।

আজ তুমি বেড়াতে যাবে নাকি ?”

—“আবার !”

—“ভয় নেই ! আজ আর আমি হোটেলেও যাব না—গান-টানও গাইব না !”

—“তবে কোথায় যাবে ?”

—“মন্ত্রীসভায়। সেখানে আজ তর্ক হবে।”

—“আচ্ছা, পণ্ডিত-মশাইকে জিজ্ঞাসা করে দেখব। তাঁর মত নেওয়া চাই তো !”

একাদশ

আবার নরডিম্ব

বৈকালে আমরা যখন চা পান করি, এরা তখন লঙ্কার সরবৎ খায় ! পণ্ডিত-মশাই বলেন, “পৃথিবীর সবটাই যে সুখের নয়, এ সত্য মনে রাখবার জন্যেই লঙ্কার ঝাল-সরবতের ব্যবস্থা।”

পৃথিবীতে দুঃখ যে কত, জুজু-রাজ্যের জুজুদের পাল্লায় পড়ে সেটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। তাই ঝাল-সরবৎ পান করে সে দুঃখ আরো বাড়াবার চেষ্টা আমি কোনদিন করিনি।

আজ বৈকালে ঝাল-সরবতের মহিমায় কমলা যখন হা হু করছিল, সেই সময়ে তার সঙ্গে আমার দেখা হল।

কমলা বললে, “আজ নীলশাড়ি পরে আমাকে কেমন দেখাচ্ছে ?”

আমি বললুম, “চমৎকার।”

হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করে বসল, “ও অমলবাবু। তোমাদের দেশের খোকা-খুকীদের কেমন দেখতে ?”

আমাদের খোকা-খুকিদের একটু বর্ণনা দেবার চেষ্টা করলুম !

কমলা বললে, "তোমার নিজের কোন খোকা-খুকি আছে ?"

—"না।"

কমলা দুঃখিত মনে বললে, "আমারও নিজের কোন খোকা-খুকি নেই ! পঁচিশ বছর বয়স না হলে কেউ এখানে খোকা-খুকু কিনতে পারে না।"

আমি বিস্ময়ে খানিকক্ষণ বোবা হয়ে রইলুম। তারপর বললুম, "তোমরা খোকা-খুকু কেনো ?"

—হ্যাঁ। খোকা-খুকুর বয়স যত কম, তার দামও হয় তত বেশি। আমার বাবা আমাকে দুই বৎসর বয়সে কিনেছিলেন।"

এমন সময়ে পণ্ডিত এসে হাজির। আমাদের কথাবার্তা এইখানেই থেমে গেল। মনে মনে ঠিক করলুম, ভোম্বলের সঙ্গে দেখা হলে আসল কথা জেনে নিতে হবে। এই খোকা-খুকুর ব্যাপারে একটা কিছু রহস্য আছে !

ভোম্বল যথাসময়েই এল। মন্ত্রণা-সভায় যাবার পথে তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, "আচ্ছা, কমলা যে বলছিল দু-বছর বয়সের সময়ে তার বাবা তাকে কিনেছেন, এ-কথার মানে কি ?"

ভোম্বল বললে, "মানে তো খুবই সোজা ! ও, বুঝেছি—কোথায় তোমার খটকা লেগেছে !......তবে শোনো। চন্দ্রসেন যখন আমাদের সৃষ্টি করলেন, তখন ভেবে দেখলেন যে, সাধারণ দুর্বল মানুষরা যে-ভাবে জন্মায় সে-ভাবে আমরাও জন্মালে আমাদের সকলকার শক্তি ঠিক সমান ভাবে বাড়বে না। এই দেখনা, তোমাদের একই পিতা-মাতার পাঁচটি সন্তানের শক্তি আর বুদ্ধি একরকম হয় না। চন্দ্রসেন তাই স্থির করলেন, আমরা ডিম পাড়ব।"

আমি যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলুম না—

"ডিম ? তোমরা ডিম পাড়বে ?"

—"হ্যাঁ। আমরা ডিম পাড়ি। পাড়বার পর প্রত্যেক ডিমটিকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা করা হয়। যে-সব ডিম নিরেস, অর্থাৎ খারাপ,

সেগুলোকে নষ্ট করে ফেলা হয়। ভালো ডিমগুলোকে বেছে 'ফুটনাগারে' নিয়ে গিয়ে যত্ন করে রাখা হয়। ডিম সেইখানে ফোটে।"

—"কেন? যাদের ডিম তারাই ফোটায় না কেন?"

—"তাহলে বেআইনি কাজ করা হবে। যে-সব পুরুষ আর নারী নিজেদের ডিম লুকিয়ে রাখে, তারা কড়া শাস্তি পায়।"

—"যে-সব পুরুষ আর নারী?"

—"হ্যাঁ। এদেশে পুরুষ আর নারী দুয়েরই ডিম হয়।"

—"বল কি! এখানে পুরুষরাও ডিম পাড়ে?"

—"নিশ্চয়ই পাড়ে!"

—"তারপর?"

—"ঐ সব ডিম ফোটবার পরেও খোকা-খুকিদের 'ফুটনাগারে'র ভেতরেই লালন-পালন করা হয়। তারপর যখন আমাদের সন্তান পালন করবার মতন বয়স হয়, তখন আমরা খোকা বা খুকিকে কিনে বাড়িতে নিয়ে আসি।"

আমি সব শুনে এতটা হতভম্ব হয়ে গেলাম যে, মন্ত্রণা-সভায় পৌঁছবার আগে আর কোন কথাই কইতে পারলুম না।

মন্ত্রণা-সভার বাড়িখানা খুবই প্রকাণ্ড। গোল বাড়ি।

ঢোকবার মুখেই কয়েকজন সেপাই বা দারোয়ান আমাদের জামা-কাপড় ভালো করে হাতড়ে দেখলে এবং যা-কিছু সন্দেহজনক বা আপত্তিকর বলে মনে করলে, আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে বললে, "যাবার সময়ে চেয়ে নিয়ে যেও!"

ভোম্বলকে সুধলুম, "এ আবার কি নিয়ম?"

ভোম্বলদাস দন্তবিকাশ করে হেসে সংক্ষেপে বললে, "মন্ত্রণা-সভাকে প্রজারা বেশি ভালোবাসে না।"

বড় হল-ঘরটার ভিতরে গিয়ে আমরা যখন ঢুকলুম তখন সেখানে লোকজন ছিল না—কেবল মঞ্চের উপরে বসে একটিমাত্র পিপে নাক ডাকিয়ে আরামে নিদ্রা দিচ্ছিল।

পিপের সামনেই চকচকে পিতলের একটি নলচে।

ভোম্বল বললে, "ঐ নলচের সাহায্যে শান্তিরক্ষা করা হয়। ওর ব্যবহার আজকেই তুমি বোধহয় দেখতে পাবে।"

হল-ঘরটার বিশেষ বর্ণনা দেবার দরকার নেই। ঘরের মেঝেটা মাঝখান থেকে পাক খেয়ে উপরে উঠে গেছে—এইমাত্র তার বিশেষত্ব। সমস্ত সভাস্থলের মধ্যে কোথাও একখানা চেয়ার দেখা গেল না। চেয়ারের এখানে কোন কাজ নেই। পিপেরা আসে, পিপের তলার দিকটা মাটিতে রেখে বসে পড়ে। কোন ল্যাঠা নেই!

ঘুমন্ত পিপেটা আচম্বিতে জেগে উঠে ঢং করে একবার কাঁসর বাজালে। পর-মুহূর্তে দুমদাম করে চারিদিককার অনেকগুলো দরজা খুলে গেল এবং দলে দলে পিপে হুড়মুড় করে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ে যে যার নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে আসন গেড়ে বসল। হট্টগোলে কান পাতা দায়!

মঞ্চের পিপেটা আবার ঢং করে কাঁসর বাজিয়ে বললে, "সভার কাজ আরম্ভ হোক।"—

অমনি এক সঙ্গে ডজন-খানেক পিপে দাঁড়িয়ে উঠে হাত-পা নেড়ে ও মুখভঙ্গি করে চ্যাঁচাতে লাগল। তারা যেই থামল, অমনি আবার নতুন একদল পিপে লাফিয়ে উঠে গোলমাল সুরু করলে।

ভোম্বলের ভাব ও মাথা-নাড়া দেখে আন্দাজ করলুম, পিপেরা যা বলছে সে তা বেশ বুঝতে পারছে। আমি কিন্তু সেই হ-য-ব-র-ল শুনে কোন অর্থই আবিষ্কার করতে পারলুম না।

বললুম, "কখন তর্ক সুরু হবে?"

ভোম্বল বললে, "তোমার মতন হাঁদাগঙ্গারাম আমি আর একটিও দেখি নি। ঐ তো তর্ক চলছে!"

—"এই তর্ক! কিন্তু ওরা যে সবাই একসঙ্গে কথা কইছে!"

—"হ্যাঁ, একসঙ্গে কথা কইবে না তো কি করবে? একসঙ্গে কথা না কইলে ওরা কি সবাই আলাদা-আলাদা করে কথা কইবার সময় কখনো পাবে?"

—"কিন্তু ঐ হট্টগোলে কি করে ওরা পরস্পরের কথা বুঝতে পারে?"

—"বোঝাবার কোন দরকার নেই তো!"

—"তাহলে রাজ্য চলবে কেন?"

আমার দিকে খুব-একটা দয়ার দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভোম্বল বললে, "তোমার বুদ্ধি দেখছি ভারি কাঁচা! এও বোঝোনা, প্রত্যেক সভ্য যখন তার নিজের দলের জন্যেই ভোট দেয়, তখন তার কথা বোঝা না গেলেও ক্ষতি নেই!"

—"তাহলে বাজে কথা কয়ে মিছে তর্ক করবার দরকার কি?"

—"আচ্ছা আহাম্মকের পাল্লায় পড়লুম যা-হোক! ওহে বাপু, কথাই যদি না কইবে, তবে সভ্য হয়ে লাভ কি?"

—"তাহলে পরস্পরের কথা শুনতে না পেলেও চলে?"

—"নিশ্চয়! ওরা অন্যের কথা শুনতে চায় না, নিজেদের কথাই শোনাতে চায়! সেইজন্যেই ওরা সভ্য হয়েছে!"

মঞ্চের পিপের নাক এই গোলমালের সময়ে রীতিমত গর্জন করছিল। হঠাৎ আবার জেগে উঠে সে কাঁসর বাজালে। অমনি যেখানে যত পিপে সবাই একসঙ্গে চ্যাচাতে-চ্যাচাতে একদিকে ছুটে গেল।

আমি বললুম, "ও আবার কি?"

ভোম্বল বললে, "ওরা ভোট দিচ্ছে।"

আচম্বিতে আর-একদিকে দুই দলের ভিতরে বিষম দাঙ্গা সুরু হয়ে গেল।

মঞ্চের পিপে বোধহয় আবার ঘুমোবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখেই সে অত্যন্ত সজাগ হয়ে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল! তারপর যেদিকে দাঙ্গা হচ্ছে, সামনের পিতলের নলচের মুখটাকে সেইদিকে ফিরিয়ে কি-একটা কল টিপে দিলে। একটা ছোট গোলা দড়াম করে যথাস্থানে পড়ে ফেটে গেল! দেখলুম, তিনজন লোক মাটির উপরে গিয়ে পড়ল—তখন তাদের আর পিপে বলে চেনবারই যো নেই। দেহগুলো ভেঙে-চুরে তাল পাকিয়ে বা গুঁড়ো হয়ে গেছে!

ভোম্বল বলে উঠল, "ঐ যাঃ! বুড়ো দেবেনের গতর চুরমার হয়ে

গেল দেখছি !"

সমস্ত চ্যাঁচামেচি ও হুড়োহুড়ি একেবারে ঠাণ্ডা !

আমি সভয়ে বললুম, "হ্যাঁ ভোম্বল, তাহলে সত্যিই কি ওরা মারা পড়ল ?"

ভোম্বল বললে, "তা পড়ল বৈকি ! তাছাড়া শান্তিরক্ষার আর কোন উপায় ছিল না যে ! দোষ তো দেবেনেরই ! প্রতিবারেই সে একটা না একটা হাঙ্গাম না করে ছাড়বে না ! এইবারে বাপধন সায়েস্তা হলেন ! কিন্তু ওকি ! অমল, তোমার কি হঠাৎ কোন অসুখ করল ?"

আমি বললুম, "তোমাদের মন্ত্রণা-সভাকে নমস্কার করছি। আমাকে বাইরে নিয়ে চল ।"

দ্বাদশ

বিপদ মূর্তিমান

মন্ত্রণা-সভার বিশ্রী ব্যাপারটা দেখে আমার প্রাণ-মন কেমন নেতিয়ে পড়েছিল। বাসায় ফিরে এসেও কিছুই ভালো লাগল না।

দেয়ালের গায়ে একখানা বেহালা টাঙানো ছিল, হঠাৎ তার দিকে আমার নজর গেল।

অন্যমনস্ক ভাবে বেহালাখানা নামিয়ে নিয়ে, তারগুলো বেঁধে একলাটি বসে বাজাতে লাগলুম।

একে তো এক উটকো সৃষ্টিছাড়া দেশে এসে প্রায় বন্দীর মতনই আছি, তার উপরে শিয়রে সর্বদাই খাঁড়া ঝুলছে, খুনে পণ্ডিত কখন যে আমার দেহ ব্যবচ্ছেদ করতে চাইবে কিছুই বলা যায় না, কাজেই এ-রকম মন নিয়ে আমি যে নিজের অজান্তে খুব-একটা দুঃখের সুর বাজাব, তাতে আর সন্দেহ কি ?

অনেকক্ষণ পরে যখন থামলুম, হঠাৎ একফোঁটা গরম জল আমার গলার উপরে এসে পড়ল।

চমকে ফিরে দেখি, ঠিক আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে কমলা, আর তার বড় বড় দুই চোখ ভরে কান্নার জল উপচে পড়ছে! আমি এমন তন্ময় হয়ে ছিলুম যে, কখন সে ওখানে এসে দাঁড়িয়েছে, একটুও টের পাই নি!

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, "কমলা, কমলা! তুমি কাঁদছ কেন?"

কমলা তাড়াতাড়ি তার চোখের জল মুছে ফেলে লজ্জার হাসি হেসে বললে, "তুমি অমন দুঃখের সুর বাজাচ্ছিলে কেন? আমার যে কান্না পেল!"

আমি হেসে বললুম, "তবে আমার দুঃখের সুরকে তুমি তোমার হাসির স্রোতে ভাসিয়ে দাও! তুমি একটি গান গাও, আর আমি তার সঙ্গে বাজিয়ে যাই। গাইবে?"

কমলা বললে, "হুঁ, তা কেন গাইব না? শোনো—"

আকাশের চাঁদ-মুখ
ভেসে চলে নদীজলে
বাতাস কানেতে এসে
'কত ভালোবাসি' বলে।
নীল-লাল মুখ তুলি
দুলে দুলে ফুলগুলি
আতর-স্বপন দেখে
ঝরে পড়ে দলে দলে।
অচেনা গানের পাখি
আমারে বলিল ডাকি—
'হাসো-গাও! যতদিন
আছ ভাই, ধরাতলে'!"

গান শেষ হলে পর বললুম, কমলা! তোমার কি মিষ্টি গলা!

সেদিন ভোম্বলের গান শুনে তোমাদের দেশের গানে অরুচি ধরে গিয়েছিল—"

কমলা বললে, "সে তোমাকেও গান শুনিয়েছিল নাকি! ঐ তো তার রোগ! সবাইকে তার গান না শুনিয়ে ছাড়বে না! নিজেকে মস্ত ওস্তাদ মনে করে, ভাবে, সারা দুনিয়া তারই গান শোনবার জন্যে কান খাড়া করে আছে! আমাকেও মাঝে মাঝে জোর করে ধরে বসিয়ে গান শোনায়—বাব্বাঃ! সে যে কী কাণ্ড! যেন তিনটে প্যাঁচা, দুটো গাধা আর একটা হুলো-বেড়াল একসঙ্গে ঝগড়া করছে! গান শেষ হলে আবার জিজ্ঞাসা করা চাই—'ভালো লাগল তো'? কিন্তু তার গান ভালো বললেই বিপদ বেশি! আমি যদি বলি—'ভয়ঙ্কর ভালো লাগল', তাহলে আর রক্ষে নেই, অমনি আবার তানপুরো ঘাড়ে করে বলে 'তাহলে আর একটা এর চেয়েও ভালো গান শোনো!"

আমি হেসে ফেলে বললুম, "না কমলা, ভোম্বল আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে, আমাকে সে আর-কখনো গান শোনাবে না!"

কমলা বললে, "অমলবাবু, তাহলে মানতেই হবে যে, ভগবান তার মাথায় সুবুদ্ধি দিয়েছেন!"

আমি বললুম, "আচ্ছা কমলা, তুমি আমাকে অমলবাবু বল কেন, দাদা বলতে পারো না?"

—"দাদা বললে তুমি যদি রাগ কর?"

—"কেন রাগ করব? আমি যে তোমাকে ঠিক ছোট বোনটির মতন দেখি!"

কমলা বললে, "এ-কথা শুনে আমার ভারি আহ্লাদ হল! মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি যদি তোমাদের মতন হতুম!"

—"কেন কমলা, তুমি তো ঠিক আমাদেরই দেশের মেয়ের মতন দেখতে?"

—"না, এটা তো আমার নকল দেহ! যাদুঘরে এইরকম মেয়ের ছবি দেখে আমার ভারি ভালো লেগেছিল, তাইতো আমি সখ করে প্রায়ই

এইরকম মূর্তি ধরি। কিন্তু এই নকল দেহ নিয়ে বেশিক্ষণ থাকতে তো পারি না, আমাদের হাড় নেই বলে খানিকক্ষণ পরেই কষ্ট হয়, তখন তাড়াতাড়ি আবার সেই বিশ্রী শ্রীখোলের ভেতরে গিয়ে ঢুকি! চন্দ্রসেন আমাদের দেহ বদলে ভালো কাজ করেন নি! এই যে এখন আমার চেহারা তোমার ভালো লাগছে, আমাকে তুমি নিজের বোনের মতন দেখছ, একটু পরে আমাকে সেই শ্রীখোলের ভেতরে দেখলে তুমিই হয়তো ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নেবে! কেমন, এ কথা কি সত্যি নয়?"

আমি বললুম, "ঘেন্না নয় কমলা, তবে ও-রকম চেহারা দেখবার অভ্যাস নেই বলে অবাক হতে হয় বটে!"

—"না, এ তুমি আমার মন-রাখা কথা বলছ! আমি তোমার চোখের ভাব দেখেছি, তুমি খালি অবাক হও না, ভয় পাও, ঘেন্না কর!"

—"কমলা, তুমি কি জানো, কেবল চন্দ্রসেন নন, একালেও তোমার বাবা আবার একরকম নতুন মানুষ তৈরি করতে চান?"

—"না। তবে আজকাল বাবার মুখ দেখে আমার কেমন একটা সন্দেহ হচ্ছে!"

—"কি সন্দেহ?"

—"কিছুকাল আগে বাবা এক তুর্কীর দেহে ছুরি চালিয়ে চালিয়ে সে-অভাগাকে মেরে ফেলেছিলেন! সেই সময়ে তাঁর মুখের ভাব যে-রকম হয়েছিল, আজকাল তাঁকে দেখলে তাঁর সেই মুখের ভাব আমার মনে পড়ে।"

—"কমলা, তাহলে শোনো। তুমি আমার বোনের মতন! তোমার কাছে আমি কিছু লুকবো না"—বলে সেদিন পণ্ডিত আর অমরচন্দ্রের ভিতরে যে-সব কথাবার্তা হয়েছিল সমস্তই আমি কমলার কাছে প্রকাশ করলুম।

কমলা প্রথমটা স্তম্ভিতের মতন স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর উত্তেজিত স্বরে বললে, "উঃ, বাবা এত নিষ্ঠুর? আবার তিনি তোমাকে হত্যা করতে চান? কিন্তু তোমার কোন ভয় নেই, আমি তোমাকে সাহায্য

করব। এখন এদেশে জ্যান্ত মানুষের দেহে ছুরি চালানো বেআইনি। আমি এখানকার এমন অনেক লোককে চিনি যারা বাবাকে এ-রকম পাপকাজ কিছুতেই করতে দেবে না। এই ষড়যন্ত্রের কথা আমি নিজে গিয়ে তাদের কাছে বলে আসব!"

আচম্বিতে পিছন থেকে ক্রুদ্ধ গম্ভীর স্বরে শোনা গেল, "যা শুনলুম, তা কি সত্য?"

চমকে ফিরে সভয়ে দেখলুম, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন পণ্ডিত-মশাই! তাঁর দুই চক্ষে দু-দুটো আগুনের শিখা! এবং সেই অগ্নিময় চোখদুটো একবার কোটরের বাইরে পাঁচ-ছয় হাত বেরিয়ে আসছে, তারপর আবার কোটরের ভিতরে সেঁদিয়ে যাচ্ছে। এটা বোধহয় পিপে-মুল্লুকে বিশেষ রাগের লক্ষণ!

ত্রয়োদশ

কমলার পিপে

যে-ভয়ানক দিনটাকে আজ কয়দিন মন থেকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছিলুম না, চোখের সামনে এখন সে যেন মূর্তি ধরে দেখা দিলে!

কমলার কথা পণ্ডিত শুনতে পেয়েছে! আমি যে তাদের ষড়যন্ত্র ধরে ফেলেছি, এটাও সে জানতে পেরেছে! আর আমার বাঁচোয়া নেই!

পণ্ডিতের এখনকার চেহারা দেখে ভোম্বলের কথা মনে পড়ল। জুজুবুড়ো—জুজুবুড়ো! তার মুখে-চোখে এখন পিশাচের ভাব ফুটে উঠেছে।

খুব টিটকিরি দিয়ে কমলার দিকে ফিরে পণ্ডিত বললে, "মেয়ে আমার দেবী হয়েছেন! বাবাকে পাপ-কাজ করতে দেবেন না! একটা

বিদেশী জন্তুকে বাঁচাবার জন্যে পাঁচজনকে সব জানিয়ে আমার সর্বনাশের চেষ্টা করবেন! আহাহাহা—মরি মরি!"

কমলা জবাব না দিয়ে মাথা হেঁট করলে। তার মুখ তখন ভয়ে সাদা হয়ে গেছে!

পণ্ডিত বললে, "যখন-তখন তুই ঐ সেকেলে মানুষগুলোকে নকল করিস বলে বরাবরই আমার সন্দেহ ছিল যে, তোর বুদ্ধির গোড়ায় গলদ আছে! কিন্তু তুই যে এতটা অধঃপাতে গিয়েছিস তা আমি বুঝতে পারি নি! জানিস, এ রাজ্যে বাপ-মায়ের অবাধ্য হলে ছেলে-মেয়েরা কি কঠিন শাস্তি পায়?"

কমলা বললে, "কিন্তু অমল-দাদাকে তুমি কিছুতেই খুন করতে পারবে না!"

দাঁত-মুখ খিচিয়ে পণ্ডিত বললে, "কী? অমলদাদা। ঐ সেকেলে জড়ভরতটাকে তুই আমার সামনে দাদা বলে ডাকছিস। রোস,—চুপ করে দাঁড়া! তোর সব ভিরকুটি আজকেই ঠাণ্ডা করে দেব!"

পণ্ডিত উগ্রদৃষ্টিতে অগ্রসর হয়ে কমলার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে কি-রকম অদ্ভুত ভঙ্গিতে দুটো হাত নাড়তে লাগল—সঙ্গে সঙ্গে কমলার মুখে-চোখে ও সর্বাঙ্গে কেমন-একটা তীব্র যাতনার ঢেউ বয়ে গেল,—তার ভাব দেখে আমাদের মনে হল, সে যেন কি-একটা অদৃশ্য বিভীষিকাকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে চেষ্টা করছে—প্রাণপণে চেষ্টা করছে!

পর-মুহূর্তেই স্তম্ভিত দৃষ্টিতে দেখলুম, কমলার দেহ আকারহীন থলথলে মাংসপিণ্ডের মতন মাটির উপরে গড়াগড়ি দিচ্ছে! যাদুঘরে যাবার দিনে চাকা-গাড়ি থেকে জেলিমাছের মতন যে দেহটার উপরে আমি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলুম, কমলার দেহকে দেখতে হয়েছে এখন ঠিক সেইরকম।

মাংসপিণ্ডের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিনিক্ষেপ করে পণ্ডিত বললে, "এইবারে আদর করে তোর অমল-দাদাকে একবার ডেকে ত্যাখ না! এখন ও আর তোর দিকে ফিরেও চাইবে না!"

রাগে গা আমার জ্বলে গেল। একবার মাংসপিণ্ডের দিকে তাকালুম।

তার ভিতর থেকে দুটি চোখ অত্যন্ত কাতর ও দুঃখিত ভাবে আমার মুখের পানে চেয়ে আছে! কমলার দেহ বদলেছে, কিন্তু তার চোখদুটির শ্রী এখনো ঠিক আগেকার মতনই আছে! আমি মমতা-ভরা স্বরে বলে উঠলুম, "তা, না কমলা! তোমার চেহারা বদলেছে বলে আমি তোমাকে বোনের মতনই দেখছি!"

পণ্ডিত ঠাট্টা করে বললে, "ও হো হো হো! লক্ষ্মী বোনের লক্ষ্মী ভাই! চমৎকার! ওরে কে আছিস রে, কমলার শ্রীখোলটা এখানে নিয়ে আয় তো!"

একটা বড় পিপে এসে হাজির—তার হাতে একটা ছোট পিপে।

পণ্ডিত কমলার দিকে ফিরে হুকুম দিলে, "ঢোক ওর ভেতরে!"

কমলার পিণ্ডাকৃতি দেহের ভিতর থেকে মিনতি-মাখা করুণ স্বর এল, "বাবা গো, তোমার পায়ে পড়ি! অমলদাদার সামনে আমাকে ওর ভেতরে ঢুকতে বোলো না, লজ্জায় আমি মরে যাব!"

পণ্ডিত ক্যাঁক-কেঁকে গলায় হুমকি দিয়ে বললে, "চোপরাও! তুই মলে তো আমি বাঁচি! ঢোক শ্রীখোলের ভেতরে!

মাংসপিণ্ডের মাঝখান থেকে তিনখানা হাত আর তিনখানা পা বেরিয়ে পড়ল! তারপর পিণ্ডটা উঠে পিপের ভিতরে গিয়ে ঢুকল। পিপের একদিকে একখানি মুখ—তা আমার চেনা কমলার মতন দেখতেও বটে, দেখতে নয়ও বটে! তার দুই চোখ দিয়ে টসটস করে জল ঝরছে, লজ্জায় সে আমার দিকে তাকাতে পারছে না।

পণ্ডিত বললে, "আমার এই হুকুম রইল, আজ থেকে একমাস তুই ঐ শ্রীখোল ছেড়ে বেরুতে পারবি না! যাঃ, এখন নিজের ঘরে যা!"

কমলা তার হাত-পা গুটিয়ে ফেললে, তারপর ধীরে-ধীরে গড়াতে-গড়াতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল! আমি বুঝলুম, এই নিষ্ঠুর শত্রুপুরীতে আমার একমাত্র যে বান্ধবী ছিল, আমার বিপদে-আপদে যে আমাকে প্রাণপণে সাহায্য করতে পারত, সেও আজ অসহায় ভাবে বন্দিনী হল। আজ থেকে আর কেউ আমার দিকে মুখ তুলে তাকাবে না। আমার

জীবনরক্ষার আর উপায় নেই!

পণ্ডিত আমার দিকে চেয়ে বললে, "এইবারে তোমার পালা।"

আমি গম্ভীর ভাবে বললুম, "তাহলে পালা সুরু করুন।"

—"আমি তোমার প্রাণরক্ষা করেছি, তোমাকে আশ্রয় দিয়েছি, তার খুব প্রতিদান তুমি দিলে বটে!"

আমি বললুম, "আমি কোন অন্যায় করেছি বলে মনে পড়ছে না!"

পণ্ডিত চেঁচিয়ে বললে, "অন্যায় করনি? মেয়েকে বাপের অবাধ্য করা অন্যায় নয়? তোমাদের দেশে এটা অন্যায় না হতে পারে, কিন্তু এদেশে তা মহাপাপ! যে-ছেলেমেয়েরা বাপের অবাধ্য, এদেশে তাদের প্রাণদণ্ড পর্যন্ত হয় তা তুমি জানো কি?"

আমি বললুম, "না জানিনা। জানতেও চাই না। আমি শুধু এইটুকু জানি যে, কমলাকে আমি কোনদিন আপনার অবাধ্য হতে বলি নি।"

—"বল নি? হেঃ, এই কথা আমি বিশ্বাস করব? আমি কি সেকেলে মানুষের মতন বোকা ভ্যাড়াকান্ত? আমার বুদ্ধিসুদ্ধি কি মগজ থেকে কর্পূরের মতন উপে গেছে? তুমি তাকে কুশিক্ষা না দিলে সে কি কখনো আমার বিরুদ্ধে নালিশ করবার কথা মনেও আনতে পারে? আর আমি কিনা তোমারই প্রাণরক্ষা করেছি।"

আমার অসহ্য হয়ে উঠল। বললুম, "বার বার আমার প্রাণরক্ষা করেছেন বলে জাঁক করছেন কেন? আপনি কেন যে আমার প্রাণরক্ষা করে আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন আমি কি তা জানিনা? আপনি আমার প্রাণরক্ষা করেছেন আমার প্রাণবধ করবার জন্যে!"

পণ্ডিত খাপ্পা হয়ে বললেন, "তোমার সঙ্গে আর আমি বাজে কথা কয়ে সময় নষ্ট করতে চাই না। যাও, নিজের ঘরে গিয়ে বন্দী হয় থাকো গে! আর দয়া নয়!"

চতুর্দশ

ভোম্বলদাসের আসল চেহারা

ঘরে ভিতরে একলা বসে যেন অকূল পাথারে ভাসছি।

বাঁচবার কোন আশাই নেই। এক আশা ছিল কমলা, কিন্তু সেও এখন আমারই মতন বন্দী। পণ্ডিতের ষড়যন্ত্রের কথা সে আর কারুর কাছে গিয়ে প্রকাশ করে দিতে পারবে না।

এই উদ্ভট, ভুতুড়ে দেশের আইন-কানুন সবই আজব! এখানকার দয়া-মায়া-ভালোবাসা সবই ভিন্নরকম। পৃথিবীর সভ্যদেশে মাঝে-মাঝে ভূত-পেত্নীর কথা শুনতে পাই, নানানরকম মূর্তি ধারণ করে মানুষদের যারা ভয় দেখায়। সে-সব এদেরই কীর্তি নয়ত? তারা রাত-আঁধারে দেখা দিয়ে দিনের আলোয় কোথায় লুকোয়, তারা কোথা থেকে আসে কেউ তা জানে না,—কিন্তু আমার বিশ্বাস, তারা এই দেশেরই লোক! মানুষ যে পরলোকের কথা জানে, সেই পরলোক হয়ত এই এই-পিপে-মুল্লুকই! আমি চোখের সামনেই ভোম্বলকে আমার মূর্তি ধরতে দেখেছি! এরাই হয়ত মানুষের দেশে গিয়ে রাত্রিবেলায় আমাদের মৃত আত্মীয়-স্বজনের মতন চেহারা নিয়ে দেখা দেয়, আর আমরা ভূত দেখেছি বলে ভয়ে আঁৎকে উঠি! এরা নিজেদের বলে 'নতুন মানুষ'! ছাই! পিপের ভিতরে কখনো মনুষ্যত্ব থাকে না!

হঠাৎ মৃদুস্বরে কে আমায় ডাকলে, "অমলা, ও অমলা!"

মুখ তুলে দেখি, জানলার বাইরে ভোম্বলের মোটা, আঁচিল-ভরা, বারকোসের মতন মস্ত মুখখানা!

আমি রাগ করে বললুম, "আবার তুমি আমাকে ঐ নামে ডাকছ? আমি মরতে বসেছি বলে তোমার বুঝি খুব আহ্লাদ হয়েছে?"

ভোম্বল বললে, "না ভাই, চটো কেন? তুমি তো জানোই আমরা মেয়ে-পুরুষ সবাই ডিম পাড়ি—কাজেই আমাদের কাছে অমলও যে অমলাও সে! একটা আকারের তফাৎ বৈ তো নয়! যাক সে কথা, তুমি জানলার কাছে এস। চেঁচিয়ে কথা কইলে কেউ শুনতে পাবে। যা বলতে এসেছি, চুপিচুপি বলে যাই!"

জানি, এ-অপদার্থটার দ্বারা আমার কোনই উপকার হবে না, তবু সে কি বলে শোনবার জন্যে আমি উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

ভোম্বল চুপিচুপি বললে, "তোমার জন্যে আমি কম চেষ্টা করি নি, এখানকার যে-সব মোড়ল পণ্ডিত-জুজুবুড়োকে ছুচক্ষে দেখতে পারে না, তাদের অনেককেই গিয়ে ধরেছি। কিন্তু বিশেষ ফল হল না। তুমি একেবারে অচেনা লোক, তোমার নাম পর্যন্ত কেউ জানে না! তারা বলে, কোথাকার কোন একটা বাজে জীবের জন্যে পণ্ডিতের সঙ্গে আমরা ঝগড়া করে মরতে যাব কেন? পণ্ডিতের এখানে খুব পসার কিনা? সবাই বলে, পণ্ডিত হচ্ছে দেশভক্ত লোক,—সে যা করবে দেশের ভালোর জন্যেই করেবে!"

আমি বললুম, "এ খবরটা জানাবার জন্যে তোমার কষ্ট করে এখানে না এলেও চলত!"

ভোম্বল দন্তবিকাশ করে বললে, "তা চলত বটে! তবু না এসে থাকতে পারলুম না, হাজার হোক তুমি আমার বন্ধু তো! তা দেখ অমলা, তোমার জন্যে একটা কাজ আমি করেছি বোধ হয়! মহারাজ একটা কথায় রাজি হয়েছেন। কেন যে ছুরি মেরে তোমার ভুঁড়ি ফাঁসানো হবে না, এর বিরুদ্ধে যদি তোমার কোন যুক্তি থাকে, মহারাজা তা শুনতে আপত্তি করবেন না। যুক্তি দেখিয়ে তুমি যদি তাঁকে বোঝাতে পারো তাহলে তোমার ভুঁড়ি এ-যাত্রা বেঁচে গেলেও যেতে পারে! কাজে-কাজেই এক বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। তোমাকে আগে মহারাজার কাছে হাজির না করে তাঁর হুকুম না নিয়ে কেউ তোমার এই নাদুস-নদুস দেহটিকে খণ্ড খণ্ড করতে পারবে না!"

আমি কৃতজ্ঞ স্বরে বললুম, "ভাই ভোম্বল, এ খবরটা তবু মন্দের ভালো! তোমার এ উপকারের জন্যে ধন্যবাদ!

ভোম্বল বললে, "ও বাজে ধন্যবাদ আমি চাই না। আগে বাঁচো, তারপর ধন্যবাদ দিও। আমার এখন ক্ষিধে পেয়েছে, আমি হোটেলে চললুম!" জানালার ধার থেকে তার মুখ সরে গেল।

আমি ভাবতে লাগলুম, ভোম্বলকে আগে যতটা মনে হয়েছিল, এখন দেখছি সে ততটা মন্দ লোক নয়। ওর বাইরের চেহারা, হাব-ভাব আর কথাবার্তা কিঞ্চিৎ অভদ্র ও এলোমেলো হলেও ওর পিপের ভিতরে প্রাণ আর দয়া-মায়া আছে। ভোম্বল দেখছি একটি বর্ণচোরা আম!

হঠাৎ জানালার ধারে আবার ভোম্বলদাসের উদয় হল। বাইরের এদিকে-ওদিকে একবার চেয়ে সে বললে, "হ্যাঁ ভালো কথা! ক্ষিধের চোটে একটা বিষয় ভুলে গিয়েছিলুম। এই ছোট নলচেটা নিয়ে ভালো করে লুকিয়ে রাখো। ওর পেছনে যে কল আছে সেটিকে টিপলেই ঐ নলচেটি তোমাকে সাহায্য করবে।" আর-একবার দন্তবিকাশ করে হেসেই ভোম্বল আবার অদৃশ্য হল।

নলচেটি পরখ করে দেখলুম। সেদিন মন্ত্রণা-সভায় এই রকমেরই একটি নলচের বিষম মহিমা দেখেছিলুম। তবে এটি তার চেয়ে ঢের ছোট, অনায়াসে পকেটে লুকিয়ে রাখা যায়। এই নলচেই বোধহয় পিপেদের বন্দুক!

এমন সময়ে দরজা খোলার শব্দ পেলুম। নলচেটাকে ভিতরকার জামার পকেটে লুকিয়ে রাখার সঙ্গে-সঙ্গেই ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল অমরচন্দ্র, পণ্ডিত ও আরো চারজন পিপে!

পণ্ডিত বললে, "অমল, তোমাকে আমাদের সঙ্গে আসতে হবে।"

বুঝলুম, এরা আজকেই আমাকে মহারাজার কাছে হাজির করতে চায়। বিনা-বাক্যব্যয়ে আমি তাদের সঙ্গে চললুম! আগে আগে পণ্ডিত আর অমরচন্দ্র, আমার দু-পাশে দুজন ও পিছনে দুজন পিপে! দস্তুরমত কড়া পাহারা!

আমার মহা বীরত্ব

সবাই মিলে যে-ঘরে গিয়ে দাঁড়ালুম, সেটা হচ্ছে সেই ঘর—যেখানে এ-দেশে এসে আমার প্রথম জ্ঞানোদয় হয়!

আজ দেখছি সে ঘরের রূপ বদলে গেছে। মাঝখানে একটা লম্বা টেবিল, তার উপরে অনেক অস্ত্রশস্ত্র, চারিধারে তাকে তাকে হরেক-রকম ওষুধ ও আরক প্রভৃতির শিশি, বোতল ও কাঁচের পাত্র।

অমরচন্দ্র কি-একরকম সন্দেহপূর্ণ অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার আপাদ-মস্তক দেখে নিয়ে বললে, "ভালো করে এর চেহারা দেখে আজ মনে হচ্ছে, এর দেহ দিয়ে বোধ হয় আমাদের কার্যসিদ্ধি হবে না!"

পণ্ডিত বললে, "হোক আর নাই-ই হোক, পরীক্ষা আমি করবই!"

আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনারা আমাকে এখানে নিয়ে এলেন কেন?"

পণ্ডিত বললে, "তোমাকে নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করব বলে!"

আমি উদ্বিগ্ন স্বরে বললুম, "কি-রকম? মহারাজার হুকুম কি আপনি জানেন না? আগে আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে হবে!"

পণ্ডিত বিপুল বিস্ময়ে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "এ কথা কে তোমাকে বলেছে?"

"যেইই বলুক, আপনি আগে আমাকে মহারাজার কাছে নিয়ে চলুন।"

অমরচন্দ্র দাঁত ছরকুটে বললে, "তা আর জানি না! সেখানে আমাদের শত্রুপক্ষ আছে, তুমি আমাদের হাত ফস্কে কলা দেখিয়ে পালাও আর কি?"

আমি বললুম, "সে কি, আপনারা মহারাজার হুকুম মানবেন না?"

পণ্ডিত ঘন ঘন ঘাড় নেড়ে বললে, "না, না, না! বিজ্ঞানের মর্যাদা রাখবার জন্যে আমরা মহারাজার হুকুম মানব না!" তারপর পিপেদের দিকে ফিরে বললেন, "তোরা ওকে ধর। ওর হাত-পা বেঁধে টেবিলের উপর শুইয়ে দে।"

এবারে রাগে অজ্ঞান হয়ে একলাফে পণ্ডিতের উপরে লাফিয়ে পড়ে মারলুম আমি তাকে এক লাথি—সে বিকট আর্তনাদ করে মাটির উপরে গড়িয়ে গেল! কিন্তু ততক্ষণে চারজন প্রহরী-পিপে আমাকে সবেগে আক্রমণ করেছে।

টেবিলের উপরে বোধকরি আমারই দেহ কাটবার অস্ত্রগুলো ছড়ানো ছিল, আমি বিদ্যুতের মতন হাত বাড়িয়ে একখানা মস্ত ধারালো ছুরি তুলে নিয়ে দিগ্বিদিকজ্ঞানহারা হয়ে ডাইনে-বাঁয়ে সামনে-পিছনে চালাতে লাগলুম। বেটাদের গায়ে তো হাড় ছিল না,—আমার ছুরি তাদের হাতে-পায়ে যেখানে পড়ে সেইখানটাই কচুর মতন কঁ্যাচ করে কেটে উড়ে যায়! তারা হাউমাউ করে কেঁদে উঠে সেখান থেকে টেনে লম্বা দিলে। ঘরের মেঝেতে পড়ে তাদের কাটা হাত-পাগুলো টিকটিকির কাটা ল্যাজের মতন ধড়ফড় করতে লাগল।

তারপর আমি অমরচন্দ্রের দিকে ফিরে দাঁড়ালুম, কিন্তু চোখের পলক না ফেলতেই সে তার পিপের ভিতর থেকে টপাং করে মাটির উপরে লাফিয়ে পড়ল এবং একটা বড় সাপের মতন কিলবিল করতে করতে দরজার ভিতর দিয়ে বেগে অদৃশ্য হল!

তারপর আমি পণ্ডিতের দিকে ফিরে দাঁড়ালুম—সে তখন ভীষণ চিৎকার করে চাকরদের ডাকাডাকি করছে!

আমি গর্জন করে বললুম, "তবে রে জুজুবুড়ো! এবারে তোকে কে রক্ষা করে? আয়, আজ আমি তোরই অস্ত্র-চিকিৎসা করি"—বলেই ছুরি উঁচিয়ে আমি তাকে আক্রমণ করলুম।

দারুণ আতঙ্কে পণ্ডিতের মুখ তখন মড়ার মতন সাদা হয়ে গেছে, চোখদুটো কপালে উঠেছে। হঠাৎ তার পিপের নিচে থেকে অনেকগুলো

ঠ্যাং বেরিয়ে পড়ল এবং সেই বড় টেবিলটার চারিপাশ ঘিরে ঠিক একটা প্রকাণ্ড মাকড়সার মতন এত বেগে ছুটতে আরম্ভ করলে যে, আমি কিছুতেই তার নাগাল ধরতে পারলুম না!

মাত্র দুই পায়ে ভর দিয়ে অতগুলো পায়ের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সম্ভব না হলেও আমি পণ্ডিতের পিছু ছাড়লুম না—সেও ছোটে, আমিও ছুটি! এই ব্যাপার আরও কতক্ষণ চলত এবং কি-ভাবে শেষ হত তা আমি জানি না, কিন্তু আচম্বিতে বাহির থেকে দলে দলে নানা-আকারের পিপে এসে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল—তাদের সর্বাগ্রে রয়েছে ভোম্বলদাস!

কে একজন হোমরা-চোমরার মতন ভারিক্কে গলায় বলে উঠল, "এ-সব কাণ্ডের অর্থ কি?"

পণ্ডিত পরিত্রাহি চিৎকার করে বললে, "মহারাজ, রক্ষা করুন! মহারাজ, রক্ষা করুন!"

মহারাজ? ফিরে দেখি ভোম্বলদাসের চেয়েও ঢের মোটা আর ডাগর একটা পিপে—যে-রকম পিপেতে আমাদের দেশে সিমেণ্ট রাখা হয় তার চেয়েও বড়! তার গালদুটো লাউয়ের মতন ফোলা ফোলা এবং তার গোঁফজোড়া এত লম্বা যে ঠোঁটের দু-পাশ দিয়ে ঝুলে পড়েছে। এই হল এদের মহারাজের মূর্তি?

মহারাজার মস্তবড় ঢাকের মতন মুখের ভিতর থেকে ট্যাঁপারির মতন দুটো ছোট্ট চোখ কোটরের ভিতর থেকে প্রায় একহাত বাইরে বেরিয়ে এসে আমাকে দুই মিনিট ধরে ঘুরে-ফিরে নিরীক্ষণ করলে। তারপর চোখদুটোকে আবার যথাস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে এসে মহারাজা আমাকে সম্বোধন করে জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, "তুমি পাগল নও তো? তোমাকে দর্শন করে আমার কিন্তু তাই বিবেচনা হচ্ছে।"

আমি এত দুঃখেও হেসে ফেলে বললুম, "আজ্ঞে না মহারাজ! আমি এখনো পাগল হতে পারি নি! তবে শীঘ্রই হতে পারব বলে আশা রাখি।"

মহারাজা দুলতে দুলতে বললেন, "শুনে সুখী হলুম। যাদের পাগল হবার আশা নেই, তারা অতিশয় অভাগা।...উঃ, বড্ড হাঁপিয়ে পড়েছি, ভারি জল-তেষ্টা!...ভৃত্য! সুশীতল বারি আনয়ন কর!"

ভৃত্য জল এনে দিলে। মহারাজা ঢকঢক করে জল পান করে ঊর্ধ্বমুখে বললেন, "আঃ!...এইবারে রাজকার্য! ওহে ভোম্বলদাস, তুমি এই বিদেশী লোকটির কথাই না আমার কাছে উত্থাপন করেছিলে? হুঁ। ওর নাম কি?"

ভোম্বল আমার দিকে চেয়ে দন্তবিকাশ করে বললে, "অমলা।"

আমি বললুম, "আজ্ঞে না মহারাজ! আমার নাম অমলা নয়, অমল।"

মহারাজা আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললেন, "চুপ কর! তোমার অপেক্ষা ভোম্বলদাসকে আমি বেশি চিনি। তোমার কি নাম হওয়া উচিত, তোমার চেয়ে ভোম্বলদাস তা বেশি জানে! তোমাকে দেখেই মনে হচ্ছে, তোমার নাম অমলা।......উঃ ভয়ঙ্কর গ্রীষ্ম, ঘর্মে প্লাবিত হয়ে গেলুম যে!......ভৃত্য! শীঘ্র ব্যজনী আনয়ন কর!"

দু-দিকে দুটো পিপে এসে তালপাতার পাখা নেড়ে মহারাজের মাথা ও গতর ঠাণ্ডা করতে লাগল।

খানিকক্ষণ বায়ুসেবন করে একটু ধাতস্থ হয়ে মহারাজা আবার দুলতে দুলতে বললেন, "হ্যাঁ, ভালো কথা! আচ্ছা অমলা, তুমি এতক্ষণ কি করছিলে? পণ্ডিতের সামনে দাঁড়িয়ে কি যুদ্ধের নৃত্য দেখাচ্ছিলে? ও নৃত্যটি আমার অত্যন্ত উত্তম লেগেছে। আর একবার ঐ নৃত্যটি আরম্ভ হোক!"

আমি হাতজোড় করে বললুম, "আজ্ঞে না মহারাজ! কি-করে অস্ত্র-চিকিৎসা করতে হয়, পণ্ডিতকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছিলুম!"

মহারাজা গর্জন করে বললেন, "কী! তুমি কি অবগত নও যে, এ-রাজ্যে অস্ত্র-চিকিৎসা নিষিদ্ধ? আমরা কবিরাজী ঔষধ ছাড়া আর কিছু সেবন করি না?......তার চেয়ে পণ্ডিতকে তুমি বিষ-বড়ি ভক্ষণ করতে

দিলে না কেন ?"

আমি আবার হাত জোড় করে বললুম, "আজ্ঞে, বিষ-বড়ির কথা আমার মনে ছিল না। তাহলে সেই ব্যবস্থাই করতুম।"

পণ্ডিত কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মহারাজা দু-চোখ রাঙিয়ে এক ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, "স্তব্ধ, হও! বৃদ্ধ, তুমি কি অবগত নও, আমি সম্বোধন না করলে আমার নিকটে কেউ বাক্য উচ্চারণ করতে পারবে না?…উঃ, ভীষণ কান চুলকোচ্ছে, গেলুম যে!…ভৃত্য! কান-খুশকি আনয়ন কর।"

কান-খুশকি এল। মহারাজা দু-চোখ বুঁজে খুব আরাম করে পাঁচ মিনিট কান চুলকোলেন। তারপর সহসা দুই চোখ চেয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "অতঃপর ?"

আমি বললুম, "মহারাজ, আপনি বোধহয় জানেন না যে, এই পণ্ডিত আজ ছুরি দিয়ে লম্বালম্বি ভাবে আমার দেহকে ফালা-ফালা করবার চেষ্টা করছিল!"

মহারাজা ভয়ানক চটে উঠে বললেন, "কী! তোমাকে আমার কাছে হাজির না করেই ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ! পণ্ডিত বলে সে বিজ্ঞানের মর্যাদা রাখবে, আপনার মর্যাদা রাখবে না।"

মহারাজা দুই চক্ষু ছানাবড়া করে বললেন, "অ্যাঁ! অ্যাঁ! এত-বৃহৎ কথা! আমার মর্যাদা রাখবে না?…উঃ, মস্তক বেজায় ঘূর্ণায়মান হচ্ছে—বোঁ বোঁ বোঁ!…ভৃত্য! অবিলম্বে আমার শিরোঘূর্ণন বন্ধ কর!"

পিপের একমুখে মহারাজার গোল মাথাটা চরকির মতন এমন বন বন করে ঘুরছিল যে তাঁর চোক-নাক-ঠোঁট কিছুই দেখা যাচ্ছিল না! ভৃত্য তাড়াতাড়ি ছুটে এসে মাথাটা প্রাণপণে চেপে ধরে তার ঘুরুনি বন্ধ করে দিলে।—

খানিকক্ষণ হাঁপাতে হাঁপাতে দম নিয়ে মহারাজা বললেন, "দুরাচার পণ্ডিত! আমার হুকুম না নিয়েই আবার তুমি লম্বালম্বি ভাবে মানুষের

দেহ কর্তন করতে চাও ?···ভোম্বলদাস ! সেবারের সেই কাণ্ড-কারখানার কথা তোমার মনে আছে ?"

ভোম্বল চোখ পাকিয়ে বললে, "ওঃ ! মনে নেই আবার ? পণ্ডিত সেই তুর্কী-চাচার দেহখানা এমন লম্বালম্বি ভাবে কেটেছিল যে, তাকে দেখতে হয়েছিল ঠিক পণ্ডিতেরই মতন !"

পণ্ডিত প্রবল প্রতিবাদ জানিয়ে মাথা নেড়ে বললে, "না, তাকে আমার মতন দেখতে হয় নি। আমি এ কথার আপত্তি করি।"

মহারাজা বললেন, "আবার তুমি গায়ে পড়ে বাক্য উচ্চারণ করছ ? তুমি আপত্তি করতে পারবে না। কখন তোমার আপত্তি করা কর্তব্য, সে কথা আমি নিজেই বলে দেব।"

পণ্ডিত বললে, "কোন কথায় আমি আপত্তি করব, সে-কথা আপনি জানবেন কেমন করে মহারাজ ?"

মহারাজা মহাবিস্ময়ে মুখব্যাদান করে বললেন, "ওহে ভোম্বল, পণ্ডিতটা বলে কি হে ? কোন কথায় ওর আপত্তি করা উচিত, তাইই যদি না বলতে পারব, তবে আমি কিসের মহারাজ ?"

ভোম্বল বললে, সত্যিই তো ! তবে আপনি কিসের মহারাজা ?"

পণ্ডিত বললে, "মহারাজা ! আমি বিচার প্রার্থনা করি।"

মহারাজা বললেন, "বিচার ? তুমি বিচার প্রার্থনা কর ? ওহে ভোম্বল, পণ্ডিতটা যে বিচার প্রার্থনা করে ! বেশ, আমি বিচার করব। ভোম্বল-দাস, তুমি মন্ত্রীদের আসতে হুকুম দাও। আজ এখানেই আমার বিচার-সভা বসবে। ভৃত্য ! আমার রাজদণ্ড আনয়ন কর।

ষোড়শ

মহারাজের বিচার

রাজদণ্ড হাতে নিয়ে আরো বেশি গম্ভীর হয়ে মহারাজা বললেন, "পণ্ডিত! এই সেকেলে মানুষটার দেহ কেন তুমি লম্বালম্বি ভাবে কর্তন করতে চাও, সে কথা আমার নিকটে যথাবিহিতসম্মানসহকারে নিবেদন কর।"

পণ্ডিত বললে, "আজ্ঞে, আমাদের চেয়েও একেলে মানুষ সৃষ্টি করব বলে।"

মহারাজ ভুরু কুচকে বললেন, "আমাদের চেয়েও আধুনিক? তবে কি তুমি বলতে চাও যে, আমরা ক্রমেই প্রাচীন হয়ে পড়ছি?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ! আমার তাই বিশ্বাস। মনে করে দেখুন মহারাজ, আমাদের চেয়েও একেলে মানুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম মানুষ হত ঐ অমল! এ একটা কত-বড় সম্মান! আমি ওকে হত্যা করতুম না, খুব আস্তে আস্তে একটু একটু করে ওর দেহটাকে জ্যান্ত অবস্থাতেই লম্বালম্বি ভাবে কাটতুম। এ কাজে কুড়ি দিনের বেশি সময় লাগত না। ভেবে দেখুন মহারাজ আমার উদ্দেশ্য কত সাধু!"

মহারাজা মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "হ্যাঁ, তোমার উদ্দেশ্য যে সাধু, সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। অমলা, তুমি পণ্ডিতের সাধু উদ্দেশ্যে বাধা প্রদান করতে গিয়েছিলে কেন?"

আমি বললুম, "না মহারাজ, পণ্ডিতকে আমি বাধা দিই নি—আমি কেবল আত্মরক্ষা করেছিলুম। ওঁর মনকে খুশি রাখবার জন্যে বিশ দিন ধরে জ্যান্ত অবস্থায় একটু একটু করে কচুকাটা হব, অথচ টুঁ শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করব না, এই কি আপনার আদেশ মহারাজ?"

মহারাজা বললেন, "না, এমন অন্যায় আদেশ কদাপি আমি প্রচার করি না।"

আমি বললুম, "তারপর আর-একটা কথা মহারাজ বিচার করে দেখুন। আপনাকে আগে জানিয়ে পণ্ডিত যদি আমার ওপরে ছুরি চালাত, তাহলে কখনোই আমি আত্মরক্ষার চেষ্টা করতুম না, কিন্তু পণ্ডিত আপনার একটা হুকুম পর্যন্ত নেয় নি। এটা কি অপরাধ নয়?"

মহারাজা বললেন, "অপরাধ নয় আবার? মহাগুরুতর অপরাধ!... ভৃত্য! আমার আইন-পুস্তকের পঞ্চম খণ্ড আনয়ন কর!...দেখি, এটা কত ধারার অপরাধ!"

আইনের বই এল। মহারাজ পাতা উল্টে বললেন, "এই যে! এটা সাতশো সাতাশ ধারার অপরাধ! এর শাস্তি—প্রাণদণ্ড। পণ্ডিত! তোমার প্রাণদণ্ড হবে!"

পণ্ডিত ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বললে, "মহারাজ, রক্ষা করুন! প্রাণদণ্ড দিলে আমি আর কিছুতেই বাঁচব না! এখনো আপনি সব কথা শোনেন নি! ঐ সেকেলে মানুষটা আমার মেয়েকে আমার অবাধ্য করে তুলেছে,—"

মহারাজা শিউরে উঠে বললেন, "অ্যাঁ, বল কি? মেয়েকে পিতার অবাধ্য করে তোলা! এযে সাতশো সাতাশ ধারার চেয়েও গুরুতর অপরাধ! অমলা! তোমার কি কিছু বক্তব্য আছে?"

আমি মনে মনে প্রমাদ গুণে বললুম, "আছে মহারাজ! আগে আপনি গোড়া থেকে সব কথা শুনুন। কাল যখন আমি বসে বসে বাজনা বাজাচ্ছিলুম—"

মহারাজা বললেন, "বটে, বটে, বটে! তুমি বাজনা বাজাতে পারো?"

—"পারি মহারাজ!"

—"তুমি গান গাইতে পারো?"

—"পারি মহারাজ!"

—"বটে, বটে, বটে! একটা গান আমাকে শোনাও না!"

আমি হুই হাত জোড় করে বললুম, "কিন্তু মহারাজ, আমি হচ্ছি ওস্তাদ লোক। তবলা-বাঁয়ার সঙ্গত না থাকলে কেমন করে গান গাইব?"

মহারাজা ব্যস্তসমস্ত হয়ে আদেশ দিলেন—"ভৃত্য? তবলা-বাঁয়া আনয়ন কর!"

ভোম্বলদাস তাড়াতাড়ি মহারাজের কানে-কানে কি বললে। মহারাজা সব শুনে আমার দিকে ফিরে বললেন, "অমলা! এটা হচ্ছে অস্ত্রোপচারের গৃহ—এখানে তবলা-বাঁয়া থাকে না। এখন উপায়?"

আমি বললুম, "উপায় আছে মহারাজ! পণ্ডিত-মশাইয়ের গাল-হুখানা দিব্যি চ্যাটালো। ওঁকে আমার কাছে আসতে হুকুম দিন। তবলা-বাঁয়ার অভাবে আমি ওঁর হুটো গাল হু-হাতে বাজিয়ে তাল রেখে গান গাইতে পারব!"

পণ্ডিত বললে, "মহারাজ, আমি এ প্রস্তাব সমর্থন করি না।"

মহারাজা প্রকাণ্ড এক ধমক দিয়ে বললেন, "পুনরায় তুমি বাচালতা প্রকাশ করছ? অমলার ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব তোমাকে সমর্থন করতেই হবে! যাও অমলার কাছে!"

পণ্ডিত নিরুপায় হয়ে ভয়ে ভয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। কিন্তু যেই আমি হাত তুলে তার গালে চপেটাঘাত করতে যাব, অমনি সে মুখ সরিয়ে নিলে! আর-একবার চেষ্টা করেও বিফল হয়ে আমি বললুম, "মহারাজ, পণ্ডিত-মশাই তাঁর গাল বাজাতে দিচ্ছেন না!"

মহারাজা বললেন, "বটে, বটে, বটে! প্রহরীগণ! হুষ্ট পণ্ডিতকে তোমরা ধৃত কর!"

প্রহরীরা তখন এসে পণ্ডিতকে আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে ধরলে এবং আমিও হুই হাতে মনের সাধে তালে তালে তার হুই গালে চড় মারতে মারতে গান ধরলুম—

"জুজুবুড়ির দেশে এসে
দেখেছি এক জুজুবুড়ো,

মামদো-ভূতের সমন্দী সে,
হামদো-মুখোর বাবা-খুড়ো—
দেখেছি এক জুজুবুড়ো।
চোখদুটো গোল পানের ডিপে,
পেটের ওপর একটা পিপে,
বাক্যিগুলি মিষ্টি কত!
ঠিক যেন ভাই লঙ্কাগুঁড়ো—
দেখেছি এক জুজুবুড়ো।

*

কর্‌লে আদর ধম্‌কে ওঠেন,
ধর্‌লে গীতি চম্‌কে ছোটেন,
থম্‌কে হঠাৎ পট্‌কে লোঠেন—
মেজাজটি তাঁর উড়ো-উড়ো—
দেখেছি এক জুজুবুড়ো।

*

তিনি যদি আসেন কাছে,
দৌড়ে চোড়ো স্যাওড়া-গাছে,
ওপর থেকে থুতু দিও,
কিংবা ছেঁড়া জুতো ছুঁড়ো—
দেখেছি এক জুজুবুড়ো।”

মহারাজা ঘাড় নেড়ে তারিফ করে বললেন, “আ-হা-হা-হা! সাধু, সাধু। খাসা গলা! না ভোম্বল?”

ভোম্বল বললে, “খাসা!”

পণ্ডিত তার দুই গালে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, “মহারাজ, এ গানে আমি আপত্তি করি।”

মহারাজা বললেন, “না, তুমি আপত্তি করবে না। তুমি কোথায় আপত্তি করবে, আমি বলে দেব।”

পণ্ডিত বললে, "মহারাজ, ও গান আমাকে লক্ষ্য করে লেখা হয়েছে।"

মহারাজা বললেন, "তুমি কি নিজেকে জুজুবুড়ো বলে মানো?"

পণ্ডিত বললে, "না, আমি মানি না।"

মহারাজা বললেন, "তাহলে ও-গানে তুমি আপত্তি করতে পারোনা! ওটা জুজুবুড়োর গান। না অমলা?"

আমি বললুম, "আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ!"

ভোম্বল বললে, "মহারাজ, রাজকার্যে বেলা বাড়ছে। আমার ক্ষিধে পেয়েছে।"

মহারাজা বললেন, "ভোম্বলের ক্ষিধে পেয়েছে। আমি আর দেরি করতে পারি না। অমলা! পণ্ডিত! তাহলে আমার আজ্ঞা শোনো! তোমরা দুজনেই গুরুতর অপরাধ করেছ। তোমাদের দুজনেরই প্রাণদণ্ড হবে। মন্ত্রিগণ! এখন কার প্রাণদণ্ড আগে হবে, সেটা তোমরাই স্থির কর। কিন্তু বেশি দেরি কোরো না। ভোম্বলের ক্ষিধে পেয়েছে।"

মন্ত্রিগণ বেশি দেরি করলেন না। বললেন, "অমলার অপরাধ গুরুতর। আগে ওরই প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত।"

মহারাজা বললেন, "এইজন্যেই তো মন্ত্রিগণের দরকার! কত তাড়াতাড়ি কাজ হয়ে গেল! অমলা! মন্ত্রিগণের কথা স্বকর্ণে শ্রবণ করলে তো? অগ্রে তোমারই প্রাণদণ্ড হবে। পণ্ডিত! তুমি অমলাকে ঐ টেবিলটার ওপরে শুইয়ে ওর দেহ লম্বালম্বি ভাবে কর্তন কর।"

আমি চক্ষে সর্ষের ফুল দেখতে লাগলাম। যেমন হবুচন্দ্র রাজা, তেমনি গবুচন্দ্র মন্ত্রী! এখন উপায়? অত্যন্ত অসহায় ভাবে ভোম্বলের দিকে তাকালুম।

ভোম্বল দন্তবিকাশ করে কি যেন ইসারা করতে লাগল।

তার ইসারায় একটা কথা আমার মনে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি ভিতরকার জামার পকেটে হাত দিয়ে দেখি সেখানে নলচেটা এখনো আছে!

মহারাজ বললেন, "অমলা! তোমার বোধহয় আর কিছু বলবার নেই ?"

আমি বললুম, "মহারাজ! আমার আর দুটো কথা বলবার আছে।"

মহারাজা বললেন, "তাড়াতাড়ি বল। ভোম্বলের ক্ষিদে পেয়েছে ?"

আমি বললুম, "মহারাজ! আমার প্রথম কথা হচ্ছে, আপনি আমাকে অমলা বলে ডাকতে পারবেন না। আমার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আমার প্রাণদণ্ডের হুকুম আপনাকে নাকচ করতে হবে।"

মহারাজা বললেন, "আমি যদি তোমার ও-দুটো কথা না শুনি ?"

পকেট থেকে নলচে বার করে মহারাজার মাথার কাছে ধরে আমি বললুম, "তাহলে এখনি আমি নলচে ছুঁড়ব।"

মহারাজা ব্যস্ত হয়ে হাঁক দিলেন, "প্রহরী! প্রহরী!"

আমি বললুম, "প্রহরীরা এদিকে আসবার আগেই এ রাজ্যের সিংহাসন খালি হবে।"

মহারাজা বললেন, "প্রহরীগণ! তোমরা শীঘ্র বিদায় হও, এদিকে এস না—খবরদার!"

ভোম্বল বললে, "মহারাজ! আমার ক্ষিদে পেয়েছে!"

মহারাজা বললেন, "আচ্ছা, তোমাকে আর অমলা বলে ডাকব না। তোমার প্রাণদণ্ডও হবে না।"

নলচে নামিয়ে আমি বললুম, মহারাজের জয় হোক!

মহারাজা বললেন, "কিন্তু প্রাণদণ্ডের বদলে তোমাকে নির্বাসন-দণ্ড দিলুম। তুমি এ রাজ্যে থাকবার উপযুক্ত নও। ভোম্বলের ক্ষিদে পেয়েছে। অতএব সভা ভঙ্গ হোক।"

আমার নির্বাসন

দলে দলে পিপে-প্রহরী চারিদিক থেকে আমাকে ঘিরে ফেললে এবং আমার হাত থেকে নলচেটা কেড়ে নিলে।

তারপর রাজপথ দিয়ে আমাকে নিয়ে চলল।

যেদিকে তাকাই সেইদিকেই দেখি, পিল পিল করে পিপের দল ছুটে আসছে। পুরুষ-পিপে, মেয়ে-পিপে, খোকা-পিপে, খুকি-পিপে! এ দেশে এত পিপে-মানুষ আছে, আমি তা কল্পনাও করতে পারি নি!

প্রত্যেক পিপেই আমার উপরে মারমুখো হয়ে আছে! তাদের মহারাজের বিরুদ্ধে আমি যে নলচে ধরে দাঁড়িয়েছি, এ-কথা বোধহয় দিকে দিকে রটে গেছে! পদে পদে আমার ভয় হতে লাগল—এই বুঝি তারা আমাকে আক্রমণ করতে আসে! কিন্তু তারা আক্রমণ করলে না, সকলে মিলে কেবল আমাকে ভয়ানক বিশ্রী মুখ ভ্যাংচাতে লাগল।

মহারাজার চাকা-গাড়ি আমার পাশ দিয়ে চলে গেল। মহারাজ আমার দিকে ফিরেও তাকালেন না, কিন্তু তাঁর পাশে বসে ভোম্বলদাসও আমাকে যাচ্ছেতাই মুখ ভ্যাংচাতে ভ্যাংচাতে গেল।

আমি চিৎকার করে ডাকলুন—"মহারাজা! মহারাজা!

মহারাজার চাকা-গাড়ি থামল। গাড়ির উপরে ফিরে বসে মহারাজা বললেন, "আমাকে পিছু ডাকলে কেন? কি ব্যাপার?

আমি বললুম, "একটা নালিস আছে।"

—"আবার কিসের নালিস?"

—"ভোম্বল আমাকে মুখ ভ্যাংচাচ্ছে।"

মহারাজা আমার দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে বললেন, "তোমার কাছে সেই নলচেটা নেই তো?"

আমি বললুম, "না মহারাজ, প্রহরীরা সেটা কেড়ে নিয়েছে।"

মহারাজা বললেন, "তাহলে ভোম্বল অনায়াসেই তোমাকে মুখ

ভ্যাংচাতে পারে। ক্ষিধে পেলে ভোম্বল আমাকেও মুখ ভ্যাংচায়। না ভোম্বল ?"

ভোম্বলদাস আবার আমাকে মুখ ভ্যাংচাতে ভ্যাংচাতে বলে "আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ! কিন্তু ঐ যাঃ! একটা ভারি ভুল হয়ে গেল তো"

মহারাজা ভয়ানক চমকে উঠে বললেন, "অ্যাঃ বল কি ভুল হয়ে গেছে ? কি ভুল ?"

ভোম্বল বললে, "মহারাজ, পণ্ডিতের প্রাণদণ্ডটা তো হল না।"

মহারাজা একগাল হেসে বললেন, "ওঃ, এই ভুল ? তার জন্যে আর ভাবনা কি ? পণ্ডিতও তো আর নির্বাসনে যাচ্ছে না, আগে তোমার ক্ষিধে ঠাণ্ডা হোক, তারপর তাকে ধরে এনে প্রাণদণ্ড দিলেই হবে।··· গাড়োয়ানগণ! গাড়ি চালাও!"

মহারাজার চাকা-গাড়ি বোঁ-বোঁ করে চোখের আড়ালে মিলিয়ে গেল!

প্রহরীরা একখানা কাপড়ে আমার চোখ বেঁধে দিলে। এ রাজ্যে আসবার পথ-ঘাট পাছে আমি চিনে রাখি, বোধহয় সেই জন্যেই এই ব্যবস্থা!

এক দিন এক রাত পরে এক জায়গায় এসে তারা আমার চোখের বাঁধন খুলে দিলে। চেয়ে দেখি, আমি আবার জুজু পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে আছি!

প্রহরীরা সবাই হাত তুলে কড়া গলায় বললে—"বিদেয় হও!"

হঠাৎ প্রহরীদের পিছনে আমার চোখ গেল।

দেখি একটি গুহার সামনে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে আছে—কমলা!

প্রহরীরা বললে, "এখনো গেলে না ? যাও বলছি!"

বিমর্ষ প্রাণে চলে এলুম। মনে হল, আমার বোনকে আমি পিছনে ফেলে রেখে যাচ্ছি! মন কাঁদতে লাগল।

ছোট্ট পমির অভিযান

একটু আভাষ

এক যে আছেন শিশু-সাহিত্যের যাত্নকর, সাকিন তাঁর ইতালী। ভূমধ্যসাগরের তীরে ছোটদের জন্যে তিনি যখন গল্পের আসর পাতেন, তখন সেখানে ছুটে আসবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করে সারা তুনিয়ার খোকা-খুকিরা—সাত সাগর তেরো নদী পার হয়ে।

তাঁরই পমি, বনলতা আর মধুমতী প্রভৃতি আজ তোমাদের সঙ্গে আলাপ করতে এসেছে বাংলা ভাষায়, বাংলা নামে, বাংলা-পোশাকে।

হাজার হোক, আসলে ওরা ইউরোপের মানুষ তো! পাছে তোমরা ওদের ভালো করে বুঝতে না পারো, সেই ভয়ে মূল গল্পটি অল্পবিস্তর অদল-বদল করে, কোথাও একটু কমিয়ে এবং কোথাও একটু বাড়িয়ে, তুলে দিলুম তোমাদেরই কচি-কচি হাতে।

রাঙা খোকা, রাঙা খুকি, আমি আগে থাকতেই বলে রাখছি, গল্পটি তোমাদের খুব, খুব, খুব ভালো লাগবে। ইতি

কলিকাতা
২৩০/১, আপার চিৎপুর রোড,
বাগবাজার

তোমাদের
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

ছোট্ট পমি জানলে তার ভালোবাসার কেউ নেই

আসল নাম প্রমোদ। কিন্তু তার ডাক-নাম ছিল পমি।

পমির বয়স বড় কম নয়।—পুরো ছয় বছর! এবং এর মধ্যেই সে জেনে ফেলেছে তুনিয়ার অনেক-কিছুই।

ধর, সে জানে যে শীতে হাত কনকন করলে পকেটের ভিতরে পুরলেই হাত গরম হয়ে যায়। সে আরো জানে কোনটা সাদা আর কোনটা কালো রং। এবং এক থেকে পঁচিশ পর্যন্ত অনায়াসেই সে গুণে ফেলতে পারে; কিন্তু আরো বেশি এগুতে পারে না, কারণ তার পরেই মাথাটা কেমন যেন গুলিয়ে আসে। কেবল তাই নয়, সে নিজের জামা-কাপড় নিজেই পরতে পারে। এ-সব শিখতে তাকে কম বেগ পেতে হয়নি; কিন্তু উপায় কি, জন্মেই কেউ তো আর প্রফেসরের মতন জ্ঞানের জাহাজ হতে পারে না।

পমি আরো কত কি জানে। সে জানে, বড়দের দেখলেই নমস্কার করা উচিত; কেমন করে স্নান করতে হয়; কেমন করে খাবার খেতে হয় আর কেমন করে হেঁচে ফেলতে হয়। বাড়িতে অতিথি এলে যে, ভিজে-বেড়ালটির মতন শান্ত হয়ে থাকতে হয়, এটাও তার জানতে বাকি নেই। অবশ্য তাদের বাড়িতে অতিথিদের দেখা পাওয়া যেত খুবই কম; কারণ খুড়িমা মোক্ষদা হচ্ছেন একটি গজগজে ও ঝগড়াটে স্ত্রীলোক। তাঁর বয়স গেছে ষাট পেরিয়ে, আর তিনি মুখ করে থাকেন সর্বদা তেলো-হাঁড়ির মতন।

মোক্ষদা বাড়িতে বেশি লোকজনের আনাগোনা পছন্দ করতেন না। তাঁর নিজের মনের মতন লোক ছিল কেবল তু-তিনজন বুড়ি এবং তারও

কারণ তিনি যা বলতেন, তারা তাই বেদবাক্য বলে মেনে নিত! মোক্ষদা কারুর প্রতিবাদ সহ্য করতে পারতেন না। যখন কোন অসভ্য ও বোকা লোক তাঁর কথায় সায় দিতে রাজি হত না, তখন ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াত বিষম গোলমেলে।

হ্যাঁ, পমির বয়স পুরো ছয় বছর, এইবারে সাতে পড়বে সে।—এটা বড় যে-সে কথা নয়। কিন্তু কথাটা যত বড়ই হোক, পমি যখন তার খুড়ির মুখের পানে তাকিয়ে দেখত, তখন এত বড় কথাটাও মনে হত যেন নিতান্তই ছোট। এবং মনে মনে পমির দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই গোটা পৃথিবীর সমস্ত লোকই হচ্ছে তার খুড়িরই মতন।

মোক্ষদা কখনো কখনো সারাদিন ধরেই পমিকে এমন খাটান খাটাতেন যে, সে বেচারা এক মিনিটের জন্যেও হাঁপ ছাড়তে পারত না। অথচ পমি হচ্ছে নাকি তাঁর প্রাণের নিধি! তাকে ভালোবাসতেন বলেই তিনি নাকি তার সমস্ত দোষ আবিষ্কার করতে চাইতেন—অন্তত মোক্ষদার মনের মতন লোকেরা প্রায়ই এই কথা বলত। (যদুবাবুও এইরকম মত প্রকাশ করতেন। যদুবাবু ভদ্রলোক হলে কি হয়, তিনি ছিলেন পমির চোখের বালি।)

অতএব সবাই যখন বলে যে খুড়ি ভালোবাসেন বলেই তাকে এত কষ্ট দেন, পমিও তখন কথাটা বিশ্বাস করতে বাধ্য হল। কিন্তু এটা পছন্দ করবার মতন কথা নয়। আর একটা ব্যাপার সে পছন্দ করতে পারত না। তার আদরের মা গিয়েছেন স্বর্গে, অথচ মোক্ষদা সুযোগ পেলেই তাঁর নামে যা-তা কথা বলতে কসুর করতেন না।

লোকে বলে বটে তার খুড়ি তাকে ভালোবাসেন। কিন্তু পমির সন্দেহ হয় যে, তার ভালো-মন্দ নিয়ে খুড়ি কোনোদিনই মাথা ঘামান নি। তাদের দুজনেরই মতি-গতি একেবারেই আলাদা। যখন তার মেজাজ খুশি থাকে তখনো সে ভয়ে প্রাণ খুলে হাসতে পারত না। তার হাসির শব্দ নাকি একটা গোলমেলে ব্যাপার, শুনলেই মোক্ষদার মাথা ধরে যায়। যখন তার মন চাইত দৌড়তে আর লাফাতে আর ঘাসের

উপরে শুয়ে গড়াগড়ি দিতে, তখনো মনের ইচ্ছা তাকে মনেই দমন করে ফেলতে হত, কারণ এ-সব করা নাকি অসভ্যতা! অসভ্যতা সম্বন্ধে তার খুড়ির ধারণা ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট ও নিশ্চিত।

বিন্দু ছিল সে-বাড়ির পুরাতন দাসী। আজ কুড়ি বছরের অভ্যাসের পর সে হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন জ্যান্তো পাথরের দেওয়াল, মোক্ষদার সমস্ত বাক্যবাণই তার গায়ে লেগে ফিরে যায়, কোন আঁচড়ই কাটতে পারে না!

ছোট্ট পমিকে নিয়ে বিন্দু বেশি মাথা ঘামাবার সময় পেত না। ভোর আর রাত ছাড়া পমির সঙ্গে তার দেখা-সাক্ষাৎ হত খুবই কম, কারণ সারাদিনটাই তাকে ঘরের কাজকর্ম নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হত।

কাজেই পমির সামনে সর্বদাই হাজির থাকতেন খুড়ি মোক্ষদাই। তাঁর কাছ থেকে সে কখনো একটি মিষ্টি কথা, বা একটুখানি আদর বা একটিমাত্র চুম্বন উপহার লাভ করেনি। তাই পমির মনে হত, এ-দুনিয়ায় তার এমন একটি লোকের দরকার যাকে সে ভালোবাসতে পারে এবং যার কাছ থেকে সে ফিরে পেতে পারে ভালোবাসা।

তার মনের কথা বলবার একটিমাত্র লোক ছিল, সে হচ্ছে বিন্দু। একদিন সকালে বিন্দু বঁটির সামনে বসে কুটনো কুটছে, হঠাৎ সে বলে উঠল, "কেউ আমাকে ভালোবাসে না।"

কুটনো কুটতে কুটতে বিন্দু মুখ তুলে বললে, "তুমি ভালোবাসা চাও পমিবাবু? তাহলে যাও, বিয়ে করে একটি বউ নিয়ে এসো।"

পমি ঘাড় হেঁট করে বললে, "আমি তো বউ আনতে পারব না!"

—"কেন?"

—"আমি যে ভারি ছোট্ট!"

—"বেশ তো, একটি ছোট্ট দেখেই বউ আনো না।"

—"ছোট্ট বউ!" পমি ভাবলে, বিন্দুর বুদ্ধি-সুদ্ধি কিছুই নেই।

বিন্দু বললে, "হ্যাঁ, ছোট্ট বউ।"

—"ছোট্ট বউ আবার কোথায় পাব?"

—"কোথায় আবার ? রাস্তায় ?"

পমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে একবার রান্নাঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে। তারপর বললে, "কিন্তু এ-কথা শুনলে খুড়িমা কি বলবেন ?"

বিন্দু খিলখিল করে হেসে একেবারে লুটিয়ে পড়ল। পমি ভাবলে, নিশ্চয় সে খুব বোকার মতন কথা বলেছে।

বিন্দুও হচ্ছে মোক্ষদারই মতন বিষম মোটা, কিন্তু তার মনটি ছিল স্নেহে-মায়ায় পরিপূর্ণ। পমিকে সে বড় ভালোবাসত। এই মা-হারা ছোট ছেলেটিকে সে নিজের ছেলের মতই আদর-যত্ন করত, বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেত এবং তার মনের দুঃখ ভোলাবার জন্যে চেষ্টারও ত্রুটি করত না। সে যে তাকে ভালোবাসে পমিও একথা বুঝত। কিন্তু সে হচ্ছে কত ছোট, আর বিন্দু হচ্ছে তার চেয়ে কত বড়। তারা দুজনে যেন দুই জগতের জীব। এইজন্যেই পমি খুঁজছে তারই সমবয়সী কোন মনের দোসরকে।

সেদিন ঘুম ভাঙবার পর থেকেই মোক্ষদার মেজাজটা হয়েছিল বিষম ঝাঁঝালো। দুর্ভাগ্যক্রমে সেইদিনই খুড়ির সামনে দিয়ে একখানি নতুন রঙিন রুমাল নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে কোথায় যাচ্ছিল পমি।

যেই তাকে দেখা, মোক্ষদা অমনি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "কে তোকে ওটা দিলে ?"

পমি ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "কিসের কথা বলছ খুড়িমা ?"

—"ঐ যেটা তোর হাতে রয়েছে ?"

—"এই রুমালের কথা বলছ ?"

—"হ্যাঁ, রুমালের কথাই বলছি! তুই কি বুঝতে পারছিস না ? আমি কি সংস্কৃত ভাষায় কথা বলছি ?"

পমি নতমুখে বললে, "খুড়িমা, এ-রুমালখানা তো তুমিই আমাকে দিয়েছ !"

মোক্ষদা আরো জোরে চিৎকার করে বললেন, "আমি ? তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি ? আমি তোকে কিছুই দিইনি! কোত্থেকে

ওখানা চুরি করলি ?”

—“খুড়িমা, আমি তো চুরি করিনি।”

—“যা, এখনি রুমালখানা রেখে আয়! তোর মতন নোংরা ছেলের হাতে সব-সময়ে ও-রকম রুমাল শোভা পায় না! আজ যদি রবিবার হত তাহলে কোন কথা ছিল না বটে।

—“খুড়িমা, আজ তো রবিবার!”

—“না, কখনোই নয়।” গর্জন করে বললেন মোক্ষদা। ‘হতভাগা, বাঁদর ছেলে, আজ রবিবার নয়! আমি যদি বলি, আজ রবিবার হলেও রবিবার হবে না!”

পমি মৃদুস্বরে বললে, “খুড়িমা, আজ তাহলে শনিবার!”

—“না, আজ হচ্ছে সোমবার। আজ যদি সোমবার না হয়, তাহলে আজ মঙ্গলবার হতেও পারে! কিন্তু শনিবার? আজ শনিবার হওয়া অসম্ভব। শনিবার ছিল কাল।”

কাল গিয়েছে শনিবার, আজ তবু রবিবার নয়! ছোট্ট হলেও পমি বুঝলে, এর উপরে আর কোন কথা বলা চলে না। সে একেবারে চুপ মেরে গেল। কিন্তু সে কথা না বললেও মোক্ষদা ঠাণ্ডা হলেন না, তখন তাঁর মাথায় চড়েছে রাগ।

ঠিক সেই সময়ে পাশের ঘর থেকে যদুবাবুর গলা পাওয়া গেল।

মোক্ষদা রাগে ফুলতে ফুলতে বললেন, “ঐ হাড়-জ্বালানো লোকটা আবার কি করতে এসেছে?”

পমি বললে, “খুড়িমা, উনি যে যদুবাবু!”

—“যদুবাবু তো হয়েছে কি! হাড়-জ্বালানো লোক!”

পাশের ঘর থেকে যদুবাবু সুধোলেন, “আমি কি ভেতরে যাব? আমি কি ভেতরে যাবার হুকুম পাব?”

মোক্ষদা বললেন, “ভেতরে আসুন।”

যদুবাবু লোকটি যুবক নন, তাঁর দাঁত বাঁধানো, গোঁফে ও মাথার চুলে তিনি কলপ দেন—যদিও তাঁর মাথায় চুল আছে ঠিক গোনা দশ-

গাছি। তাঁর জামা-কাপড়ও ধোপদস্ত, ফিটফাট। চোখে সোনার চশমা, হাতে সোনা বাঁধানো লাঠি। যতুবাবু দরজা একটুখানি খুলে ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি কি যেতে পারি? আমি কি ভেতরে যাবার হুকুম পাব?"

মোক্ষদা উচ্চকণ্ঠে বললেন, "কি আশ্চর্য! আসুন, ভেতরে আসুন! কতবার এক কথা বলব?"

যতুবাবু বাহির থেকেই বললেন, "আমার ভয় হচ্ছে, আমি বোধহয় অসময়ে এসে পড়েছি। হয়তো আপনি বিরক্ত হবেন!"

—"হলুমই বা বিরক্ত! আসুন।"

যতুবাবু ভিতরে এসে দাঁড়িয়ে দরজাটি আবার সযত্নে ভেজিয়ে দিলেন।

মোক্ষদা বললেন, "পাড়ার কোনো নতুন খবর-টবর আছে বুঝি?"

—"তা আছে বৈ কি! আমি এইমাত্র শুনলুম, ঘোষেদের বাড়ি—" এই পর্যন্ত বলেই পমিকে দেখতে পেয়ে যতুবাবু মুখ বন্ধ করলেন।

মোক্ষদা বললেন, "ঐ ক্ষুদে বাঁদরটাকে দেখে আপনি কথা বন্ধ করলেন কেন?"

যতুবাবু বললেন, "না, ওর এখানে থাকা উচিত নয়।"

মোক্ষদা বললেন, "পমি, এদিকে আয়।"

পমি কাছে এসে বললে, "কি খুড়িমা?"

মোক্ষদা আঁচলের বাঁধন খুলে একটি সিকি বার করে বললেন, "পমি, এখনি চার আনা দিয়ে এক কৌটো জর্দা কিনে নিয়ে আয়। আমি কি জর্দা খাই জানিস তো?"

—"জানি খুড়িমা! পাতি জর্দা।"

—"আচ্ছা, যা। দেখিস, সিকিটা হারিয়ে ফেলিস না যেন!"

পমি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে সরে পড়ল। পাছে মোক্ষদা আবার তাকে ডাকেন, সেই ভয়ে সে একবারও আর ফিরে তাকালে না। সিঁড়ি দিয়ে লাফাতে লাফাতে নিচের দিকে নেমে গেল, তারপরেই গিয়ে পড়ল একেবারে রাস্তায়। তখন সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল—স্বাধীন, সে স্বাধীন!

দ্বিতীয়

পমি বনমালার নাম শুনলে

মোক্ষদা বলতেন, "ভদ্রলোকের ছেলের উচিত নয় রাস্তার মাঝখান দিয়ে যাওয়া।" পমি তাই রাস্তায় না নেমে ফুটপাথ ধরে চলতে লাগল। মোক্ষদার উপদেশ সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করত—আহারে-বিহারে সর্বদাই তিনি তার ঘাড়ে চেপে থাকতেন ভূতের মতন। আড়ালে গিয়ে পমি সর্বদাই দেখতে পেত মোক্ষদা যেন তার মুখের পানে কটমট করে তাকিয়ে আছেন!

তাদের বাড়ী থেকে মনিহারীর দোকান খুব কাছে ছিল না। গোটা রাস্তাটা আর একখানা সরকারি বাগান পেরিয়ে তবে সেখানে গিয়ে হাজির হওয়া যায়। রাস্তাটা লম্বা বলে পমি খুব খুশি হল। এই ফাঁকে খানিকটা ছুটি পাওয়া যাবে তো।

খুশি হয়ে পমি একবার শিস দিলে, কিন্তু তার পরেই থেমে গেল। মোক্ষদার উপদেশ-বাণী মনে পড়ল—'শিস দেয় খালি ছোটলোকের ছেলেরা।'

শিস দেওয়া বন্ধ করে সে গান গাইতে সুরু করলে, কিন্তু তখনি তাকে গান থামাতে হল। কারণ মোক্ষদা বলেন—'সভ্য ছেলেরা রাস্তায় কখনো গান গায় না।'

রাস্তা দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে যেন রোদের সোনার-জল এবং আকাশ নীলপদ্মের মতন নীল। মন্দিরের চুড়োর উপর দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে উড়ে যাচ্ছে চিলের পর চিল। এবং এখানে ওখানে চড়াই-পাখীরা ধরেছে চটুল গান।

পমি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ এই-সব দেখতে

লাগল। তারপর রাস্তা থেকে একখণ্ড কাঠ-কয়লা কুড়িয়ে নিয়ে পথের ধারের বাড়ির দেওয়ালগুলোর উপরে লম্বা একটা রেখা টানতে টানতে অগ্রসর হল। হঠাৎ আবার সে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার মনে হল, সে যে লিখতে পারে এটা সকলকে জানিয়ে দেওয়া দরকার। তখন সে আঙুলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে একটি পরিষ্কার সাদা দেওয়ালের উপর বড়-বড় হরপে লিখলে—'পমি'। একবার নয়, দুইবার নয়, অনেক বারই সে লিখলে নিজের নাম।

হঠাৎ তার গালের উপর পড়ল একটা বিষম চড় এবং সঙ্গে সঙ্গে শুনলে, "হতভাগা ছেলে, ইস্কুলে গিয়ে এই বুঝি তোমার বিদ্যে হয়েছে ?"

চমকে পিছন ফিরে পমি যে মূর্তিটাকে দেখলে, তার মনে হল বুঝি মনুমেণ্টের মতন লম্বা! পর মুহূর্তে সে আর পিছন দিকে না তাকিয়ে হন্‌হন্ করে সেখান থেকে সরে পড়ল।

কিন্তু কয়েক পা যেতে না যেতেই ভুলে গেল এই তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা। আলো-মাখা আকাশ বড়ই সুন্দর, তার তলায় এমন স্বাধীনভাবে বেড়াবার সুযোগ পাওয়া বড়ই আনন্দকর। এখানে খুড়িমার ধমকও নেই, চোখ-রাঙানিও নেই।

মনিহারীর দোকানে ঢুকে সে বললে, "খুড়িমার জন্যে চার আনার পাতি জর্দা দিন।"

কেউ জবাব দিলে না। দোকানের কোণে একটি বুড়ো ভদ্র লোক বসেছিলেন, দোকানদার এক মনে তাঁর সঙ্গে কথা কইছিল। পমি চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের কথাবার্তা শুনতে লাগল।

দোকানদার বলছিল, "সেই ছোট্ট মেয়েটির নাম কি ?"

ভদ্রলোক বললেন, "বনমালা।"

—"মেয়েটি এখন কোথায় ?"

—"নিশ্চই পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে।"

—"কেউ কি তাকে আশ্রয় দেয় না ?"

—"না।"

—"তার কি আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই ?"

—"আছে। কিন্তু তারা তার বোঝা ঘাড়ে চাপাতে চায় না।"

—"কি দুরাত্মা !"

—"তাকে কোন অনাথ-আশ্রমে পাঠাতে হবে।"

—"কিন্তু কে পাঠাবে ?"

—"কে আবার ? আমাদেরই ও-ভার নিতে হবে।"

—"এখন রাত হলে সে কোথায় ঘুমোয় ?"

—"রাস্তার ধারের রোয়াকে।"

দোকানদার মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, "আমি তাকে আশ্রয় দিতে পারতুম, কিন্তু আমার যে ছাই বাড়তি ঘর নেই !"

পমি স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে একবার দোকানদারের, আর একবার সেই বুড়োর মুখের পানে তাকাতে লাগল।

এতক্ষণ পরে দোকানদার জিজ্ঞাসা করলে, "খোকাবাবু, তোমার কি চাই ?"

পমি বললে, "খুড়িমার জন্যে চার আনার পাতি জর্দা দিন।"

—"চার আনার ?"

—"হ্যাঁ।"

—"তোমার খুড়িমা কে ?"

—"তিনি আমার খুড়িমা।"

—"তিনি কি করেন ?"

—"তিনি যদুবাবুর সঙ্গে কথা কইছেন।"

—"না, না, আমি ও-কথা জিজ্ঞাসা করছি না! তিনি কি কাজ করেন ?"

—"তিনি কোন কাজ করেন না।"

—"তাহলে তোমার খুড়িমার অনেক টাকা আছে বুঝি ?"

—"আমি জানি না।"

দোকানদার আর সেই বুড়ো লোকটি একসঙ্গে হো হো করে হেসে

উঠল।

—"তোমার নাম কি ?"

—"আমার নাম পমি।"

—"তোমার বয়স কত ?"

—"ছয়; কিন্তু এইবারে সাত বছরে পড়লুম বলে।"

—"তুমি পড়াশুনো কর তো ?"

—"হ্যাঁ। আমি পাঠশালায় পড়তে যাই।"

দোকানদার বললে, "বেশ, বেশ ! আমাকে চার আনা পয়সা দাও। এই নাও তোমার জর্দা।"

পমি দাম দিয়ে ও জর্দা নিয়ে দোকানের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। তারপর রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে ভাবতে লাগল :

'এই বনমালা মেয়েটি কে ? সে এখন কোথায় আছে ?...বোধহয় তার ভারি ক্ষিদে পেয়েছে ?.. তাহলে একথা সত্যি যে দুনিয়ায় এমন সব ছোট ছোট ছেলে-মেয়েও আছে যাদের কেউ নেই, না বাবা, না মা, —এমন কি, না খুড়িমা।'

'তাহলে এমন সব গরীব ছেলে-মেয়েও আছে যারা পরে থাকে ছেঁড়া ন্যাকড়া, শুয়ে থাকে পথের ধারে আর মাথার উপর দিয়ে তাদের বয়ে যায় শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা !'

ফুটপাথের পাথরের দিকে তাকিয়ে সে পায়ে পায়ে এগুতে লাগল ধীরে ধীরে। তার সারা মনটি জুড়ে জাগতে লাগল কেবল সেই একটি নাম—বনমালা, বনমালা, বনমালা !

'বনমালা ? ও-নামের কোন ছোট্টমেয়েকে তো আমি চিনি না ! আহা বেচারী, না জানি সে কতই অসুখি ! হয়তো সে সারাদিনই ঝরঝর করে কাঁদে, কিন্তু কেউ তাকে কখনো একটি মিষ্টি কথাও বলে না—এমন কি তার খুড়িমাও নেই।'

পমি অনুভব করলে তার বুকের ভিতর থেকে ঠেলে ঠেলে উঠছে একটা দারুণ দুঃখের ভাব! পমি প্রতিজ্ঞা করলে, সে নিশ্চয় বনমালাকে

সাহায্য করবে, নিশ্চয় তাকে খুঁজে বার করবে! কিন্তু সে কোথায় আছে! কোথায় গেলে তার দেখা পাওয়া যাবে?

সে ভাবতে আর ভাবতে লাগল। সোনালী রোদ আর আকাশের নীলিমা আর পাখিদের গান আর তার চোখ-কানের ভিতরে ধরা দিলে না।

কিন্তু যখন সে নিজের বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকল, হঠাৎ বনমালাকে খুঁজে বার করবার একটা উপায় সে আবিষ্কার করে ফেললে। তখন তার মন আনন্দের আবেগে এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল যে, সে একবারও শুনতে পেলে না মোক্ষদা চোখ রাঙিয়ে চিৎকার করে বলছেন, "জর্দা কিনতে এত দেরি? ওরে, তুই কি বিষম হারামজাদা ছেলে রে, ওরে গতর-খেকো, পাজি, নচ্ছার! তোর মতন হতভাগাকে কেন যে বাড়ি থেকে বিদেয় করে দিইনি সেটা আমি নিজেই বুঝতে পারছি না!"

তৃতীয়

পমি বেরুলো বনমালার সন্ধানে

না, মোক্ষদার একটা কথাও সে শুনতে পায়নি। সে জর্দার কৌটোটা খুড়িমার হাতে গুজে দিয়ে সেখান থেকে সরে পড়ে হাজির হল গিয়ে একেবারে রান্নাঘরে।

বিন্দু তখন এক মনে ইলিস মাছের আঁশ ছাড়াচ্ছিল, পমিকে দেখতে পেলে না।

পমি খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বিন্দু তাকে দেখতে পেয়ে বললে, "কিগো ফুলবাবুটি, কি মনে করে? ক্ষিদে-টিদে পেয়েছে বুঝি?"

পমি ঘাড় নেড়ে বললে, "না।"

—"তোমার ক্ষিদে পায়নি কেন ?"

পমি কাঁচুমাচু মুখে বললে, "আমার দুঃখু হয়েছে।"

—"দুঃখু! কেন ?"

—"একটি গরীব মেয়ে উপোস করে আছে।"

—"একটি গরীব মেয়ে ?"

—"হ্যাঁ।"

—"কে সে ?"

—"তার নাম বনমালা।"

—"তুমি তাকে চেনো ?"

—"না।"

—"তবে তুমি কেমন করে জানলে সে উপোস করে আছে ?"

—"কেউ আমাকে বলেছে।"

—"শোনো একবার ছেলের কথা!" পমির দুঃখ বিন্দু আর গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না, হেঁট মুখে ইলিস মাছটা দুই হাতে বঁটির উপরে তুলে ধরে তার মুণ্ডচ্ছেদ করে ফেললে।

পমি সাহস সঞ্চয় করে আবার বললে, 'আচ্ছা, 'আমি তাকে খুঁজতে বেরুই।"

—"কাকে ?"

—"বনমালাকে।"

—"কোথায় তাকে খুঁজতে যাবে ? স্বর্গে ?"

—"না, রাস্তায়।"

—"যদি তাকে খুঁজে পাও, তাহলে তুমি কি করবে ?"

—"তাকে আমাদের বাড়িতে আনব।"

—"তারপর বোধহয় তাকে উপহার দেবে তোমার খুড়িমার হাতে ?"

—"হ্যাঁ।"

—"খাসা বুদ্ধি!" বিন্দু হি হি করে হেসে এমন বেসামাল হয়ে পড়ল যে, তার হাত থেকে মুণ্ডহীন ইলিস মাছটা খসে পড়ে গেল।

বিন্দুর ব্যবহারে পমি একটু থতমত খেয়ে গেল, বুঝতে পারলে না তার এত হাসির ঘটা কেন? কিন্তু সে এখন বনমালাকে খুঁজে বার করবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাই কিছুমাত্র দমে না গিয়ে বললে, "এখন চললুম।"

বিন্দু বললে "আচ্ছা।"

—"খুড়িমা যদি আমাকে খোঁজেন তাহলে তাঁকে বোলো যে, তুমি আমাকে বাইরে পাঠিয়েছ।"

—"আচ্ছা।"

—"আসি তাহলে।"

—"এসো।"

পমি জামার দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে শান্ত গম্ভীরভাবে বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল!

পথ ধরে খানিক এগিয়ে আবার সেই বাগান। তারপর এ-রাস্তা ও-রাস্তা, এ-গলি ও-গলি, কিন্তু বৃথা! কোথায় বনমালা?

মাঝে মাঝে ভাবে, পথের লোকজনদের ডেকে জিজ্ঞাসা করে, "মশাই, আপনি কি বনমালাকে দেখেছেন?" কিন্তু তার ভরসা হয় না।

একটা বস্তির ভিতরে ঢুকে দেখা গেল, একখানা চালাঘরের সামনে একটি ছোট্ট মেয়ে মাটির উপরে চুপ করে বসে আছে। পমি তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল এবং তীক্ষ্ণ চোখে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার নাম কি?"

ছোট্ট মেয়েটা মুখ তুলে ক্ষাপ্পা হয়ে বললে "আমার নামে তোর কি দরকার?"

—"তোমার নাম কি বনমালা?"

—"বাঁদর-মুখো ছেলে, চলে যা এখান থেকে!"

পমি সুড়সুড় করে আবার এগিয়ে চলল। একটু এগিয়ে দেখলে, পথের ধারের একটা জলের কলের সামনে তিনটি ছেলে খেলা করছে। সে তফাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের কথা শুনতে শুনতে ভাবতে লাগল, তারা যা বলছে, খুড়িমা একবার যদি শুনতে পান তাহলে কি ভয়ানক

ব্যাপারই হবে!

তারপর সে আস্তে আস্তে যেই অগ্রসর হল অমনি একটি ছেলে তাকে ডেকে বললে, "ওহে খুদ-কুড়ো-বাবু, নতুন দেশ দেখতে চাও?"

পমি দাঁড়িয়ে পড়ল। তারা যে তাকেই ডাকছে সেটা সে বুঝতে পারলে না, কারণ তার নাম খুদ-কুড়ো-বাবু নয়। খানিকক্ষণ বিস্ফারিত চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে সে আবার এগুবার উপক্রম করলে।

কিন্তু ছেলেটি আবার বললে, "ওহে, তুমি কি একবার উঁকি মেরে নতুন দেশ দেখবে?"

—"সে আবার কি?"

—"বলি, দেখতে চাও? বল হ্যাঁ, কি না।"

—"আমি কি দেখব?"

—"তুমি দেখবে দিল্লী আর মক্কা, যমরাজার দরবার, ইন্দ্রপুরীর ম্যাপ, হাখনহাসি ডাইনি বুড়ি, মৎস্যরানির নাচ আর ক্রিস্টোফার কলম্বাসের ফটো!"

পমি আগেও বুঝতে পারেনি, এখনও কিছু বুঝতে পারলে না।

ছেলে-তিনটে হেসে গড়িয়ে পড়ল। সব-চেয়ে বড় ছেলেটা বললে, "এদিকে এস। ব্যাপার কি? তুমি কি ভয় পেয়েছ?"

—"না, ভয় পাইনি।"

—"তবে তুমি কাছে আসছ না কেন?"

—"এই তো আমি এসেছি।"

ছেলে-তিনটে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। একজন বললে, "তাহলে তুমি নতুন দেশ দেখতে চাও?"

পমি খানিকক্ষণ চুপ মেরে দাঁড়িয়ে থেকে কি ভাবলে, তারপর বললে, "আমায় কি দিতে হবে?"

—"একটা বোতাম।"

—"আমার কাছে তো বোতাম নেই!"

—"তার মানে?"

—"আমার পকেটে বোতাম নেই।"

—"তোমার সার্ট আর কোটের উপর ওগুলো কি রয়েছে?"

—"তুমি কি এই বোতামই নেবে?"

—"হ্যাঁ, নেবোই তো!"

—"তারপর আমায় কি করতে হবে?"

—"কিছুই করতে হবে না। কেবল চোখ চেয়ে নতুন দেশ দেখবে আর কি!"

পমি আর কিছু না বলে নিজের জামার উপর থেকে একটা বোতাম ছিঁড়ে নিয়ে সব-চেয়ে বড় ছেলেটার হাতে সমর্পণ করলে।

ছেলে তিনটে হাতের আর চোখের ইসারায় নিজেদের ভিতরে কি-একটা পরামর্শ করে নিলে। তারপর বড় ছেলেটা বললে, "পাইপটা কোথায় গেল?"

—"এই যে," বলে আর একটা ছেলে একটা টিনের মোটা হাত-তিনেক লম্বা নল নিয়ে তাড়াতাড়ি সামনে এগিয়ে এল।

বড় ছেলেটা বললে, "এই যন্ত্রটা আমরা আবিষ্কার করেছি কিন্তু কি করে এই যন্ত্রটা চালাতে হয়, তা আমরা কারুকে দেখাই না। ওহে খুদ-কুড়োবাবু, এই নলটা থাকবে তোমার ঠিক নাক আর মুখের উপর। তোমাকে আপাতত চোখ বুজে থাকতে হবে। তারপর আমি ডাকলেই তুমি আবার চোখ খুলবে আর সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাবে নতুন দেশ। বুঝেছ?"

পমি ঘাড় নেড়ে বললে, "হুঁ। তুমি যা-যা বলেছ, সব দেখতে পাব তো?"

—"আলবৎ! তার চেয়ে আরো অনেক বেশি কিছু দেখবে। তুমি কখনো সমুদ্র দেখেছ?"

—"না।"

—"আচ্ছা, তোমাকে আমরা তাও দেখাব। এখন ফিরে দাঁড়াও, চোখ বন্ধ কর।"

—"চোখ বন্ধ করেছি।"

—"কথা কোয়ো না!"

—"আমি তো কথা কইনি।"

—"নিশ্বাস ফেলো না।"

দুই চোখ মুদে, শ্বাস বন্ধ করে পমি বোবার মতন দাঁড়িয়ে রইল। সেই অবস্থায় আশেপাশে শুনতে পেলে ফিসফিস করে কথা আর চাপা হাসির শব্দ। আর শুনতে পেলে, কাছেই কোথায় ডাকছে চার-পাঁচটা চড়াই পাখি কিচির-মিচির করে। খানিক দূরে কোথায় যেন একটা দরজা বা জানালা বন্ধ হওয়ার শব্দ হল।

তার কানের কাছে কে বললে, "এইবারে নতুন দেশের খেলা সুরু হবে।" তারপরেই সে শুনতে পেলে যেন একটা ঘড়ার ভিতর থেকে ভকভক করে জল বেরিয়ে আসছে।

আবার কে বললে, "দ্যাখো, দ্যাখো, নলের ভেতরে এসেছেন যমরাজা নিজে।"

এমন কাণ্ড যে হতে পারে, পমি কখনো তা ধারণায় আনতে পারেনি। তার সারা গায়ে কাঁটা দিলে। হঠাৎ নলের একটা মুখ কে তার মুখের উপরে চেপে ধরে বললে, "এই দেখ নতুন দেশ! চেয়ে দেখ।"

কিন্তু পমি চোখ খোলবার আগেই তার নাক-মুখের ভিতরে হুড় হুড় করে জলের ধারা এসে পড়ল বিষম তোড়ে! তার নাক মুখ চোখ সমস্ত জলে জলে ভরে উঠল এবং জামা-কাপড় পর্যন্ত একেবারে ভিজে গেল।

তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এসে দুই হাতে চোখ মুছে সে চারিদিকে হতভম্বের মত তাকিয়ে দেখলে, কিন্তু তিনটে ছেলের একটাও সেখানে নেই।

খানিকক্ষণ সে কাঁদো-কাঁদো মুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বুঝলো ছেলেগুলো তাকে নিষ্ঠুরভাবে ঠকিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। তারপর আবার গুটি-গুটি এগুতে লাগল। তার জামার একটা বোতাম কমে গেল বটে, কিন্তু তার বুদ্ধি আর একটু বাড়ল।

চতুর্থ

পমি জামা-কাপড় হারালে

পমি নিজের মনেই এগিয়ে চলেছে। আর তার চোখ দিয়ে তখনো ঝরছে ফোঁটা-ফোঁটা জল।

হঠাৎ শুনলে কে বলছে, "তুমি কাঁদছ কেন খোকাবাবু?"

পমি ফিরে দেখলে, একখানা বাড়ির দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে বারো-তেরো বছরের একটি সুন্দর মেয়ে। পমি তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ভালো করে তার দিকে তাকিয়ে দেখলে।

"তোমার কি হয়েছে খোকাবাবু? তুমি কি পথ হারিয়েছ?"

—"না।"

—"তুমি কোথায় থাকো?"

পমি নিজের ঠিকানা বললে।

—"তুমি একলা পথে বেরিয়েছ কেন?"

—"আমি বনমালাকে খুঁজছি।"

—"বনমালা কে? তোমার বোন?"

—"না। একটি ছোট্ট মেয়ে। সে যে কে তা আমি জানি না।"

—"তুমি একটি ছোট্ট মেয়েকে খুঁজছ, কিন্তু তাকে চেনো না?"

—"না।"

—"তবে তুমি তাকে কেমন করে খুঁজে বার করবে?"

—"আমি জানি না।"

—"খোকাবাবু, তুমি তো ভারি মজার ছেলে দেখছি! তা তুমি বনমালাকে খুঁজছ কেন?"

—"তার যে মা নেই, বাবা নেই, আর সে যে উপোস করে থাকে।"

—"তোমার বাবা-মা কেমন করে তোমাকে একলা পথে ছেড়ে দিলেন ?"

—"আমি বিন্দুকে বলে এসেছি।"

—"বিন্দু কে ?"

—"আমাদের ঝি।"

—"কিন্তু তোমার মা শুনলে কি বলবেন ?"

—"আমার মা নেই ! আমার খালি খুড়িমা আছেন !"

—"আহা !"

—"আমার নাম পমি।"

—"আহা, বেচারা পমিবাবু।" মেয়েটি মমতা-ভরা চোখে পমির দিকে তাকিয়ে রইল।

পমি বললে, "আজ তবে আসি ?"

—"তুমি কোথায় যাবে ?"

—"কোথায় যাব, জানি না !"

—সন্ধ্যের আগে বাড়ি ফিরে যেও। তোমার জামা-কাপড় ভিজে কেন ? তুমি কি করছিলে ?"

—"নতুন দেশ দেখছিলুম।" বলেই পমি আবার কেঁদে ফেললে। তার কথা কিছুই বুঝতে না পেরে মেয়েটি হেসে ফেললে। পমি আর সেখানে দাঁড়াল না।

পমি আবার ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগল। হাওয়ায় আর রোদের তাতে তার জামা-কাপড় আবার শুকিয়ে এল এবং খানিক্ষণ পরে সেও ভুলে গেল তার নতুন দেশ দেখার দুঃস্বপ্ন।

সাত-আট বছরের তিনটি মেয়ে বোধহয় ইস্কুল থেকে ফিরে আসছে! তাদের এক-হাতে বইয়ের গোছা, আর এক-হাতে লজেঞ্জুসের লাঠি। তারা আসছে হাসতে হাসতে, নাচতে নাচতে আর গাইতে গাইতে—ঠিক যেন তিনটি চলন্ত আনন্দের ফোয়ারা। তারা যে বড়লোকের মেয়ে নয়, এটা তাদের জামা-কাপড় আর জুতো দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু

সেজন্যে তাদের দুঃখ নেই কারণ তারা গলা ছেড়ে গান গাইছিল—

চু রে রাং চাং ! সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে ঠ্যাং,
কাঁপিয়ে মাটি পুকুর-পাড়ের, ধরব খালি কোলা-ব্যাং !
দেখব কে আর তাদের বাঁচায়,
রাখব পুরে লোহার খাঁচায়,
সন্ধ্যে হলে কণ্ঠ ছেড়ে গাইবে তারা গ্যাঙর-গ্যাং ?

পমি দাঁড়িয়ে পড়ে গান শুনতে লাগল। মেয়ে-তিনটি গাইতে গাইতে আরো কাছে এগিয়ে এল—

উনুন, কড়া দরকার ভারি,
রাঁধব ব্যাঙের কোর্মা-কারি,—
খবর পেয়ে আসবে যখন চীন-মুলুকের চুচুং-চ্যাং !

গান ফুরুতেই তারা সকৌতুকে এত জোরে হেসে উঠল যে, শুনলে পৃথিবীর সব-চেয়ে দুঃখী, হতভাগ্যের মুখেও ফুটে উঠবে অট্ট-হাসির হৈ হৈ। এমন কি, পমিও না হেসে পারলে না। এবং সেও এই মাত্র-শোনা গানের দুটো লাইন আবৃত্তি করে গেল—

চু রে রাং চাং ! সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে ঠ্যাং,
কাঁপিয়ে মাটি পুকুর-পাড়ের, ধরব খালি কোলা-ব্যাং !

তার উচিত ছিল গানের লাইন-দুটি উচ্চারণ না করা। কারণ তার মুখে সেই গান শুনেই মেয়ে-তিনটি থেমে দাঁড়িয়ে পড়ল, এবং তার দিকে তাকিয়ে রইল ঘৃণাভরা চোখে।

একটি মেয়ে বললে, "আমাদের গান গাইছিস, তুই কে রে ছোঁড়া ? আমরা তোকে চিনি না ! যা, নিজেদের দলে গিয়ে ভিড়গে যা।"

পমি অত্যন্ত লজ্জা অনুভব করলে। নিজের জন্য নয়, সে লজ্জা পেলে ঐটুকু মেয়ের মুখে অমনধারা কথা শুনে। জিজ্ঞাসা করলে, "আমি কি দোষ করেছি ?"

—"যা, যা ! নিজের চরকায় তেল দিগে যা, আমাদের আর জ্বালাতে হবে না !"

মেয়ে-তিনটি রেগে কটমট করে তার পানে তাকালে। একটি মেয়ে বললে, "ভারি যে কথা শিখেছিস দেখছি! অত কথা কে তোকে শেখালে?"

এইবারে পমির মনে একটু একটু করে রাগ বাড়তে লাগল। সে বললে, "তোমরা কার কাছ থেকে কথা কইতে শিখেছ?"

—"যে-সব ছোঁড়াকে চিনি না, তাদের সঙ্গে আমি কথা কই না।"

পমি উপদেশ দিলে, "বেশ, তাদের সঙ্গে কথা কোয়ো না।"

—"আমার যা-খুশি তাই করব, তুই হচ্ছিস পাজীর পা-ঝাড়া ছেলে!"

—"আর তুমি হচ্ছ একটি মস্ত বোকা মেয়ে!"

—"আর তুই হচ্ছিস একটা ল্যাজ-কাটা গাধা!"

পমি মুখ রাঙা করে বললে, "ভালো চাও তো এখান থেকে সরে পড়। আমি মেয়েদের সঙ্গে লড়াই করতে চাই না।"

একটি মেয়ে বললে, "আ হা হা, দুধের খোকা, উনি মেয়েদের সঙ্গে লড়বেন না!"

আর একটি মেয়ে বললে, "সরে পড় খোকা, চটপট সরে পড়!"

পমি মাথা নেড়ে দৃঢ়স্বরে বললে, "না, আমি এইখানেই দাঁড়িয়ে থাকব।"

মেয়ে-তিনটি তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে পমির উপরে বাঘের বাচ্ছার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। পমিও হটবার পাত্র নয়, সেও প্রাণপণে ঘুষি বাগিয়ে যুঝতে লাগল। হঠাৎ এই হৈ-চৈ দেখে একটা পেয়ারা গাছের উপরে তিন-চারটে কাক 'কা' 'কা' রবে চিৎকার জুড়ে দিলে।

পমির অবস্থা যখন রীতিমত কাহিল হয়ে এসেছে, সেই সময়ে ঘটনাস্থলে এসে হাজির হল একটি বৃদ্ধা নারী। তার ধমক খেয়েই দুর্দান্ত মেয়ে-তিনটে পাঁই পাঁই করে পালিয়ে গেল। এবং তার কাছ থেকে আর এক ধমক খেয়ে পমিও তাড়াতাড়ি নিজের পথ ধরলে।

পমির তখন অতিশয় দুরবস্থা। তার মুখে গলায় ও হাতে লম্বা-লম্বা

আঁচড়ের রক্তাক্ত দাগ এবং তার নাক দিয়েও পড়ছে রক্ত। কিন্তু এ-সব সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না, যে-কাজে বেরিয়েছে সে-কাজ আগে শেষ করা চাই! হাজার বিপদ এলেও সে আর পিছপা-ও হতে রাজি নয়। দু-একটা রাস্তা পেরিয়েই সে আবার ভুলে গেল সমস্ত দুর্ঘটনার স্মৃতি।

আর কিছুক্ষণ পরেই পৃথিবীর বুকের উপরে ঘনিয়ে আসবে সন্ধ্যার ছায়া। কিন্তু তবু বাড়ি ফেরবার কথা তার মনে হল না।

বনমালা! বনমালাকে না নিয়ে সে আর ঘরে ফিরবে না। যদি সন্ধ্যা নামে, রাত হয়, রাত পুইয়ে যায়, তবু বনমালাকে না পেলে সে বাড়ির কথা ভাববে না।

পমি অনেক রূপকথা শুনেছে। সে জানে রাজার ছেলে চোখে না দেখেই অজানা রাজকুমারীর সন্ধানে ঘোড়ায় চড়ে পথে বেরিয়ে পড়ে, কত পথ, কত তেপান্তর, কত গহন-বন আর নদী-পাহাড় পেরিয়ে চলে রাজার ছেলে, এগিয়ে চলে। তারপর ঘুমন্ত রাজকন্যাকে খুঁজে পায় কোন রক্ষোপুরীর অন্তঃপুরে।

পমির মনে হল, রাজার ছেলে যদি অজানা রাজকুমারীর খোঁজে দিনের পর মাস, মাসের পর বছর কাটিয়ে দিতে পারে, তবে অভাগিনী বনমালার জন্যে সে কি আর একটা রাতও বাইরে কাটাতে পারবে না?

পমি চলেছে তো চলেছেই। মাঝে মাঝে দু-একটি ছোট মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়। কিন্তু তাদের কারুর নাম বনমালা কিনা, একথা জিজ্ঞাসা করবার সাহস আর তার হয় না। তাদের কেউ বনমালা কিনা জানবার জন্যে সে বুদ্ধি খাটিয়ে আর এক উপায় অবলম্বন করলে। নতুন-কোন মেয়ে দেখলেই খানিকক্ষণ তার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে, তারপর তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে যেন কোন অদৃশ্য মেয়ের উদ্দেশ্যেই সে চেঁচিয়ে ডাকে—"বনমালা! ও বনমালা!"

কিন্তু এই নতুন উপায়ও কাজে লাগল না। কারণ কোন মেয়েই স্বীকার করলে না যে, তার নাম বনমালা। বার-দশেক এই নতুন উপায়টি অবলম্বন করে শেষটা সে হতাশ হয়ে পড়ল।

এখন সে শহরের বাইরে এসে পড়েছে। আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দেখলে, ছোট্ট একটি আঁকাবাঁকা নদী বয়ে যাচ্ছে কুল কুল গান গাইতে গাইতে। দুই-পাশে তার সবজে ঘাসের সতরঞ্চ পাতা, মাঝে মাঝে ঝোপ-ঝাড়, আর মাঝে মাঝে মস্ত-মস্ত সবুজ ছাতার মতন বড়-বড় গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে, পায়ের তলায় মিষ্টি ছায়া ফেলে। নীল আকাশের ভাঙা ভাঙা মেঘে আগুন জ্বালিয়ে সূর্য তখন পাটে বসছে।

জায়গাটি পমির ভারি ভালো লাগল। অন্তত পাঁচ ঘণ্টা ধরে সে টো-টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে পথে পথে। তার উপরে সারাদিন খাওয়া-দাওয়া হয়নি, তার শরীর ক্রমে এলিয়ে আসছে, পা আর চলতে চাইছে না! নদীর ধারে গাছের তলায় নরম ঘাসের উপরে বসে সে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করবে বলে মনে করলে। বসবার পর তার মনে হল একটুখানি শুয়ে নিলেও মন্দ হয় না। শুয়ে শুয়ে তাকিয়ে সে দেখতে লাগল, গাছের সবুজ পাতার ফাঁকগুলো দিয়ে দেখা যাচ্ছে আলো-মাখানো টুকরো টুকরো নীল আকাশ। তার কানের কাছে বাজছে কোন এক গানের পাখির বেলা-শেষের সুর।···আর শোনা যাচ্ছে, পাতাদের সঙ্গে বাতাসের কানাকানি আর নদীর একটানা ছলাৎ-ছলাৎ ছন্দ। নিজের অজান্তে কখন সে ঘুমিয়ে পড়ল।

যখন ঘুম ভাঙল পমি চোখ চেয়ে দেখলে খালি অন্ধকার। সে চমকে তাড়াতাড়ি উঠে বসল, কিন্তু তখনও অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলে না, যদিও অনুভব করলে আর একটা ব্যাপার। সভয়ে সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে সে বুঝতে পারলে, তার পায়ে জুতো নেই, পরনে কাপড় নেই, গায়ে সার্টের উপরে কোটটাও নেই! আঁধারে চারিদিক হাতড়েও সে হারানো জিনিসগুলো খুঁজে পেলে না। যখন ঘুমোচ্ছিল তখন নিশ্চয়ই কোন চোর এসে তার সব জিনিস চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে।

রাত হয়েছে। কিন্তু কত রাত? তাও আন্দাজ করা গেল না। মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল, কেন সে বোকার মতন ঘুমিয়ে

পড়েছিল ? ভয়ে পমি বনমালার কথাও একেবারে ভুলে গেল, নিজের কি হবে তাই ভেবেই অস্থির হয়ে উঠল। এই রাতে, এই নদীর ধারে, এই গাছের তলায়, এই অন্ধকারে সে তো সকাল পর্যন্ত বসে থাকতেও পারবে না, আর এমন ল্যাংটো হয়ে তার পক্ষে এখন লোকালয়ে মুখ দেখানোও অসম্ভব। পমি দেখেছে, ল্যাংটো হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ায় খালি পাগলরা। লোকে কি তাকেও শেষটা পাগল বলেই মনে করবে ?

তা করে করুক! এখানে সকাল পর্যন্ত বসে থাকার কথা মনে হতেই তার বুকটা দুদ্দুড় করে উঠল। না, যেমন করে হোক, এখান থেকে বেরিয়ে পড়তেই হবে! যত রাত বাড়ছে তত শীত বাড়ছে! পমি ঠক-ঠক করে কাঁপতে লাগল—যেন তার হাড়ের ভিতর পর্যন্ত ঢুকে পড়েছে ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া! সে মনে মনে বললে, 'বাইরে বেরুলে যদি কেউ আমাকে ল্যাংটো দেখে অবাক হয় তাহলে আমি বলব—'মশাই, আমি পাগল নই। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করবেন, কারণ চোরে আমার এই অবস্থা করেছে, আমি নিরুপায়।'

সে আস্তে আস্তে কয়েক পদ অগ্রসর হল। কিন্তু কোন দিকে যাবে ? অন্ধকারে পথ যে দেখা যায় না! তার বাড়ি ফেরবার পথ কোথায়? পমির মনে হল, এই তারার চুমকি-বসানো কালো আকাশের তলায় সে যেন একটি ছোট্ট ঝিঁঝি-পোকা! তফাৎ খালি এই, ঝোপে-ঝাপে ঝিঁঝিপোকাদেরও বাসা থাকে, তার কিছুই নেই!

তার নরম খালি পায়ে পট-পট করে কাঁকর ও কাঁটা বিঁধতে লাগল, কিন্তু তাও সে খেয়ালে আনলে না।

আচম্বিতে সে সভয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেল। অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকারেরও চেয়ে কালো মস্ত-একটা চলন্ত ছায়া! কী ওটা ? গরু, না মোষ, না বাঘ, না ভালুক ? এই শীতেও সে ঘেমে উঠল। জানোয়ারটা কি তাকে দেখতে পেয়েছে! এখনি হালুম করে তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে ?

সে জুল-জুল করে চারিদিকে তাকাতে লাগল। আকাশে কালো, পৃথিবীতে কালো, নদীর বুকেও কালো—সমস্তই অদৃশ্য হয়ে গেছে কালিমার জঠরে। তার উপরে কালিমারও চেয়ে কালো এই চলন্ত ছায়াটা! বাঁচবার আর কোন উপায় নেই।

পমির কণ্ঠের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা করুণ কান্না। এই বয়সেই সুমুখে দেখলে সে মৃত্যুকে।

পঞ্চম

পমি একজনের দেখা পেলে

কিন্তু চলন্ত ছায়াটা পমির দিকে না এসে অন্যদিকে চলে গেল।

আরো খানিকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর একটা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে আবার অগ্রসর হল। দূর থেকে ভেসে এল একখানা রেল-গাড়ির শব্দ। তাই শুনে বাড়ল তার সাহস।

একটা আলো দেখা গেল—সরকারি ল্যাম্পের আলো। তাহলে নিশ্চয় ওখানে পথ আছে! পমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দেখলে যে, তার অনুমান সত্য। পথের ধারে জ্বলছে সেই আলোটা। এতক্ষণ সে ছিল অন্ধ, এইবারে দৃষ্টি ফিরিয়ে পেয়ে তার মন হল কতকটা শান্ত।

কিন্তু পথটা চিনতে পারলে না। এ পথ যদি তার বাড়ির দিকে না গিয়ে থাকে? এ পথ যদি তাকে নিয়ে যায় আরো অজানা, আরো ভয়াবহ কোন দেশে?

এ আবার নতুন দুর্ভাবনা! শীতে কাঁপতে কাঁপতে অত্যন্ত দুঃখিত-ভাবে পমি দাঁড়িয়ে রইল নাচারের মত। আবার সে কেঁদে ফেললে।

হঠাৎ অত্যন্ত মিষ্টি ও মিহি-গলায় কে জিজ্ঞাসা করলে, "কি হয়েছে খোকন!"

জবাব না দিয়ে পমি কাঁদতে লাগল।

—"খোকন, এই শীতে ল্যাংটো হয়ে তুমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেন ?"

পমির কান্না থামে না, আরো বাড়ে।

—"কেউ কি তোমাকে মেরেছে ?"

—"না।"

—"তোমার কি শীত করছে ?"

—"হ্যাঁ।"

—"বড্ড শীত করছে, না ?"

—"হ্যাঁ, বড্ড !"

—"তোমার জামা-কাপড় কোথায় গেল ?"

—"চোরে চুরি করেছে।"

—"কেমন করে ?"

—"আমি নদীর ধারে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। সেই সময়ে জামা-কাপড় চুরি গিয়েছে।"

—"চোরেরা কি নির্দয় ! তোমার ঠিকানা কি ?"

পমি নিজের ঠিকানা বললে।

—"চল, তোমাকে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি। দাঁড়াও, আগে আমার এই র‍্যাপার-খানি গায়ে জড়িয়ে নাও। এই র‍্যাপার-খানি ছাড়া আমার আর কোন সম্বল নেই।"

নিজেকে ল্যাংটো জেনে পমি এতক্ষণ লজ্জায় তার দিকে তাকায় নি। এখন সে দেখলে, তার গায়ে নিজের র‍্যাপার খুলে জড়িয়ে দিচ্ছে একটি মেয়ে। পমির চেয়ে মেয়েটি একটু বড়। তার গায়ে একটি ছেঁড়া ও মলিন জামা। তার মুখ ও দেহ ক্ষীণ। কিন্তু তার ডাগর চোখ দুটি দয়া-মায়া-মমতায় ভরা। মেয়েটির এলানো চুলগুলি তার বুক-কাঁধ-মুখের উপরে এসে পড়েছে।

তারা আস্তে আস্তে এগুতে লাগল। ক্রমে তারা শহরের ভিতরে প্রবেশ করলে।

পমির মন এখন নিশ্চিন্ত। সে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?"

—"তোমার বাড়িতে।"

—"তারপর তুমি কোথায় যাবে?"

—মেয়েটি জবাব দিলে না।

—"তুমি কোথায় থাকো?"

—"সব জায়গায়।" দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেয়েটি বললে।

পমি এ-কথার মানে বুঝতে পারলে না। মেয়েটির মুখের পানে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "সব জায়গায় কি কারুর বাড়ি থাকতে পারে?"

মেয়েটি হেসে বললে, "আমার বাড়ি হচ্ছে এই পৃথিবী।"

এ কথারও মানে হয় না। কিন্তু পাছে মেয়েটি তাকে বকে সেই ভয়ে সে আর মানে জিজ্ঞাসা করলে না। সে বললে, "তুমি কি সেখানে একলা থাকো?"

—"না। আমার অনেক সাথী আছে।"

—"কে তারা?"

—"যে-সব ছেলে-মেয়ে আমার মতন একলা।"

পমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, "দুনিয়ায় তুমি একলা?"

—"হ্যাঁ ভাই।"

—"তোমার কেউ নেই—একেবারে কেউ নেই?"

—"না, আমার কেউ নেই।"

পমি গম্ভীর মুখে ভাবতে লাগল। তারপর হঠাৎ সুধোলে, তাহলে তুমি কি কর?"

—"কি করি মানে?"

—"তুমি কেমন করে খাবার পাও?"

—"আমি ভিক্ষে করি।"

—"অ্যাঁ!" পমি পয়সা বার করবার জন্যে পকেটে হাত দিতে গেল

এবং সঙ্গে সঙ্গে তার হুঁস হল যে, সে এখন উলঙ্গ। বললে, "আহা, বেচারী!" এবং সঙ্গে সঙ্গে তার স্মরণ হল যে, কার খোঁজে আজ বেরিয়েছে সে। বললে, "আচ্ছা. তুমি তাহলে নিশ্চয়ই বনমালাকে চেনো ?"

আবার একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেয়েটি বললে, "বোধহয় চিনি।"

—"সে কোথায় থাকে? আমি আজ সারাদিন তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

—"কেন ?"

—"আমি তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে চাই। বিন্দু সব জানে।"

—"তোমার বাড়িতে ? কেন ?"

—"আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকব।"

মেয়েটি পমির হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে চাপ দিলে, কিন্তু মুখে কিছু বললে না। তারা আবার চলতে লাগল, এবার আরো তাড়াতাড়ি।

পমি বললে, "আজ আমি সারাদিন কিছু খাই নি।"

—"সেকি! কেন ?"

—"কেন জানো ? আমি যে বনমালার জন্যে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু তবু তার দেখা পেলুম না!"

মেয়েটি অতি মৃদুস্বরে বললে, "না ভাই, তুমি তাকে দেখতে পেয়েছ।"

—"দেখতে পেয়েছি ? কোথায় ?"

—"নদীর ধারে।"

—"কই, আমি দেখিনি তো!"

—"হ্যাঁ দেখেছ। তুমি তাকে দেখেছ, তুমি তার সঙ্গে কথা কয়েছ।"

—"না আমি দেখিনি।"

—"হ্যাঁ তুমি দেখেছ! তুমি তাকে দেখেছ, তুমি তার সঙ্গে কথা কয়েছ আর বনমালাও তোমাকে ভারি ভালোবাসে।"

পমি একটা পা এগিয়ে ফেলতে গিয়ে বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, "সে আমাকে ভালোবাসে ?"

—"হ্যাঁ। সে তোমাকে ভালোবাসে, তুমি যে বড় ভালো ছেলে!"

—"কে তোমাকে বললে সে আমাকে ভালোবাসে ?"

—"সে নিজে বলেছে।"

তারপর মেয়েটি হেঁট হয়ে দুই হাতে পমিকে ধরে অতি কষ্টে মাটি থেকে উপরে তুললে ; এবং পমির মুখের সামনে নিজের মুখ এবং তার চোখের সামনে নিজের চোখ রেখে বললে, "তুমি কি বুঝতে পারছ না, আমারই নাম বনমালা ?"

—"তুমি ?" বলেই পমি ভাবলে, সে বোধহয় স্বপ্ন দেখছে !

কিন্তু তারপর যখন দেখলে যে, অভাগিনী বনমালার ডাগর দুটি চোখ ভরে উঠেছে অশ্রুজলে, তখন সে নিজের মুখ বাড়িয়ে তার মুখে দিলে চুমু। বনমালা তাকে আবার নামিয়ে দিলে। তারপর তারা আবার পথ চলতে লাগল, কিন্তু কারুর মুখে কোন কথা নেই। তাদের গতি ক্রমেই দ্রুত হয়ে উঠতে লাগল এবং অবশেষে তারা একটি অন্ধকার রাস্তার ভিতর এসে ঢুকল ; তারপর তারা একখানি নিস্তব্ধ বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বনমালা জিজ্ঞাসা করলে, "এই কি তোমাদের বাড়ি ?"

পমি বললে, "হ্যাঁ।"

বনমালা দরজার কড়া ধরে নাড়া দিলে।

ষষ্ঠ

মোক্ষদার হাত থেকে পমিকে বাঁচাবার জন্যে বিন্দুর প্রচেষ্টা

মৌন-রাত্রির মাঝখানে কড়ার শব্দ যেই বেজে উঠল, অমনি বাড়ির ভিতর থেকে জেগে উঠল একটা অত্যন্ত কর্কশ চিৎকার—সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট পমির দেহ হয়ে গেল যেন আরো ছোট্ট।

সে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে, "আমার খুড়িমার গলা !"

বনমালা জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার খুড়িমার কি হয়েছে ?"

—"তাঁর মেজাজ ভালো নেই।"

—"তুমি এত রাতে বাড়ি ফিরছ বলে বুঝি ?"

—"না, তিনি সব সময়েই ঐ রকম।" বলেই পমি যেখানটায় অন্ধকার সব-চেয়ে বেশি ঘন সেইখানে পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়াল।

বাড়ির ভিতর থেকে দরজা খুলেই বিন্দু জিজ্ঞাসা করলে, "কে ডাকে।"

পমি গলা নামিয়ে বললে, "আমি পমি।"

—"পমি ?"

—"হ্যাঁ।"

—"ওমা, অবাক !" বিন্দু বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়াল। হাতের লণ্ঠনটা উপরে তুলে পমিকে দেখতে পেয়ে বললে, "হুঁ, এতক্ষণ কোথায় থাকা হয়েছিল ?"

—"আমি বনমালাকে খুঁজছিলুম।"

—"ও ! বেশ, এখন তোমার খুড়ির কাছে জবাবদিহি করবে এস। মজাটা আজ টের পাবে !"

—"কিন্তু আমি কি দোষ করেছি ?"

—"তুমি কি দোষ করেছ ? সেই কোন সকালে বেরিয়েছ, আর ফিরে এলে এই রাতে ? এটা দোষ নয় ? সবাইকে যে এত ভাবিয়ে মারলে, এটাও দোষ নয় ?"

—"কিন্তু তুমিই তো আমাকে যেতে বললে !"

—'বা রে ছেলে বা ! শেষটা আমার ঘাড়েই সব দোষ চাপাবার চেষ্টায় আছ !"

—"সত্যি বলছি বিন্দু, আমি বনমালাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম !"

—"বনমালা, বনমালা, বনমালা ! শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল বাছা ! এখন ভেতরে এসো, সারাদিন অন্ন জোটেনি তো ?"

বাড়ির ভিতর থেকে মোক্ষদার ক্রুদ্ধ কণ্ঠে শোনা গেল—"বিন্দি !

সদরে দাঁড়িয়ে অতক্ষণ কি করছিস্ তুই ? কে এসেছে ?"

বিন্দু চেঁচিয়ে বললে, "এই যে মা, যাচ্ছি !" তারপর গলা নামিয়ে ফিরে বললে, "শুনছ তো পমিবাবু, তোমার খুড়িটিকে চেনো তো ? এখন চটপট ভেতরে ঢুকে পড়ো !"

কিন্তু পমি তবু নড়ল না। এইবারে বিন্দু ধৈর্য হারিয়ে বলে উঠল, "বলি, তুমি ভেতরে আসবে কি আসবে না ?"

এতক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করে পমি বললে, "আমি যাচ্ছি। কিন্তু বনমালা এসেছে যে।"

বিন্দু সচমকে বললে, "কে ?"

—"বনমালা।"

বিন্দু লণ্ঠনটা আবার তার মাথার উপরে তুলে ধরে এদিকে-ওদিকে তাকাতে লাগল, তারপর দেখতে পেলে এককোণে দেওয়ালে পিঠ রেখে একটি ছোট্ট মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে—ঠিক যেন কলে-পড়া একটি ভীত নেংটি ইঁদুরের মতো। সে বললে, "ও কে ?"

—"ঐ তো বনমালা !"

—"ওমা, অবাক !"

—"আমি ওকে খুঁজে পেয়ে তোমার কাছে এনেছি। ও আমাকে ভালোবাসে কিনা !"

বিন্দু গলা চড়িয়ে বললে, "তুমি ক্ষেপে গিয়েছ।"

—"কেন ?"

—"তুমি ভেবেছ কি ? তুমি কি ভেবেছ পথ থেকে যাকে পাবে, তাকেই কুড়িয়ে নিয়ে আসবে ?"

এই কথা শুনেই অভাগিনী বনমালা দেওয়াল ঘেঁসে-ঘেঁসে পায়ে পায়ে এগিয়ে অন্ধকারের ভিতরে আবার মিলিয়ে যাবার চেষ্টা করলে। সে একবারও আর পিছন ফিরে তাকালে না, কিন্তু পমি আর বিন্দু দুজনেই শুনতে পেলে তার চাপা-কান্নার অস্ফুট শব্দ।

বিন্দু তাড়াতাড়ি দৌড়ে গেল এবং যে-ভাবে সে দৌড়ে গেল তা

দেখলেই বোঝা যায় তার সমস্ত বুকের ভিতরটা উথলে উঠেছে গভীর সমবেদনায়।

বিন্দু বললে, "কেন তুমি কাঁদছ বাছা? তোমার মতন এক-ফোঁটা ননীর পুতুলকে এই অন্ধকারে আমি কি পথে বিসর্জন দিতে পারি। পমিবাবু, তোমার বন্ধুকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে চল।" বনমালা ফিরে দাঁড়াল।

বিন্দু জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার কি মা-বাপ নেই এই রাতে পথে পথে কেন তুমি একলা বেড়াচ্ছ?"

—বনমালা মাথা হেঁট করে বললে, "আমার কেউ নেই!"

বিন্দু তাকে কোলে তুলে নিয়ে বললে, "চল বাছা বাড়ির ভেতরে, আমি তোমাকে আমার ঘরে লুকিয়ে রাখব।"

সদর বন্ধ করে বিন্দু তাদের নিয়ে বাড়ির ভিতরে গেল। বনমালাকে আগে নিজের ঘরে শুইয়ে রেখে সে বললে, "এইখানে থাকো, আমি একটু পরেই আবার ফিরে আসছি। গিন্নী ঘুমোলেই তোমার জন্যে খাবার আনব।"

পমি বললে, "আর আমার কি হবে?"

—"সবুর কর, সবুর কর! তুমি রান্নাঘরে যাও। আমি ঠাকরুণকে ঠাণ্ডা করে আসি।"

পমি বললে, "শিগগীর এসো বিন্দু, আমার পেট ক্ষিদেয় জ্বলে যাচ্ছে!"

বিন্দু চলে গেল। কিন্তু পমি রান্নাঘরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না। খুড়ির মতামত জানবার জন্যে তার মন অধীর হয়ে উঠল। অদৃষ্টে কি আছে আগে থাকতে তা জেনে সে প্রস্তুত হয়ে থাকতে চায়। পমি পা টিপে টিপে উপরে মোক্ষদার বসবার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

পাড়ায় কি কি নতুন ঘটনা ঘটছে, বটুবাবুর মুখ থেকে মোক্ষদা তখন সেই-সব সবিস্তারে শ্রবণ করছিলেন। বিন্দুকে দেখেই তিনি বলে

উঠলেন, "হ্যাঁ লা বিন্দি, সদরে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ ধরে কি হচ্ছিল ?"

—"আমি তো রান্নাঘরে ছিলুম !"

—"রান্নাঘরে ছিলে ? সেখানে আর কে আছে ?"

—"আর কেউ নেই ।"

—"ছাখ বিন্দু, বাজে কথায় তুই আমায় ভুলোতে পারবিনি। সেই অকালকুষ্মাণ্ডটা ফিরে এসেছে, আমি বুঝেছি !"

—বিন্দু চুপ।

—"তুই জবাব দিচ্ছিস না কেন ?"

—"কি জবাব দেব ?"

—"সে-ছোঁড়া এসেছে কিনা ? সত্যি বল। এসেছে তো ?"

বিন্দু এমন মৃদুস্বরে বললে, "হু" যেন, তা শোনালো ঠিক একটি দীর্ঘশ্বাসের মত।

—"তাকে এখুনি আমার কাছে নিয়ে আয় !"

—"বেচারী ভয়ে কেঁপে সারা হচ্ছে, মা !"

—"যাতে তার সত্যিই ভয় হয়, আজ আমি তাই করব। নিয়ে আয় তাকে !"

বিন্দু বললে, "মা, পমির দোষ নেই। পমিকে আমিই বাইরে যেতে বলেছিলুম। আমি যে ঠাট্টা করে বলেছিলুম, পমি তা বুঝতে পারেনি।"

মোক্ষদা সোজা হয়ে খনখনে গলায় বললেন, 'চুপ ! তোর কোন কথা শুনতে চাইনা আমি ! তাকে নিয়ে আয় আমার কাছে !"

মোক্ষদার ধমক থেকে বিন্দুকে বাঁচাবার জন্যে পমি হঠাৎ দরজা ঠেলে ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল। তারপর বললে, "খুড়িমা, এই যে আমি।"

পমি নির্বাসনে গেল

ঘরের ভিতরে পমির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মোক্ষদা আশ্চর্য-রকম চুপ হয়ে গেলেন।

যদুবাবুও এমনভাবে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে রইলেন যেন এ-ঘরের কোন-কিছুর সঙ্গে তাঁর কোনই সম্পর্ক নেই।

দীর্ঘস্থায়ী স্তব্ধতা! বিন্দু যেন একটা-কিছু করবার জন্যেই হাতের হারিকেন লণ্ঠনটা একবার এখানে একবার ওখানে সরিয়ে সরিয়ে রাখতে লাগল।

তারপর মোক্ষদা গাত্রোত্থান করলেন। পমি তাকিয়ে রইল মাটির দিকে। মোক্ষদা তার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

হঠাৎ পমির র্যাপারের একটা কোণ ধরে মোক্ষদা বললেন, "কী এটা?"

পমি চোখ না তুলেই বিড়-বিড় করে বললে, "র্যাপার।"

—"কে দিলে তোকে?"

—"একটি মেয়ে।"

—"এখুনি এটা খুলে ফ্যাল!"

—"আমার বড্ড শীত করছে!"

—"খোল বলছি!"

পমি তবু স্থির।

মোক্ষদা র্যাপার ধরে মারলেন এক টান। পমি যা ভয় করছিল, তাই হল। র্যাপার গেল উড়ে, বেরিয়ে পড়ল তার নগ্ন দেহ!

প্রথমটা মোক্ষদার চক্ষুস্থির! তারপর তাঁর দুই চোখ হল ছানাবড়ার

মতো। ভীষণ স্বরে তিনি বলে উঠলেন, "অ্যাঃ! তুই ল্যাংটো।"

পমি বোবা।

—"তোর পোশাক কোথায় গেল?"

পমি তবু কথা কয় না।

—"তুই যদি কথা না বলিস তাহলে মারের চোটে আজ তোর ভূত ভাগিয়ে দেব।" সঙ্গে সঙ্গে মারের প্রথম নমুনা পড়ল চটাস করে পমির গণ্ডদেশের উপরে।

পমি গালে হাত বুলোতে বুলোতে কাতরস্বরে বললে, "আমার পোশাক চুরি গিয়েছে!"

—"ডাহা মিথ্যে কথা!"

—"সত্যি বলছি খুড়িমা, চোরে আমার সব নিয়ে পালিয়েছে!"

—"চুপ কর মিথ্যুক! আমি আর তোর খুড়িমা নই! যে কুলাঙ্গার ছেলে আমার মুখে চুনকালি মাখাতে চায়, তার সঙ্গে আর আমার কোন সম্পর্ক নেই!"

বিন্দু বললে, "আহা, চোরে যদি চুরি করে, ও-বেচারীর দোষ কী?"

চোখ পাকিয়ে বিন্দুর দিকে তাকিয়ে মোক্ষদা কাঁক-কাঁক করে বললেন, "থাম, থাম! তুই আর মুখনাড়া দিসনে বিন্দি!" তারপর আবার পমির দিকে ফিরে বললেন, "আমার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে! ভেবেছিলুম জীবনের শেষ-কটা দিন শান্তিতে কাটাব, তা তোর মতন হতচ্ছাড়া এ-সংসারে থাকলে আমার সে-আশাতেও পড়বে ছাই! তোকে যে-শাস্তি দেওয়া উচিত দয়া করে তা আর দিলুম না, কিন্তু এ-বাড়িতে আর তোর ঠাঁই নেই। আজ রাতটা তুই কয়লার ঘরে বন্ধ থাকবি, তারপর কাল সকালে তোকে একেবারে শহর থেকে দূর করে দেব!"

বিন্দু প্রতিবাদ জানিয়ে বলতে গেল, "সে কি মা—"

মুখ-ঝামটা দিয়ে মোক্ষদা বলে উঠলেন, "বিন্দি, ফের কথা কইছিস্? কি করলে ও-ছোঁড়ার স্বভাব সুধরোবে তোর চেয়ে তা আমি ভালো

জানি। আমার বাপের বাড়ির দেশ থেকে নিমাই এসেছে। দেশে নিমাইয়ের অনেক ক্ষেত-খামার আছে, পমি তারই সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। যেমন ওর চাষাড়ে-বুদ্ধি, ও চাষ-বাসই করতে শিখুক। শহরে থাকলে ও একেবারে গোল্লায় যাবে। নিমাই কাল সকালেই দেশে ফিরবে, পমিও যাবে তার সঙ্গে।"

পমি ম্রিয়মান মুখে বললে, "কিন্তু—"

মোক্ষদা বাধা দিয়ে বললেন, "চোপরাও! তোর কোন মিছে কথাই আর শুনতে চাই না! চল তুই আমার সঙ্গে।" বলেই তিনি পমির কান চেপে ধরলেন।

বিন্দু বললে, "ওকে তুমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছ মা? বেচারা আজ সকাল থেকে একটা কুটো পর্যন্ত মুখে দেয়নি!"

মোক্ষদা বিন্দুর কথার কোনো জবাব দেওয়ারও দরকার মনে করলেন না। তিনি পমির কান ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে তাকে নিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

কয়লার ঘরটা হচ্ছে চওড়ায় আড়াই হাত আর লম্বায় তিন হাত। সেখানে বাড়ির কয়লা জমা করে রাখা হত। তার জানলা ছিল না, একটা মাত্র দরজা ছিল। কয়লার গাদার ভিতরে পমিকে নিক্ষেপ করে মোক্ষদা দরজাটা বন্ধ করে দিলেন সশব্দে।

সকাল বেলা। নিমাইয়ের সঙ্গে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে পমি বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়াল।

মোক্ষদার পায়ের ধুলো নিয়ে পমি কাঁদো-কাঁদো মুখে বললে, "তাহলে আসি খুড়িমা?"

মোক্ষদা প্রথমটা কঠিন মুখে চুপ করে রইলেন। তারপর নীরস স্বরে বললেন, "এসো।......যেদিন আবার ভালো ছেলে হবে, সেদিন আবার তোমাকে এখানে ঠাঁই দেব, কিন্তু তার আগে নয়। বংশের গৌরব হবার জন্যে প্রত্যেক ছেলের চেষ্টা করা উচিত। মন দিয়ে কাজকর্ম

শেখো, মানুষের মতন মানুষ হও।"

বারবার এক-কথা শুনে শুনে এতক্ষণে পমিরও বিশ্বাস হল নিশ্চয়ই সে ভালো ছেলে নয়, নিশ্চয়ই সে বংশের কলঙ্ক! তার প্রতি কঠোর হয়ে খুড়িমা কিছুই অন্যায় করেন নি।

সে কাঁচুমাচু মুখে বললে, "খুড়িমা, আমায় মাপ কর!"

—"কাজকর্ম শিখে মানুষ না হলে তোমাকে আমি মাপ করব না!"

—"খুড়িমা, তুমি যদি আমায় মাপ কর, তাহলে আজ থেকেই আমি ভালো ছেলে হব।"

—"ও! তুমি ভেবেছ খোসামোদ করে আমার মন ফেরাবে? না, আমার যে কথা সেই কাজ! শাস্তি না দিলে তুমি মানুষ হবে না! নিমাই, একে নিয়ে যাও।"

পমি আবার মোক্ষদার পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, "খুড়িমা তুমি কি আমাকে একটা চুমুও খাবে না?"

—"চুমু! বুড়ো ছেলেকে চুমু খাব কিরে! যা, যা, আর জ্বালাস নে!"

নিমাই এদিকে এসে পমির হাত ধরে অগ্রসর হল। পমি যেতে যেতে ফিরে কাঁদতে কাঁদতে বললে, "বিন্দু আমি তাহলে আসি? বিন্দু, তুমি আমাকে চিঠি লিখো।"

বিন্দুর মুখ দিয়ে কোন কথা ফুটল না, তার গলা দিয়ে বেরুলো খালি একটা ঘড়-ঘড় শব্দ। তারপর সে আঁচলের খুঁট দিয়ে মুছতে লাগল নিজের চোখের জল।

যেতে যেতে পমি করুণ চোখে চারিদিকে তাকাতে লাগল। বাড়ির সমস্ত দরজা-জানলা, উঠোনের বকুল গাছটি, রান্নাঘরের সামনে বসে মেনি বিড়ালটি, ছাদের কার্নিশে বসে গোলাপায়রাগুলি, সবাই যেন এক-সঙ্গে বলতে লাগল, "বিদায় পমি! বিদায় পমি! বিদায় পমি!" বুকের ভিতর থেকে পমির প্রাণও যেন উত্তরে বললে, "বিদায় ভাই, বিদায়, বিদায়!"

পথে বেরিয়ে স্টেশনের দিকে যেতে নিমাই শুধোল, "পমি তোমার

বয়স কত ?"

—"ছয় কি সাত।"

—"তুমি কার ছেলে ?"

—"আমি আমার মায়ের ছেলে।"

ছুই ভুরু কপালে তুলে নিমাই বললে, "সত্যি নাকি! তুমি কতদূর গুণতে জানো ?"

—"এক হাজার পর্যন্ত।"

—"খাসা! আমাকে একবার গুণে শোনাও দিকি।"

—"এক, ছুই, তিন, চার, আট, দশ, পঁচিশ, আটত্রিশ—"

নিমাই বাধা দিয়ে বললে, "থাক, বুঝেছি! তুমি ইস্কুলে গিয়েছিলে!"

—"হু!"

—"বল দেখি মোহরের সঙ্গে গিনির তফাৎ কি ?"

পমি খানিক ভাবলে, তারপর বললে, "মোহর হচ্ছে মোহর, আর যা দিয়ে গয়না গড়া হয় গিনি হচ্ছে তাই!"

নিমাই চমকে বললে, "বাঃ! আচ্ছা, বল দেখি, তরমুজ ফলে কিসে?"

এ-রকম সব প্রশ্ন পমিকে আগে কেউ কখনো করেনি। সে থতমত খেয়ে প্রকাশ্যেই ভাবতে লাগল, "আমগাছে ফলে আম, জামগাছে ফলে জাম, আলুগাছে ফলে আলু, আর তরমুজ গাছে ফলে তরমুজ।"

নিমাই হতাশভাবে বললে, "হে ভগবান, মোক্ষদা-ঠাকুরুণ এ কাকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন ? ওহে ছোকরা, তুমি যে গাধার বাচ্ছার চেয়েও বোকা! তুমি বলছ, তরমুজ-গাছে ফলে তরমুজ, না ? তরমুজ যে ঘাসের ডগায় ফলে না, এটা তুমি ঠিক জানো তো ?"

পমি বললে, "ঘাসের ডগায় ফোটে, ঘেসো ফুল। সেখানে তরমুজ ফলবে কেন ?"

—"সেই কথাই তো তোমায় আমি জিজ্ঞাসা করছি ?"

—"তরমুজ গাছ হচ্ছে এক-রকম গাছ।"

—"বাহবা কি বাহবা! তরমুজ গাছ হচ্ছে এক-রকম গাছ! বেশ,

এবার রোদ উঠলে তুমি তার ছায়ায় গিয়ে বসে থেকো। হ্যাঁ, তোমার বিশ্বাস, আলু-গাছে ফলে আলু? ঠিক বলেছ! কিন্তু কি করে আলু-গুলো পাড়তে হয় বল দেখি?"

—"কেন, গাছের ওপরে চড়ে।"

নিমাই হা হা হা হা করে হেসে গড়িয়ে পড়ল। তারপর অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বললে, "যাক্, তোমাকে আর প্রশ্ন করা মিছে। গাড়ির সময় উৎরে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি পা চালাও।"

স্টেশনের কাছে এসে পমি বললে, "আমাকে কি কাল থেকেই ক্ষেতের কাজ শিখতে হবে?"

নিমাই নাক বেঁকিয়ে বললে, "ক্ষেতের কাজ? বিষ্ণু, বিষ্ণু! তুমি হচ্ছ একটি আস্ত গরু! তোমাকে দেব গরু চরাবার ভার!"

অষ্টম

পমির কপাল খারাপ

দিন-কয় পরে পমি গরু চরাবারই ভার পেলে।

পমি বললে, "নিমাইবাবু, আপনি আমাকে জুতো দিলেন না, আমি খালি-পায়ে হাঁটব কেমন করে?"

নিমাই বললে, "এটা শহর নয়, পাড়া-গাঁ। রাখাল ছেলেরা জুতো পরে না।"

পমির উপরে পড়ল দশটা গরুর ভার। তাদের শিংগুলোর দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে সে বললে, "ওরা যদি আমাকে গুঁতিয়ে দেয়!"

—"ওদের কাছে গেলেই ওরা তোমাকেও গরু বলে চিনতে পারবে। গুঁতিয়ে দেবে না।"

নাচারভাবে পমি পাচন-বাড়ি হাতে নিয়ে গরুদের কাছে গিয়ে

দাঁড়াল। গরুরা চিরদিনই রাখাল-বালকদের দ্বারা চালিত হয়। কাজেই পমিকে দেখে বিস্ময় বা বিরাগ প্রকাশ করলে না।

নিমাই বললে, "সাবধান, আমার গরু যেন হারায় না। একটা গরু হারালেই এখানে আর তোমার ঠাই নেই। এখন যাও।"

পমি গরুর পাল নিয়ে অগ্রসর হল।

শহুরে ছেলে সে, পল্লীগ্রাম লাগল তার নতুন। কি চমৎকার রৌদ্র-রঞ্জিত দৃশ্য! নীলাকাশ মিলিয়ে গিয়েছে তেপান্তরের শেষে, ধূ-ধূ প্রান্তর মিলিয়ে গিয়েছে নীলাকাশের কোলে। এখানে কূলে-কূলে ভরা দিঘি, ওখানে রোদে চিকমিকে নদী, কোথাও সবুজ মুকুট-পরা বড় বড় গাছের সভা, কোথাও অজানা বনফুলে ভরা ছোট ছোট ঝোপঝাড়! দিকে-দিকে নব নব রূপ, গাছে গাছে অচেনা পাখিদের গান, পদে পদে কত যে বিস্ময়!

পমির চোখ জুড়িয়ে গেল, মন হল মুগ্ধ। পল্লীগ্রাম যে এত সুন্দর তা সে জানত না।

এক জায়গায় প্রায় একশো ফুট উঁচু পাহাড়ের মতন প্রকাণ্ড একটা ঢিপি। স্থানীয় লোকেরা সেটাকে "রাজারগড়" বলে ডাকত। হয়তো সুদূর অতীতে সেটা সত্যসত্যই ছিল কোন রাজার কেল্লা। এখন সেটা মৃত্তিকা-স্তূপে পরিণত হয়েছে এবং তার উপরে গজিয়েছে ঘাস ও জঙ্গল।

স্তূপের ঢালু গা বেয়ে গরুগুলো উপরে উঠছে দেখে পমিও তাদের সঙ্গে সঙ্গে উপরে উঠতে লাগল। ছোট্ট মানুষ, ছোট্ট-ছোট্ট হাত-পা! শেষ পর্যন্ত পমি যখন টঙে উঠে দাঁড়াল, তখন রীতিমত হাঁপাচ্ছে।

আরে গেল, গরুগুলো যে আবার স্তূপের ওধারকার ঢালু বেয়ে নীচের দিকে নামতে সুরু করলে।

পমির আর দম নেই। সে দুপা ছড়িয়ে বসে পড়ে হাঁপ ছাড়তে ছাড়তে দেখতে লাগল, স্তূপের নীচে ওধারে রয়েছে গভীর জঙ্গল। তার মনে হল, ঐরকম কোন গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়েই রূপকথার রাজ-কুমার ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়েছিল রক্ষোপুরীর বন্দিনী রাজকন্যার খোঁজে।

গরুগুলো যখন স্তূপের মাঝ-বরাবর নেমে গিয়েছে, পমি আবার উঠে দাঁড়াতে বাধ্য হল। তারপর সেও যেই নীচের দিকে পা বাড়িয়েছে অমনি তার পায়ে পট করে কি ফুটে গেল! আর্তনাদ করার সঙ্গে-সঙ্গেই টাল সামলাতে না পেরে সে খেলে এক আছাড় এবং তারপর গড়াতে গড়াতে নামতে লাগল নীচের দিকে।

গরুগুলো সচমকে ঊর্ধ্বমুখে তাকিয়ে দেখলে, তাদের রাখাল এক অদ্ভুত উপায়ে উপর থেকে নেমে আসছে! এমনভাবে আর কোন রাখালকে তারা স্তূপ থেকে নামতে দেখে নি। মহা ভয়ে গরুগুলো ল্যাজ তুলে যে যেদিকে পারলে চম্পট দিলে।

গড়াতে গড়াতে পমি যখন ভাবছে তার জীবনের শেষ দিন উপস্থিত, হঠাৎ সে ঝুপ করে পড়ে স্থির হয়ে রইল এক জায়গায় গিয়ে। তার একটুও চোট লাগল না।

স্তূপের নীচে ছিল প্রায় জলশূন্য কাদায়-ভরা একটা ডোবা। সৌভাগ্যক্রমে পমির দেহ গিয়ে পড়েছে তারই ভিতরে, নইলে তার গতর নিশ্চয় চূর্ণ হয়ে যেত।

পমি প্রথমটা চোখ মেলে দেখতে লাগল খালি হাজার-হাজার সর্ষে-ফুল। তারপর সে অনেক কষ্টে ডোবার ভিতর থেকে উপরে শুকনো মাটিতে উঠে এসে বসল। তারপর চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে, কোথাও একটা গরুর চিহ্ন পর্যন্ত নেই! ভয়ে তার বুক ঢিপ করে উঠল। একটা-দুটো নয়, দশ-দশটা গরু যদি হারিয়ে যায়, তাহলে নিমাইয়ের হাতে তার যে নাকালের আর শেষ থাকবে না।

তাড়াতাড়ি গায়ের কাদা ঝেড়ে ও চেঁছে ফেলে সে উঠে পড়ে আবার গরুর সন্ধানে ছুটল।

কিন্তু কোথায় পথ? এ-জায়গাটা একেবারে পোড়ো, এদিকে কোন লোক আসে না। তবে কি গরুগুলো ঐ জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে ঢুকেছে? ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে পমি নিজের মনেই বললে, "দেখা যাক্!"

সে অরণ্যের ভিতর গিয়ে ঢুকল। প্রথম খানিকটা বনের ঝোপঝাপ ও গাছপালা পরস্পরের কাছ থেকে তফাতে তফাতে ছিল, কিন্তু পমি যতই ভিতরে ঢোকে, জঙ্গল ততই নিবিড় হয়ে ওঠে। খানিকক্ষণ পরে সে মুখ তুলে দেখলে অরণ্য এমন ঘন হয়ে উঠেছে যে, মাথার উপরে আকাশও দেখা যায় না। তখন ভয় পেয়ে আবার ফেরবার চেষ্টা করলে। কিন্তু কোন দিক দিয়ে যে এসেছে, সেটা আর আন্দাজ করতে পারলে না। যেদিকেই যায়, সামনে পায় কাঁটাভরা ঝোপঝাপ আর মাথার উপরে নিবিড় সবুজ পাতার জগৎ। সেখানে আলোও নেই অন্ধকারও নেই, সেখানে বাস করে যেন চিরস্থায়ী সন্ধ্যা!

ঠিক যেন গোলক-ধাঁধায় পড়ে পমি চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল—সে বাইরের দিকে যাচ্ছে, না, জঙ্গলের আরো ভিতর দিকে যাচ্ছে তাও বুঝতে পারলে না। কাঁটা-ঝোপে তার জামা-কাপড় গেল ছিঁড়েখুঁড়ে ও সর্বাঙ্গ গেল ক্ষতবিক্ষত হয়ে। এইভাবে পমি যে কতক্ষণ পাগলের মতন ঘুরে বেড়ালে, তা সে নিজেই আন্দাজ করতে পারলে না। কেবল এইটুকু বুঝলে যে, জঙ্গলের ভিতরে সন্ধ্যার আবছায়া ক্রমেই অন্ধকারে পরিণত হচ্ছে।

তারপরেই শুনতে পেলে অনেক—অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে চার-পাঁচটা শাঁখের আওয়াজ! কোন গ্রামে শাঁখ বাজছে। তাহলে জঙ্গলের বাইরেও নেমে এসেছে সন্ধ্যা?

পমির বুকটা ছাঁৎ করে উঠল! সর্বনাশ, আজ রাত্রে তাকে জঙ্গলের মধ্যেই বন্দী হয়ে থাকতে হবে নাকি? এই গহন বন, দিনেও যেখানে অন্ধকারের বাসা, রাত্রে না-জানি সেখানে জেগে উঠবে আরো কতই বিভীষিকা! হয়তো এখানে বাঘ আছে, সাপ আছে, আর আছে না-জানি কত ভূত-পেত্নীর দল, রাত্রে এইখানে থাকলে সে কি আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে? এরই মধ্যে দিকে-দিকে বেজে উঠেছে ঝিঁঝিঁদের কণ্ঠস্বর—যেন আঁধার-দানবেরা শিষ দিচ্ছে! গাছের পাতায়-পাতায় শোনা যাচ্ছে যেন কাদের ফিসফিস করে কথা! হঠাৎ আচম্বিতে পমির

দেহে রোমাঞ্চ জাগিয়ে কোন গাছের টঙ থেকে ককিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিলে অনেকগুলো খোকাখুকি। পমির দৃঢ়বিশ্বাস হল, রাত হবার সঙ্গে-সঙ্গেই ভূত-পেত্নীদের খোকাখুকি জেগে উঠে খাবারের জন্যে কান্না জুড়ে দিয়েছে! পমি এর আগে কখনো পাড়াগাঁয়ে আসেনি, সে জানে না, বকেদের ছানাগুলো যখন চ্যাঁচায় তখন মনে হয় যেন মানুষের শিশুরা কেঁদে কেঁদে উঠছে।

পমি সেইখানেই কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল, তার চোখ দিয়ে পড়তে লাগল ঝর-ঝর করে জল। কাঁদতে কাঁদতে দুই হাত জোড় করে কাতর-কণ্ঠে বললে, "হে ভগবান, হে ভগবান, আমি তোমার পমি। আমার মা নেই, বাপ নেই, আমার খুড়িমাও কাছে নেই! এখন তুমি ছাড়া আমাকে কে দেখবে, হে ভগবান? আমাকে দয়া কর, আমাকে পথ দেখাও, আমাকে ভূত-পেত্নীর হাত থেকে তুমি উদ্ধার কর।"

এইভাবে ভগবানকে ডাকতে ডাকতে হঠাৎ পমির চোখে পড়ল অনেক দূরে টিম-টিম করে একটা আলো জ্বলছে। সেই আলোটা দেখেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে আর কোন দিকে না তাকিয়ে পমি সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। তার মনে হল, ভগবানের দয়ায় বন-জঙ্গল যেন দুই দিকে সরে গিয়ে তার জন্যে পথ করে দিলে।

অন্ধকারে পমি এতক্ষণ বুঝতে পারেনি, যেখানে বসে সে ভগবানের কাছে আবেদন জানাচ্ছিল সেটা হচ্ছে অরণ্যের একটা প্রান্ত। বনের একটা দিক সেইখানে শেষ হয়েছে, তারপরেই একটা মাঝারি-আকারের মাঠ এবং সেই মাঠের ওপারে কোন গৃহস্থের ঘরে জ্বলছে একটি দীপের শিখা। সেই দীপশিখাই আজ পমির প্রাণ বাঁচালে, কারণ বনের ভিতরে রাত কাটাতে হলে নিশ্চয় সে আজ ভয়েই মারা পড়ত।

আলোটা লক্ষ্য করে পমি মাঠের উপর দিয়ে যতটা তাড়াতাড়ি পারে হাঁটতে লাগল।

কিন্তু যেখানে আলো জ্বলছে সেখান পর্যন্ত তাকে আর যেতে হল না। হঠাৎ মাঝ-পথেই ঘটল আর এক আশ্চর্য ঘটনা!

মধুমতী রাজার মেয়ে

সেদিন ছিল প্রতিপদ। মাঠ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ আলোর আভাস অনুভব করে, পূর্বদিকে মুখ ফিরিয়ে পমি দেখলে একটা গাছের ফাঁক দিয়ে চাঁদ উঁকিঝুঁকি মারছে। চাঁদকে দেখে সে আরো আশ্বস্ত হল।

কিন্তু তখনি আর-একটা শব্দ তার কানে গেল। কোথা থেকে খুব কচি শিশুর গলায় কে যেন করুণ সুরে কাঁদছে!

পমির বুক আবার ঢিপ ঢিপ করে উঠল! এখানেও শিশুর কান্না? ভূত-পেত্নীদের ক্ষুধার্ত ছেলেমেয়েগুলো কি গাছ থেকে নেমে এসে তার পিছু ধরতে চায়? সে থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে কান পেতে শুনতে লাগল।

কিন্তু না, এ-কান্না শুনে তো ভয় হয় না, এ যে সত্য-সত্যই মানুষ-শিশুর গলা! অন্ধকারে তার মতন পথ ভুলে আরো কোন শিশু কি এইখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে?

পমি আবার শুনলে, কে যেন আধো আধো ভাষায় কাঁদতে কাঁদতে বলছে, "চাঁদেল বুলী, চাঁদেল বুলী, আমাকে বালীতে নিয়ে দাও।"

পমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আন্দাজ করবার চেষ্টা করলে, আওয়াজটা আসছে কোনখান থেকে? চাঁদের মুখ ক্রমেই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে এবং অন্ধকার হয়ে আসছে ক্রমেই পাতলা। মাঠের মাঝে মাঝে রয়েছে গাছ-পালা এবং মাঝে মাঝে রয়েছে ছোট-বড় ঝোপ।

আবার কচি-গলায় কেঁদে বললে, "চাঁদেল বুলী, আমায় বালী নিয়ে দাও!"

পমি বুঝলে, শিশু বলছে—"চাঁদের বুড়ি, আমায় বাড়ি নিয়ে যাও!"

এবার আন্দাজে ধরলে, শব্দটা আসছে কোন দিক থেকে। সে পূর্বদিকের একটা ঝোপ লক্ষ্য করে পায়ে পায়ে এগুতে লাগল।

ঝোপের ওপাশে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে দেখলে, একটি এতটুকু ফুটফুটে মেয়ে ঘাসজমির উপরে বসে সামনের দিকে দুই হাতে ভর দিয়ে চাঁদের দিকে চেয়ে আছে! যেন বনদেবীর কন্যা! এ এক অপ্রত্যাশিত বিস্ময়! এই রাতে এই গহনবনের ছায়ায়, নিরালা মাঠের বিজনতার মধ্যে যে এমন একটি খুকির দেখা পাওয়া যেতে পারে, এটা কল্পনাতেও আনা যায় না। পমি মিনিট-দশেক অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ছয়-সাত বছর বয়সের ছেলের পক্ষে পমির দেহ ছিল মাথায় বেশ খাটো। কিন্তু তারও তুলনায় এ-মেয়েটিকে দেখতে ছোট, কত ছোট! যেন জুঁইফুলের একটি পাপড়ি! একটি টুকটুকে লাল জামা প্রায় তার পা পর্যন্ত ঢেকে রেখেছে, এলানো চুলগুলির উপরে একটি লাল ফিতার 'বো', দুই পায়েও ছোট্ট দু-পাটি লাল-জুতো। গলায় ও হাতে চাঁদের আলোয় চক-চক করছে সোনার হার, সোনার চুড়ী।

তাকে দেখলেই বুঝতে দেরি লাগে না যে, সে বড়-ঘরের মেয়ে। তার বয়স কত হবে? চার? না, তিন? কিন্তু সে একলা এমন অসময়ে এ-জায়গায় এল কেমন করে?

মেয়েটি হঠাৎ পমিকে দেখতে পেলে। সঙ্গে সঙ্গে সে তখনি উঠে দাঁড়িয়ে তার কাছে ছুটে এল—উড়ে এল যেন একটি রঙিন প্রজাপতি! সে পমির পানে তাকালে এবং পমি তাকালে তার মুখের পানে। নীরবতার মধ্যে কেটে গেল এক মিনিট। দুজনের চোখে মধুর বিস্ময়ের আভাস!

মেয়েটি সুধোলে, "তুমি কি চাঁদেল বুলীল থেলে?"

প্রথমটা পমি বুঝতে পারলে না। তারপর একটু ভেবে বুঝলে, মেয়েটি জানতে চাইছে সে চাঁদের বুড়ীর ছেলে কিনা?

মুখ টিপে হেসে বললে, "না, আমি চাঁদের বুড়ির ছেলে নই। তুমি কে?"

মেয়েটি টেনে টেনে বললে, "আমি ম-ওহুমতী।"

—"তুমি মধুমতী? বাঃ, বেশ নাম!"

—"আমাল বাবা লাজা।"

—"তোমার বাবা, রাজা?"

—"হুঁ।"

—"তুমি এখানে কেন?"

—"পালিয়ে এথেথি।"

—"পালিয়ে এসেছ? একলা?"

—"হুঁ।"

—"কেন?"

—"চাঁদেল বুলীকে দেকতে।"

—"কাঁদছিলে কেন?"

—"চাঁদেল বুলী নেই। আমি বালী দাবো।"

—"তোমার বাড়ি কোথায়?"

খুব জোরে মাথা-নাড়া দিয়ে মধুমতী বললে, "দানিনা!"

—"জানোনা তো বাড়ি ফিরবে কেমন করে?"

ননীর মতন নরম হাতে পমির একখানি হাত ধরে মধুমতী গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে বললে, "তুমি নিয়ে দাবে!"

পমি মনে মনে হেসে ভাবলে, আমি নিজেই পথ ভুলে বাসার খোঁজ পাচ্ছি না, আর তুমি আমাকেই বলছ কিনা তোমার বাড়ি খুঁজে দিতে!

এতক্ষণ পরে মধুমতীর খেয়াল হল, পমিরও নামটা জিজ্ঞাসা করা উচিত! সে শুধোলে, "তোমাল নাম কি?"

—"পমি।"

এ নাম মধুমতীর পছন্দ হল না। সে ঘাড় নেড়ে বললে, "না, তুমি থুপী!"

—"আমার নাম পমি।"

—"উঁ, তুমি থুপী!"

পম্মি বুঝলে, প্রতিবাদ এখানে অচল। বললে, "বেশ, তাই সই। চল, তোমাকে বাড়িতে নিয়ে যাই।"

দুজনে হাত ধরাধরি করে অগ্রসর হল।

মধুমতী হঠাৎ বললে, "দান দাও!"

—"কি?"

—"দান দাও!"

—"বুঝতে পারছি না!"

মধুমতী এ-কথাকে ওজর বলেই গ্রাহ্য করলে না। মাটিতে পা ঠুকে অধীর স্বরে সে আবার বললে, "দান দাও!"

—"ও, গান গাইতে বলছ বুঝি! কিন্তু আমি গান জানি না যে!"

মধুমতী এবারে রেগে ঠোঁট ফুলিয়ে বললে, "দান দাও, দান দাও।"

ফাঁপরে পড়ে ভাবতে ভাবতে পম্মির হঠাৎ মনে পড়ে গেল বিন্দুর মুখে শোনা একটি গান। সে গাইলে,

এক যে ছিল কেলে বেড়াল
মুখখানা তার হাঁড়িপানা,
রান্নাঘরে লুকিয়ে ঢুকে
চুরি করে খায় সে খানা।
ম্যাও-তান তার শুনে হঠাৎ
কুত্তা জিমির মেজাজ চটাৎ,
ক্যাঁক করে সে কামড়ে দিলে,
অমনি হুলোর চোখটা কানা।"

মধুমতীর পছন্দ হল না। বললে, "থাই দান!"

—"ছাই গান? কিন্তু আমি যে আর গান জানি না!"

কিন্তু সেজন্যে মধুমতীর আর মাথাব্যাথা নেই, তার মন ছুটেছে অন্যদিকে। সে হঠাৎ বললে, "পুল, পুল!"

—"অ্যাঃ?"

পুতুলের মতন একরত্তি হাতখানি তুলে একদিকে বাড়িয়ে সে বললে,

"ঐ পুল পুতেচে। আমায় পুল দাও।"

ধবধবে জ্যোৎস্নায় একদিকে চেয়ে পমি দেখলে, বাতাসে দুলছে নয়নতারা-ফুলের ঝোপ। মধুমতীর মন রাখবার জন্যে সে অনেকগুলো ফুল তুলে এনে তার হাতে সমর্পণ করলে।

ঘ্রাণ নিয়ে ভুরু কুঁচকে মধুমতী মতপ্রকাশ করলে, "দন্দ নেই।"

—"নয়নতারা-ফুলে তো গন্ধ থাকে না!"

—"ছোৎ!" বলে মধুমতী ফুলগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলে, তারপরেই আবার বললে, "থুপী!"

—"বল!"

—"আমি খাবাল খাবো!"

মনে মনে প্রমাদ গুণে পমি বললে, "খাবার? এখানে তো খাবার পাওয়া যায় না দিদি!"

কিন্তু কে বোঝে সে কথা? "খাবাল খাবো, খাবাল খাবো" বলে বায়না ধরে মধুমতী প্রথমে বসে, তারপর মাঠের উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। তারপর ক্রমাগত দুই পা ছোঁড়ে আর বলে, "খাবাল খাবো, খাবাল খাবো!"

পমি বললে, "লক্ষ্মী মেয়ে, ওঠ তো! বাড়ি গিয়ে খাবার খাবে!"

—"উঁ-উঁ-উঁ-উঁ, আমি বালী দাবো না, আমি খাবাল খাবো!" তারপর সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না ধরলে।

নাচারের মতন মধুমতীর পাশে বসে পড়ে পমি তার কান্না শুনতে লাগল। আর ভাবতে লাগল, রাজার মেয়ে মধুমতীকেও খাবারের জন্যে কাঁদতে হয়! তারও খুব ক্ষুধা পেয়েছিল, কিন্তু মধুমতীর কাতরতা দেখে সে নিজের কথা ভুলে গেল।

কেঁদে কেঁদে শেষটা মধুমতী ঘুমিয়ে পড়ল।

উপরে, নীচে চারিদিকে বয়ে যাচ্ছে তখন জ্যোৎস্নার হীরার ধারা। কিন্তু সে সৌন্দর্য দেখবার ও বোঝবার মতন অবস্থা পমির ছিল না। কারণ রাত যত বাড়ছে, তত ঠাণ্ডা হচ্ছে শীতের হাওয়া।

কন্-কন্-কন্-কন্। শীত ছুঁড়ছে বরফের তীর!

থর্-থর্-থর্-থর্! কেঁপে কেঁপে উঠছে পমির বুকের ভিতরটা পর্যন্ত! তার হাত-পা ক্রমে অসাড় হয়ে এল।

পমি বুঝলে, এমন চুপ করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে শীত বাড়বে বৈ কমবে না। চাঙ্গা হবার জন্যে সে তখন উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিকে খুব খানিকটা ছুটোছুটি করে নিলে।

হ্যাঁ, এতক্ষণ পরে দেহের রক্ত যেন কতকটা গরম হয়ে উঠল। পমি আবার একটু ধাতস্থ হয়ে মধুমতীর পাশে এসে বসল।

মধুমতী ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও আবার উঁ-উঁ-উঁ-উঁ করে কাঁদতে কাঁদতে ঠক্-ঠক্ করে কাঁপছে! তারও খুব শীত করছে নিশ্চয়!

পমির মন ভরে উঠল সমবেদনায়। নিজের মনে-মনেই সে বললে, "আহা রে, রাজার মেয়ে, শোয়া অভ্যাস সোনার খাটে, পালকের বিছানায় দামী শাল-দোশালা গায়ে দিয়ে, এই হাড়-কাঁপানো শীতে, এই কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায়, এই শিশিরে-স্যাৎসেতে মাটিতে একটিমাত্র জামা পরে সে ঘুমোতে পারবে কেন? কিন্তু উপায় কি, উপায় কি?"

মধুমতীর ঘুম ভেঙে গেল, সে আবার উঠে বসে কাঁপতে কাঁপতে কান্না-ভরা গলায় ডাকলে, "থুপী, অ থুপী!"

—"কি মধুমতী?"

—"আমাল, থিত করতে!"

—"শীত করছে? ঘুমিয়ে পড়, আর শীত করবে না!"

—"ওগো মাগো, ওগো মাগো!" মধুমতীর কান্না ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগল।

কি যে করবে কিছুই ভেবে না পেয়ে পমি হতাশ ভাবে ফ্যাল ফ্যাল করে চারিদিকে তাকাতে লাগল। কোনদিনই সে পড়েনি এমন বিপদে!

চাঁদ উঠেছে আরো উঁচুতে। শিশিরে স্নান করে বাতাস হয়ে উঠেছে আরো ঠাণ্ডা। গানের পাখিরা এখন গান ভুলে যায়। জেগে জেগে চ্যাচায় প্যাঁচার দল, ডানা ঝটপটিয়ে সাড়া দেয় বাদুড়েরা, আর মাঝে

মাঝে ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া বলে খবরদারি করে শেয়ালের পাল।

ওখানে ঐ মস্ত-বড় স্তূপটা কিসের ?

ধবধবে চাঁদের আলোয় খানিকক্ষণ ধরে ভালো করে দেখে পমি বুঝতে পারলে, ও হচ্ছে খড়ের গাদা, চাষীরা ওখানে রাশি রাশি খড় সাজিয়ে রেখে গিয়েছে।

লোকে বলে, ডুবন্ত লোক ভাসন্ত খড়কুটো পেলেও সাগ্রহে চেপে ধরে। বিপদগ্রস্ত পমি খড়কুটোর বদলে পেলে একেবারে মস্ত খড়ের গাদা! এ যেন হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পাওয়া!

সে পরম আহ্লাদে বলে উঠল, "ওঠ মধুমতী, আমার সঙ্গে চল!"

মধুমতী ওঠে না, খালি কাঁদে।

পমি তখন হাত ধরে তাকে দাঁড় করিয়ে দিলে। তারপর সে মধুমতীর হাত ধরেই সেই স্তূপীকৃত খড়ের দিকে পায়ে-পায়ে এগিয়ে চলল।

সে যখন খড়ের স্তূপের খুব কাছে এসে পড়েছে, হঠাৎ গাদার ভিতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল একটা মূর্তি!

চাঁদের আলোতেও স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছিল না মূর্তিটাকে কিন্তু মনে হল, মানুষেরই মূর্তি বটে, তবু ঠিক যেন মানুষের মতন নয়! এই জঙ্গলভরা মাঠে, এই শীতার্ত নিঝুম রাতে কোন মানুষের আবির্ভাব কি সম্ভবপর ?

মূর্তির মুখখানা কাফ্রীর মুখের চেয়েও কালো! আর সেই মিশকালো মুখে জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলছে দুটো ক্রুদ্ধ ও বিশ্রী চক্ষু এবং সার-বাঁধা বিকট, ভয়াবহ ও হিংস্র দাঁতগুলো!

পমি গল্পে ভূতের কথা শুনেছে এবং রাত্রিবেলায় নিজেদের ঘরেই সে খাটের ধারে পা ঝুলিয়ে বসতে পারে না—পাছে খাটের তলা থেকে কোন মাংসহীন কঙ্কাল অস্থি-বাহু বাড়িয়ে তার পা দুটো ধরে হিড় হিড় করে টেনে নেয়!

এই কি সেই ভূত ?

পমির সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, তার হাড়ে-হাড়ে জাগল

বিষম ঠকঠকানি—এবারে শীতে নয়, আতঙ্কে! মধুমতীও তীক্ষ্ণ স্বরে কেঁদে উঠে তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলে প্রাণপণে!

মূর্তিটা মস্ত মস্ত গোটাকয় লাফ মেরে খড়ের স্তূপের উপরে উঠে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল তার সুদীর্ঘ এক লাঙ্গুল।

ওটা একটা হনুমান। শীতে বোধহয় খানিকটা গরম হবার জন্যেই খড়ের গাদার ভিতরে এসে আশ্রয় নিয়েছিল, এখন মনুষ্য-জাতীয় খোকা-খুকির অভাবিত আবির্ভাব দেখে বিরক্ত হয়ে দিলে লম্বা।

পমি অশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। সে মধুমতীকে নিয়ে খড়ের স্তূপের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কতকগুলো খড়ের আঁটি টেনে টেনে বার করে তৈরি করলে বেশ একটি গুহার মতন জায়গা। তারপর সে মধুমতীকে নিয়ে তার ভিতরে গিয়ে ঢুকল এবং একটু পরেই দেহ তপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভেঙে গেল দুষ্ট শীতের রক্ত-জল করা বিষ-দাঁত!

দেখতে দেখতে আবার ঘুমিয়ে পড়ল মধুমতী।

সারাদিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর পমিরও চোখের পাতা ঘুমে ভরে এল। গুটিসুটি মেরে সেও মধুমতীর পাশে শুয়ে পড়ল, তারপর ধীরে ধীরে মুদে গেল তার চোখ দুটি।

বাহির থেকে তাদের উপরে পাহারা দিতে লাগল নীলাকাশের চাঁদ এবং তাদের কাছে-কাছেই জেগে দুলতে লাগল ছোট-ছোট ঘাসের ফুল।

দশম

মুড়ি খেতে বড় ভাল লাগে

প্রখর আলোকে পমির ঘুম গেল ভেঙে। চোখ মেলে দেখে, আকাশে চাঁদ নেই, পূর্বদিকে সূর্যের রাঙা মুখ।

তাড়াতাড়ি সে উঠে বসতে গেল, কিন্তু দেখলে মধুমতী তাকে দুই হাত জড়িয়ে ধরে এখনো ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। মধুমতীর ফোটা ফুলের মতন তাজা, মিষ্টি মুখখানি দেখে তার প্রাণের ভিতরটা স্নেহে আর মায়ায় দুলে দুলে উঠল!

পাছে তার ঘুম ভেঙে যায় সেই ভয়ে পমি আর উঠতে পারলে না, একেবারে স্থির ও আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে রইল। কাছেই একটি গাছের ডালে বসে বুলবুলি গাইছিল কোন্ তেপান্তরের, কোন্ বন-বনান্তের কোন্ ফুলন্ত গোলাপী স্বপ্নের গান! পমি চুপ করে শুয়ে তাই শুনতে শুনতে শীতকে ভোলবার চেষ্টা করতে লাগল।

তারপর ভাঙল রাজকন্যার ঘুম! পমি তাকে নিয়ে খড়ের গাদার বাইরে এসে বসল।

মোমের মতন নরম ক্ষুদে ক্ষুদে হাত দুখানি মুঠো করে নিজের চোখের পাতা রগড়ে দৃষ্টি মেলে সে খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল বিপুল বিস্ময়ে। মাথার উপর প্রাসাদের ছাদ নেই, তার বদলে রয়েছে এই নীলাম্বর, এটা বোধহয় ছিল তার ধারণাতীত। মিহি সুরে হতভম্বের মতন সে ডাকলে, "মা, ও-মা, মা!"

পমি আস্তে-আস্তে ডাকলে, "মধুমতী, এখানে তোমার তো মা নেই!"

ধড়মড় করে উঠে বসে মধুমতী কেঁদে ফেলে বললে, "মা কোতায়?"

—"মা আছেন বাড়িতে।"

—"আমি বালী দাবো!"

পমি উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "চল মধুমতী, তোমাকে বাড়িতে দিয়ে আসি।"

মধুমতীও উঠে দাঁড়াতে গেল, কিন্তু পারলে না। কখনো তো তার অপথে-বিপথে এমন ভাবে হাঁটাহাঁটির অভ্যাস নেই, কালকের পরিশ্রমেই তার কচি কচি পা-দুখানি একেবারে টাটিয়ে উঠেছে। সে করুণ স্বরে বললে, "আমি তলতে পারব না!"

—"চলতে পারবে না? তবে এস দিদি, আমি তোমাকে কোলে করে নিয়ে যাই।"

পমির কোলে উঠে মধুমতী দুই হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরলে। পমি তাকে কোলে করে নিয়ে যাবে বললে বটে, কিন্তু মধুমতীর চেয়ে বড় হলেও সেও একরত্তি শিশু বৈ তো নয়! মধুমতীর ভারে একদিকে হেলে পড়ে টলমলে পায়ে খানিক দূর এগিয়ে গিয়েই পমি বুঝতে পারলে যে, সে কি দুর্বহ ভার গ্রহণ করেছে। তার জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়তে লাগল, দম বেরিয়ে যায় আর কি!

সে নিশ্চয়ই আর বেশিদূর যেতে পারত না। এমন সময় দৈব হল তার সহায়।

মাঠের উপর দিয়ে এক-কোঁচড় মুড়ি নিয়ে খেতে খেতে যাচ্ছিল একটি চাষার মতন লোক।

তাকে দেখে পমি দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে, "হ্যাঁ মশাই, এখানে রাজবাড়িতে যাবার পথ আছে কোথায় দেখিয়ে দিতে পারেন?"

লোকটি প্রথমে অবাক হয়ে দুই শিশুর মুখের পানে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। এই বিজন মাঠে এমন দুটি সুকুমার দেবশিশু দেখবার আশা বোধহয় সে করে নি। তারপর জানালে, পথ খুব কাছেই আছে, সে দেখিয়ে দিতে পারে।

মধুমতী কান্নাভরা গলায় বলে উঠল, "আমি খাবাল খাবো। আমি মুলি খাবো!"

লোকটি একগাল হেসে বললে, "খুকুরানী, তুমি মুড়ি খাবে? এই নাও! খোকাবাবু, তুমিও দুমুঠো মুড়ি নাও! তোমরা বসে বসে খাও, আমি এইখানেই দাঁড়িয়ে আছি।"

পমির কোল থেকে নেমে পড়ে মধুমতী আঁচলের বদলে জামা পেতেই মুড়িগুলো নিলে। তারপর খুব তাড়াতাড়ি সব মুড়ি খেয়ে ফেলে সে বলে উঠল, "আলো মুলি খাবো!"

পমি বললে, "ছি মধুমতী, চেয়ে খেতে নেই!"

লোকটি হাসতে হাসতে বললে, "না খুকুরানী, তুমি যত পারো খাও। এই নাও। খোকাবাবু, তুমিও আর দুটো মুড়ি নেবে নাকি ?"

কালকের অনাহারের পর এই মুড়িগুলোকে বোধ হচ্ছিল অমৃতের মতন। আর কখনো মুড়িকে এত মিষ্টি লাগেনি! পমির মন তখন আরো কাঁড়ি কাঁড়ি মুড়ি চাইছে, কিন্তু লজ্জায় মুখ ফুটে সে কিছু বলতে পারলে না।

লোকটি বললে, "ও, লজ্জা হচ্ছে বুঝি ? লজ্জা কি, এই নাও।"

তাদের আহার-পর্ব সমাপ্ত হল। পমি বললে, "এইবারে আমাদের পথটা দেখিয়ে দেবেন ?"

লোকটি বললে, "দেব বৈকি! এসো খুকুরানী, তোমাকে কোলে করে নিয়ে যাই।"

মিনিট ছয়-সাত পরেই তারা একটা পথের ধারে এসে পড়ল। তারপর মধুমতীকে কোল থেকে নামিয়ে লোকটি বললে, "কেমন খোকা-বাবু, এইবারে বাড়ি যেতে পারবে তো ?"

পমি বললে, "পারব।"

লোকটি চলে গেল। সে অদৃশ্য হয়ে যাবার পর পমির মনে হল, মস্ত ভুল করে ফেলেছে। ঐ লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলে হয়তো জানতে পারা যেত, মধুমতীদের রাজবাড়ি কোন্ দিক দিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু আর সে ভুল শোধরাবার কোন উপায় নেই। মধুমতীকে নিয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পমি ভাবতে লাগল, এখন তারা কোনদিকে যাবে ? ডান-দিকে না বাঁ-দিকে ? এমন সময়ে দেখা গেল, একখানি ছাউনি-দেওয়া খালি গরুর গাড়ি বাঁ-দিক থেকে এসে ডান-দিকে যাচ্ছে।

পমি চেঁচিয়ে বলে উঠল, "ও গাড়োয়ান-ভাই, ও গাড়োয়ান-ভাই! রাজবাড়ি কোন্ দিকে বলতে পারো ভাই ?"

গাড়োয়ান বললে, "আমি তো সেইদিকেই যাচ্ছি খোকাবাবু!"

পমি মিনতি-ভরা কণ্ঠে বললে, "গাড়োয়ান-ভাই, আমাদের পায়ে বড় ব্যথা হয়েছে, আমরা আর হাঁটতে পারছি না! তোমার গাড়িতে

আমাদের তুলে নেবে ?"

মধুমতী ও পমির সুন্দর দু-খানি কচি মুখ দেখে গাড়োয়ানের প্রাণে বোধহয় দয়ার সঞ্চার হল। সে গাড়ি থামিয়ে নীচে নেমে পড়ে বললে, "এসো খুকি, এসো খোকা, তোমাদের গাড়িতে উঠিয়ে দি।"

তাদের গাড়ীতে তুলে নিয়ে নিজেও যথাস্থানে বসে গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করলে, "তোমরা কোথায় যাবে ?"

পমি বললে, "রাজবাড়িতে।"

গাড়োয়ানের চোখে-মুখে ফুটল বিস্ময়ের চিহ্ন। কিন্তু মুখে কিছু না বলে সে আবার গাড়ি চালাতে শুরু করলে।

গরুর গাড়ি যখন রাজবাড়ির দেউড়ীর ভিতরে ঢুকছে, তখন চারিদিকে উঠল বিপুল বিস্ময়ের কোলাহল! চারিদিক থেকে ছুটে এল দাস-দাসী, দারোয়ান এবং আরো কত লোক। সকলেরই মুখে এক কথা, "রাজকুমারী এসেছে। রাজকুমারী এসেছে! রাজকুমারী এসেছে!"

তারই জন্যে যে এই গোলমালের উৎপত্তি, এটা বুঝতে পেরে মধুমতীর আনন্দের আর সীমা রইল না। নিজের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ভুলে গরুর গাড়ির উপরেই সে নাচতে নাচতে খিলখিল করে হাসতে শুরু করলে।

ইতিমধ্যে খবর পেয়ে স্বয়ং রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ রায় ও রানী ললিতাসুন্দরী প্রাসাদের ভিতর থেকে দ্রুতপদে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

রানী দুখানি ব্যগ্র বাহু বাড়াতেই মধুমতী মায়ের বুকের ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আনন্দের আবেগে রানীর চোখ দিয়ে দর দর ধারায় অশ্রু ঝরতে লাগল!

রাজা বললেন, "চল রানী, আগে ভিতরে চল, তারপর মধুর মুখে সব কথা শুনব।"

ছাউনির ভিতরে চুপ করে বসে বসে পমি সব দেখতে ও শুনতে লাগল, কিন্তু তার দিকে কেউ ফিরেও চাইলে না। আর কোনদিন মধুমতীর দেখা পাবে না বুঝে তার প্রাণটা কেমন হু-হু করে উঠল।

মেয়েকে কোলে নিয়ে রানী কয়েক পদ অগ্রসর হয়েছেন, এমন সময় মধুমতী ব্যাকুল স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, "থুপী! থুপী! আমাল থুপী কোতায় ?"

রাজা আশ্চর্য হয়ে বললেন, "থুপী ? থুপী আবার কে মধু ?"

মধুমতী আঙুল তুলে গরুর গাড়িটা দেখিয়ে দিলে, তারপর আবার চিৎকার করে ডাকলে, "থুপী !"

ছাউনির ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে পমি বললে, "কি মধুমতী ?"

মধুমতী তার আধো-আধো ভাষায় যা বললে তার অর্থ হচ্ছে এই, থুপীকে তার চাইই চাই! থুপীকে এখনি গাড়ি থেকে নেমে তার সঙ্গে বাড়ির ভিতরে আসতে হবে ! নইলে সেও বাড়িতে যাবে না।

এই একটিমাত্র মেয়ে ছাড়া রাজার আর-কোন সন্তান নেই। কাজেই মধুমতীর সমস্ত আবদার ও হুকুম সর্বদাই তাঁকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনতে হত।

রাজা গরুর গাড়ির কাছে এগিয়ে এসে বললেন, "তুমিই থুপী ?"

পমি গম্ভীর ভাবে বললে, "না, আমার নাম পমি।"

—"তবে থুপী কে ?"

—"আমাকে ও-নাম দিয়েছে মধুমতী।"

রাজা হো হো করে হেসে উঠে বললেন, "মধুমতীর থুপী, তাহলে তুমিও গাড়ি থেকে নেমে আমাদের সঙ্গে বাড়ির ভিতরে চল !"

পমির মুখে সমস্ত কথা শুনে রাজা বললেন, "পমিবাবু, তুমি না থাকলে হয়তো আমার মধুকে আর ফিরিয়ে পেতুম না। মধুমতীকে হয়তো চোরে চুরি করে নিয়ে যেত, নয়তো কোন পাষণ্ড গয়নার লোভে তাকে খুন করে ফেলত। তুমিই তাকে রক্ষা করেছ। তোমার এ উপকার আমি জীবনে ভুলব না। কিন্তু তুমি কে বল দেখি ?"

পমি তখন নিজের জীবন-কাহিনী রাজার কাছে বর্ণনা করলে—একেবারে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত। সে-কাহিনীর ভিতর থেকে মোক্ষদা,

যদুবাবু, বিন্দু, বনমালা—এমন কি নিমাই পর্যন্ত কেউ বাদ পড়ল না।

পমির দুর্ভাগ্যের ইতিহাস শুনে দয়ালু রাজার বুকটা ভরে উঠল দরদে। একটু ভেবে তিনি বললেন, "পমিবাবু, আমার ইচ্ছা, মধুর খেলার সাথী হয়ে তুমি রাজবাড়িতেই থাকো। আমিও তোমাকে ছেলের মতন দেখব। কিন্তু মোক্ষদা দেবী হচ্ছেন তোমার অভিভাবিকা। তাঁর মত না নিয়ে আমি কিছুই করতে পারি না। আপাতত দিন-কয় তুমি এখানেই থাকো। তারপর তোমাকে নিয়ে আমি নিজে মোক্ষদা দেবীর কাছে যাবো। দেখি, তিনি আমার মতে মত দেন কি না।"

একাদশ

মোক্ষদার মন এই প্রথম নরম হল

সেদিন সকালে উপরের ছাদের ধারে দাঁড়িয়ে বিন্দু যখন ফুলগাছে জল দিচ্ছিল, হঠাৎ দেখতে পেলে একখানা মস্ত বড় মোটর-গাড়ি—এত বড় গাড়ি সে আর কখনো দেখেনি—তাদেরই সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বিন্দু তো দস্তুরমতন হতভম্ব! মোক্ষদার বাড়ির সামনে মোটরগাড়ি কেউ কোনদিন দেখেনি।

তারপরই শোনা গেল জোরে কড়া নাড়ার শব্দ। মোক্ষদা নিজের ঘর থেকে বাজের মতন চেঁচিয়ে বললেন, "বিন্দি! ওলো অ বিন্দি! বলি, কানের মাথা খেয়েছিস নাকি? কে কড়া নাড়ছে শুনতে পাচ্ছিস না?"

মোক্ষদার মধুর কণ্ঠস্বর শুনে বিন্দুর হতভম্ব ভাবটা কেটে গেল। সে নেমে তার ঘরে ঢুকে বললে, "আমাদের বাড়িতে মস্ত একখানা হাওয়া গাড়িতে চড়ে কে এসেছে! সেইই কড়া নাড়ছে।"

মোক্ষদা অবিশ্বাসের স্বরে বললেন, "বাজে বকিস নে, পাগল

হয়েছিস নাকি ?"

—"আচ্ছা, কে পাগল, তা এখন বোঝা যাবে।" এই বলে বিন্দু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মোক্ষদা উঠে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন, সত্যিই তাঁর সদরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড একখানা মোটর গাড়ি। এ যে অভাবিত ব্যাপার! মোক্ষদা অত্যন্ত বিপদগ্রস্তের মতন উত্তেজিত হয়ে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

বিন্দু ফিরে এসে বললে, "একটি ভদ্রলোক এসেছেন। তিনি তোমাকে এই কাগজখানা দিলেন।"

বিন্দুর হাত থেকে ছোট একখানা কাগজ নিয়ে মোক্ষদা পড়ে দেখলেন।

"রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ রায় একটি বিশেষ দরকারে শ্রীমতী মোক্ষদা দেবীর সঙ্গে দেখা করতে চান।"

কাগজখানা পাঠ করে মোক্ষদার মাথা বন বন করে ঘুরতে লাগল। মোক্ষদা বুঝতে পারলেন না যে, তিনি পায়ের উপর না মাথার উপরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ রায়! কি সৌভাগ্য, কি সর্বনাশ! আমার বাড়িতে রাজা-রাজড়া! আমার সঙ্গে দেখা করতে চান রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ রায়?

মোক্ষদা ধপাস করে মাটির উপরে বসে পড়ে হাপরের মতন হাঁপাতে লাগলেন। বিন্দু ভয়ে চমকে বলে উঠল, "কি হল গিন্নী-মা, কি হল ?"

মোক্ষদা বললেন, "ওরে বিন্দি, আমার বাড়িতে এসেছেন কোন দেশের রাজা! আমি কি করব রে বিন্দি! কি পরে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াব? যা, যা, দৌড়ে চিরুনী আরশি সাবান নিয়ে আয়! শীগগির একখানা ভালো দেখে কাপড় এনে দে! বেশিক্ষণ বসে থাকলে রাজা বাহাদুর আবার চটে যাবেন। ওরে বিন্দি, এ আমার কি হল রে, আমি হাসব কি কাঁদব বুঝতে পারছি না যে রে—যা, যা, শীগগির যা রে বিন্দি পোড়ামুখী!"

মিনিট পাঁচ সাত পরে পোশাক বদলে মোক্ষদা কাঁপতে কাঁপতে নীচের বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকে ভূমিষ্ঠ হয়ে রাজা বাহাদুরকে প্রণাম করলেন।

রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ অল্প-কথার মানুষ। তিনি প্রথমেই বললেন, "মোক্ষদা দেবী, আপনিই তো পমির খুড়িমা?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, রাজা-মশাই।"

—"আমি যদি পমিকে মানুষ করবার ভার নি, তাহলে আপনার কিছু আপত্তি আছে কি?"

মোক্ষদা অতিশয় বিস্মিত হয়ে বললেন, "আপনি নেবেন পমির ভার!"

—"হ্যাঁ মোক্ষদা দেবী, তাকে আমি নিজের ছেলের মতন দেখব।"

মোক্ষদার দুই চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। তাঁর মাথা আবার ঘুরতে আরম্ভ করলে। তিনি কথা কইতে পারলেন না।

—"বলুন মোক্ষদা দেবী, আপনার মত কি?"

—"আমার আবার মত কি রাজা-মশাই? এ যে আমার মস্ত সৌভাগ্য!"

—"ধন্যবাদ মোক্ষদা দেবী, আপনার মত পেয়ে সুখী হলুম। হ্যাঁ, আর এক কথা, পমিবাবুর ইচ্ছা, বনমালাও তার সঙ্গে থাকে। আপনি কি বলেন?"

ঠিক যেন আকাশ থেকে পড়ে মোক্ষদা বললেন, "বনমালা!"

—"হ্যাঁ, সেই ছোট্ট মেয়েটি!"

বিন্দু এতক্ষণ দরজার কাছে মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে ছিল।

সেইখান থেকেই সে বললে, "রাজাবাবু, বনমালাকে আমার বোনের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি। হুকুম পেলেই তাকে আমি নিয়ে আসব। আমার বোন এই পাড়াতেই থাকে।"

রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ বললেন, "হ্যাঁ, তাকে এখনি নিয়ে এস। বনমালা আমার সঙ্গেই যাবে।"

বিন্দু অদৃশ্য হল। কিন্তু মোক্ষদার মনে হতে লাগল, তিনি যেন

এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখছেন। বনমালা কে? রাজা বাহাদুর তাকে নিয়ে যেতে চান কেন? আর বিন্দুই বা তাকে চিনলে কেমন করে? এ-সব কী!

কিন্তু এ-সবের কোন উত্তর পাবার আগেই রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ আবার বললেন, "মোক্ষদা দেবী, পমি আমার গাড়িতেই আছে। আপনি কি তাকে দেখবেন?"

মোক্ষদা বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ রাজা-মশাই!"

একটু পরেই পমি এসে মোক্ষদাকে প্রণাম করে তাঁর পায়ের ধুলো নিলে।

মোক্ষদা বললেন, "দেখ পমি, আমি তোমাকে বাইরে পাঠিয়েছিলুম বলেই আজ তোমার অদৃষ্ট ফিরে গেল।"

—"এবার থেকে ভালো হবার জন্য চেষ্টা কোরো। রাজামশাইকে দেবতার মতন ভক্তি কোরো।"

—"হ্যাঁ, খুড়িমা।"

রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "চল পমিবাবু, এইবারে আমরা গাড়িতে গিয়ে বসিগে।"

রাজার সঙ্গে পমি সদর পর্যন্ত গিয়েছে, এমন সময় বনমালাকে নিয়ে বিন্দু এসে হাজির। বনমালার দেহখানি এখনো তেমনি ছিপছিপে আছে বটে, কিন্তু সে ফিরে পেয়েছে তার শ্রী। তার মাথার চুলগুলি হয়েছে চিকন, ডাগর চোখ-দুটি হয়েছে উজ্জ্বল, গায়ের রং হয়েছে তাজা ও সুন্দর। তাকে দেখলেই ভালোবাসতে আর আদর করতে সাধ হয়।

আনন্দ-ভরে তার হাত ধরে পমি বললে, "বনমালা।"

বনমালা লাজুক হাসি হেসে বললে, "পমি!"

গাড়ির ভিতরে বসেছিল মধুমতী। সে ঝরণার মতন কলস্বরে হেসে উঠে দুটি হাত নেড়ে নেড়ে ডাকতে লাগল পমি আর বনমালাকে।

রাজা বললেন, "চল পমিবাবু, চল বনমালা, মধু তোমাদের ডাকছে।"

পমি আবার মোক্ষদার পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে,

"বিন্দু, তাহলে আমি আসি?"

চোখের জল ঢাকবার জন্যে বিন্দু নিজের মুখে আঁচল চাপা দিলে।

পমি ও বনমালা গাড়িতে উঠে মধুমতীর দুই পাশে গিয়ে বসল। মোক্ষদা বললেন, "মনে রেখো পমি, ভদ্রলোকের ছেলের উচিত—"

ভদ্রলোকের ছেলের পক্ষে যে উচিত কি, পমি তা শোনবার আগেই গাড়ি ছেড়ে দিলে।

গাড়ি যখন একটু এগিয়েছে পমি তখন ফিরে দেখলে, মোক্ষদা কাঠের মূর্তির মতন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এবং তাঁর পিছনে দেখা যাচ্ছে বিন্দুকে। সে তখনো মুখ ঢেকে কাঁদছে।

ভগবানের চাবুক

প্রথম অধ্যায়

গোড়াপত্তন

আফগানিস্থানের উত্তরে তুর্কীস্থান। সেইখানে আছে সমরখন্দ নগর। এই সমরখন্দ কেবল প্রাচীন গৌরবের জন্যে নয়—আর এক কারণেও হতে পারে চিরস্মরণীয়।

পৃথিবীতে তিনজন দিগ্বিজয়ীর তুলনা নেই। খ্রীস্ট-পূর্বাব্দের আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট, ত্রয়োদশ শতাব্দীর চেঙ্গীজ খাঁ ও চতুর্দশ শতাব্দীর তৈমুর লং।

জুলিয়াস সিজার, হানিবল ও নেপোলিয়ন প্রভৃতিও প্রথম শ্রেণীর দিগ্বিজয়ী বটে, কিন্তু পূর্বোক্ত তিন বীরের কীর্তিকলাপ তাদের চেয়ে ঢের বেশি অসাধারণ ও বিস্ময়কর।

আলেকজাণ্ডার, চেঙ্গীজ ও তৈমুর—এই তিনজনের সঙ্গেই সমরখন্দ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে পেরেছিল এবং ঐ তিন দিগ্বিজয়ীই সমরখন্দ থেকে যাত্রা করেছিলেন ভারতবর্ষের দিকে। বেশ বোঝা যায়, সেকালে সোনার ভারতে পদার্পণ করতে না পারলে কেহই নিজের দিগ্বিজয়-কাব্য সম্পূর্ণ হল বলে মনে করতেন না।

আর কেবল সেকালেই বা বলি কেন সর্বকালেই ভারত দিগ্বিজয়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নেপোলিয়নও আসতে চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের দিকে। এ যুগের হিটলারও তাই চেয়েছিলেন, জাপানীদেরও প্রাণের সাধ তাই ছিল। দিগ্বিজয়ীদের ভারত-লুণ্ঠনের পথ সর্বাগ্রে খুলে দিয়েছিলেন বোধ হয় পারস্য-সম্রাট প্রথম দরায়ুস।

কিছু-কম ছয়শত বৎসর আগে এক মহাবীর বসেছিলেন সমরখন্দের

সিংহাসনে ; কিন্তু কেবল সেই ক্ষুদ্র সিংহাসনে তাঁর স্থান সংকুলান হল না, তিনি চাইলেন পৃথিবীর রাজতক্ত। পৃথিবীপতি হবার জন্যে তিনি বার বার রণক্ষেত্রে ছুটে গেলেন এবং প্রত্যেক বারই ফিরে এলেন রক্তাক্ত বিজয়ী রূপে ! তাঁর সাম্রাজ্যের দুই সীমানা হল ইউরোপের মস্কো এবং ভারতের দিল্লি !

স্পেন, ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের রাজারা তাঁর মন রাখবার ও তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে নিরাপদ হবার জন্যে দূত ও নানা উপঢৌকন পাঠাতে লাগলেন। তিনি সে-সব রাজাকে নগণ্য মনে করে খাপ থেকে তরোয়াল খুললেন না, তাঁদের আশ্বাস দিয়ে বললেন, "ভয় নেই, সমুদ্রে খালি বড় মাছই থাকে না, ছোট মাছরাও থাকে।"

মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি স্তিমিত দৃষ্টি তুলে দেখলেন, পৃথিবীতে তখনো তাঁর যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী আছে মাত্র একজন—মহাচীনের অধিপতি! এটা তাঁর সহ্য হল না- উনসত্তর বৎসর বয়সে তরবারি হাতে নিয়ে ধরলেন তিনি চীনের পথ। কিন্তু চীনের ছিল বরাত জোর—'ভগবানের চাবুক' ফিরিয়ে নিলেন ভগবান্ স্বয়ং।

এই বিচিত্র দিগ্বিজয়ীকে ইতিহাস তৈমুর লং বলে জানে। এঁরই বংশধর বাবর ভারতে এসে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন মোগল-রাজবংশ।

তৈমুরের বংশধরদের মোগল বলা হয় বটে, কিন্তু এখানে একটু গোলমাল আছে। উত্তর-এশিয়া থেকে যুগে যুগে যাযাবর-জাতীয় যেসব যোদ্ধা পঙ্গপালের মতন ভারতে, চীনদেশে, পারস্যে ও ইউরোপের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, কোন নির্দিষ্ট নামে তাদের পরিচিত করা সহজ নয়। গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস তাদের ডেকেছেন, 'সিথিয়ান' বলে, রোমানরা তাদের 'হুন' নামে ডেকেছে এবং চীনারা ডেকেছে 'হিউয়াং-নু' (Hiung-nu) নামে। চেঙ্গীজ খাঁ যখন ঐ যাযাবরদের এনে এক পতাকার তলায় দাঁড় করান, তখন তাদের মধ্যে ছিল মাঞ্চু, তাতার, মোগল প্রভৃতি বহু জাতির লোক। পরে চেঙ্গীজের মোগল-

সাম্রাজ্যের মধ্যে গণ্য হয়ে ঐ নানাজাতির লোককে এক 'মোগল' নামেই ডাকা হত। আসলে তৈমুরকে কেউ বলেন তাতার, কেউ বলেন তুর্কী।

সমরখন্দ নগরের কাছে ওকগাছের অরণ্য। তারপর এক গিরিসঙ্কট—দুই দিকে তার ছয়শত ফুট উঁচু লাল বালি-পাথরের দেওয়াল। স্থানীয় লোকেরা 'লৌহ-দ্বার' বলে ডাকে এবং এর ভিতর দিয়ে দুটির বেশি উট পাশাপাশি যেতে পারে না। এখানে বর্শা-দণ্ডের উপরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দেয় রৌদ্রদগ্ধ তামাটে বর্ণের দীর্ঘদেহ প্রহরীরা।

এই পথ দিয়ে খানিকদূর অগ্রসর হলে একটি পাহাড়ে-ঘেরা তরু-শ্যামল ক্ষেত্রের উপরে এসে পড়া যায়। সেখানে আছে একটি নগর, নাম তার 'সবুজ শহর'। তার চারিদিকে খাল কাটা। কাবুলী ডুমুর ও খুবানী গাছের সারির উপরে দেখা যায় সাদা সাদা গুম্বজ বা মসজিদের বুরুজ।

১৩৩৫ (মতান্তরে ১৩৩৬) খ্রীস্টাব্দে এই সবুজ শহরে তৈমুরের জন্ম।

যাত্রীর দল আসে আর চলে যায় সবুজ শহরের ভিতর দিয়ে—মুখে তাদের সর্বদাই যুদ্ধের গল্প। এই গল্প শুনতে শুনতে তৈমুর বেড়ে উঠতে লাগলেন। তৈমুর মাতৃহারা হন অল্প বয়সেই। তাঁর বাবা ছিলেন বার্লাস গোষ্ঠীর তাতার জাতীয় সর্দার, কিন্তু কোন গ্রাম বা দুর্গ তাঁর দখলে ছিল না। তাঁর নাম তারাগাই। তিনি সংসারে উদাসীন ব্যক্তি, সর্বদাই তীর্থ-ভ্রমণ ও ধর্মকর্ম নিয়ে ব্যস্ত। টাকাকড়ি তাঁর ছিলও না, টাকা রোজ-গারের চেষ্টাও তিনি করতেন না।

তৈমুর বাজপাখি, কুকুর আর সমবয়সী সঙ্গীদের নিয়ে পথে পথে খেলা করে বেড়ান। পথ দিয়ে চলে যায় দলে দলে পারসী, আরবী, ইহুদী ও হিন্দু সওদাগর কেউ ঘোড়ায় চড়ে, কেউ উটের পিঠে, কেউ পদব্রজে,—পণ্য তাদের কিংখাব, রেশম বা কার্পেট। তাদের দলে গিয়ে ভিড়ে তৈমুর বাইরের জগতের খবর শোনেন।

তারাগাই বলেন, "বাছা তৈমুর, এই পৃথিবীটা হচ্ছে সাপ আর বিছা-ভরা সোনার পাত্রের মতন। এর প্রতি আমার কোন মায়া নেই।"

এ-সব কথা তৈমুরের মনকে স্পর্শ করে না।

তিনি ভালোবাসেন দাবা ও পোলো খেলতে এবং বনে বনে শিকার করতে। অল্পস্বল্প কোরান মুখস্থ করেছিলেন, কিন্তু লেখাপড়া খুব বেশি শেখেন নি। তিনি জানতেন তাতারদের ধর্ম হচ্ছে যুদ্ধ করা, তাদের আভিজাত্য হচ্ছে তরবারির আভিজাত্য।

সবুজ শহরের বার্লাস তাতাররা তখনও নিজেদের অতীতকে ভোলে নি। চেঙ্গীজ খাঁ তাদের চোখ ফুটিয়ে দিয়ে গেছেন। তাতাররা জানে একদিন তারা পৃথিবী জয় করেছিল।

তাদের মধ্যে যাদের শহরের মধ্যে বাড়ি আছে, তারাও বাস করে তাঁবুর ভিতরে। আজও তারা যাযাবর ধর্ম ছাড়তে পারে নি; বলে, "কাপুরুষরাই দুর্গ তৈরি করে লুকোবার জন্য।"

তাদের আজানুলম্বিত বাহু, মোটামোটা দেহের হাড়, দাড়ি-গোঁপ ভরা মুখ—তারা সাধ্যমত চেষ্টা করে, ঘোড়ার পিঠ ছেড়ে যাতে না মাটিতে নামতে হয়। যখন পায়ে হাঁটে, চলে নবাবী চালে এবং কারুকে দেখে ফিরে বা সরে দাঁড়ায় না।

পদব্রজে তারা বাঘ শিকার করতে যায় এবং লড়ায়ে যায় হাসতে হাসতে। তাদের দলে এমন লোক খুব কম, যাদের দেহে নেই অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন। তাদের মধ্যে এমন লোকও খুব কম, ছাদের তলায় বিছানায় শুয়ে বরণ করে যারা মৃত্যুকে। ডোরা-কাটা রেশমী জামার তলায় পরে তারা ইস্পাতের বর্ম। যুদ্ধের সুযোগ না পেলে তারা সুখী হয় না। একদিকে তারা যেমন মুক্তহস্ত ও অতিথিপরায়ণ, অন্যদিকে তেমনি গোঁয়ার ও নিষ্ঠুর।

বাবার মুখে তৈমুর শুনলেন, "বৎস, চেঙ্গীজ খাঁ যখন পৃথিবী জয় করলেন, তখন তাঁর ছেলে চাগাতাই পেলেন আমাদের এ-অঞ্চলের শাসন-ভার। কিন্তু আজ চাগাতাইয়ের বংশধর বিলাসের স্রোতে হাবুডুবু খাচ্ছেন আর রাজ্যের সর্বেসর্বা হয়েছেন তাঁর আমীর কাজগান।"

আমীর কাজগানের নাম সকলের মুখে মুখে। তাতাররা দলে দলে যায় কাজগানের ফৌজে ভর্তি হবার জন্যে।

তৈমুর এখন প্রথম যৌবনে পা দিয়েছেন। এই বয়সেই তাঁর দেহ হয়ে উঠেছে যেমন সুন্দর ও সুগঠিত তেমনি বৃহৎ ও বলিষ্ঠ। তীক্ষ্ণনেত্র, কঠিন-চরিত্র। তিনি কথা কন কম, তাঁর কণ্ঠস্বর সুগম্ভীর ও মর্মভেদী। হাসি-ঠাট্টার ধারও মাড়ান না!

কোন বলবান তাতার-যুবকও যে-ধনুকের ছিলা মাত্র বুক পর্যন্ত টানতে পারে, তৈমুর সেই ধনুকের ছিলা আকর্ষণ করেন কান পর্যন্ত। তরবারি-ক্রীড়ায় তাঁর জুড়ী মেলা ভার।

পুত্রের ভাবভঙ্গি-ব্যবহারে যোদ্ধার পূর্ণ-লক্ষণ দেখে পিতা তারাগাই ছেলেকে পরামর্শ দিলেন, আমীর কাজগানের সভায় যাবার জন্যে। পিতার পরামর্শের মধ্যে ভাগ্যদেবীর আহ্বান শুনে তৈমুর রাজসভার দিকে যাত্রা করলেন!

তাঁর জীবনের আসল অ্যাডভেঞ্চার আরম্ভ হল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভাগ্যচক্র

সমরখন্দ। তৈমুর এখন আমীর কাজগানের সভাসদ।

বিশ্বজয়ী চেঙ্গীজ খাঁর বংশধররা দুর্বল হয়ে পড়তেই আমীর কাজগান মাথা তুলে দাঁড়ান; কিন্তু কাজগান বুঝেছিলেন, তাঁর দেহে রাজরক্ত নেই বলে কেউ তাঁকে রাজা বলে মানতে চাইবে না। কাজেই তিনি চেঙ্গীজের এক শান্তশিষ্ট আমোদপ্রিয় বংশধরকে লোক-দেখানো রাজা সাজিয়ে রাজকার্য পরিচালনা করেন নিজের হাতেই।

তৈমুরের দেহে রাজরক্ত নেই বটে, কিন্তু তিনি বার্লাস গোষ্ঠীর সর্দারের ছেলে। কাজেই আমীর কাজগান সাগ্রহে তাঁকে আশ্রয় দিলেন। তৈমুরও নিজের সাহস, বুদ্ধি ও বীরত্বের পরিচয় দিতে দেরি করলেন না।

এমন কি দু-একটা ছোটখাটো যুদ্ধও জিতে ফেললেন।

রাজসভায় যে-সব তাতারের 'বীর' বলে খ্যাতি ছিল যুদ্ধযাত্রাকে যারা শোভাযাত্রা বলে মনে করত, লোকে তাদের ডাকত 'বাহাদুর' নামে। আমীর কাজগান লক্ষ্য করলেন, তৈমুর বয়সে তরুণ বটে, কিন্তু বাহাদুর-দের দলে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তির সীমা নেই। তিনি বুঝলেন, তৈমুর হচ্ছেন অসাধারণ যুবক, তাঁর ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল।

কিছুদিন যেতে না-যেতেই তৈমুর আমীরের সামনে গিয়ে আবেদন জানালেন, "আমি বার্লাস গোষ্ঠীর সর্দারের পদ প্রার্থনা করি।"

আমীর কাজগান তৈমুরের এই ব্যস্ততা পছন্দ করলেন না; বললেন, "অপেক্ষা কর। যথাসময়েই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।"

আরো কিছুদিন যায়। আমীরের এক পরমা সুন্দরী দৌহিত্রী ছিলেন, নাম তাঁর আলজাই খাতুন আগা। তিনি এক রাজার মেয়ে।

আমীর বললেন, "আলজাই হবে তৈমুরের বউ।"

তৈমুরও তাঁকে দেখেছিলেন, কারণ সে-সময়ে তাতার মুসলমানদের মেয়েরা পর্দার আড়ালে বাস করতেন না। তীর্থযাত্রায় ঘোড়ায় চড়ে তাঁরা হতেন পুরুষদের সঙ্গিনী। তাতার নারীরা জানতেন, দিগ্বিজয়ীদের বংশে তাঁদের জন্ম—বন্ধুর পথের সমস্ত বিপদ অগ্রাহ্য করবার শক্তি তাঁদের আছে।

আলজাইয়ের বয়স পনেরো বৎসর। ঐতিহাসিকেরা বলেছেন, নতুন চাঁদের মতন ছিল তাঁর রূপ আর তাঁর দেহ ছিল তরুণ লতার মতন!

তৈমুরের সঙ্গে আলজাইয়ের বিবাহ হয়ে গেল; এবং এই বিবাহের ফলে তৈমুরের সম্মান যে বেড়ে উঠল, সে-কথা বলা বাহুল্য। তিনি রাজকন্যার স্বামী ও শক্তিমান কাজগানের নাত-জামাই!

বউ নিয়ে তৈমুর মহাসমারোহে সবুজ শহরে ফিরে এলেন। ভালো ভালো দামী জিনিস দিয়ে সাজালেন নিজের মস্ত বাড়ি। কুড়ি থেকে চব্বিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তৈমুরের জীবন কেটে গেল সুখ-স্বপ্নের মতন। তাঁদের একটি ছেলেও হল, তৈমুর তার নাম রাখলেন, জাহাঙ্গীর।

তৈমুর এখন একজন ছোটখাটো সেনাপতি, তাঁর হুকুম মানে এক-হাজার সৈন্য। সমরখন্দের পশ্চিমে মরুভূমিতে গিয়ে তৈমুর নতুন নতুন যুদ্ধ জয় করলেন। সমরখন্দের দক্ষিণে পাহাড়ের পর পাহাড়ের উপত্যকা এবং সেখানে আছে বিখ্যাত হিরাট শহর। হিরাটের মালিক ছিলেন কাজগানের শত্রু। তৈমুর সেখানে গিয়ে লড়াই করে হিরাটের মালিককে বন্দী করে আনলেন।

কিন্তু তৈমুরের সৌভাগ্য-সূর্য যখন ঊর্ধ্বমুখে, তখন ঘটল এক দুর্ঘটনা।

একদিন আমীর কাজগান শিকার করতে গিয়ে আর ফিরে এলেন না। দুইজন বিদ্রোহী সর্দার ধনুকের তীর ছুঁড়ে তাঁকে হত্যা করলে।

খবর পেয়ে তৈমুর ঘটনাস্থলে ছুটে গেলেন। প্রথমে আমীরের সমাধির ব্যবস্থা করলেন, তারপর আবার সদলবলে নিয়ে ছুটলেন হত্যাকারীদের পিছনে।

হত্যাকারী সর্দাররা প্রাণের ভয়ে আমু নদী পার হয়ে দুর্গম পাহাড়ে গিয়ে উঠল; কিন্তু সেখানে গিয়েও নিস্তার নেই—তৈমুরের কঠোর প্রতিজ্ঞা, হত্যাকারীদের হত্যা না করে তিনি আর দেশে ফিরবেন না। এ-পাহাড়ে, ও-পাহাড়ে—তারা যায় যেখানে, তৈমুরও হাজির হন সেখানে, ছায়া যেন অনুসরণ করছে পলাতক কায়াকে! তারপর চারিধার থেকে তাদের পালাবার পথ বন্ধ করে তৈমুর গিয়ে দাঁড়ালেন দুই হত্যাকারীর সম্মুখে। বিদ্যুতের মতন জ্বলে শূন্যে উঠল নিষ্ঠুর তরবারি,—ধূলায় পড়ে গড়িয়ে গেল দুই সর্দারের মুণ্ড।

প্রতিশোধ নিয়ে তৈমুর দেশে ফিরে এসে দেখলেন, রাজ্যের হালচাল সব বদলে গিয়েছে!

মধ্য-এশিয়ার কোন রাজা মারা পড়লে তাঁর ছেলে সিংহাসন দখল করতে পারেন—যদি তিনি সক্ষম হন। নইলে রাজ্যের বড় বড় সর্দাররা এক হয়ে পরামর্শ করে নতুন রাজা নির্বাচন করেন, কিংবা সিংহাসন নিয়ে হয় ঘরোয়া যুদ্ধের অবতারণা। ওখানকার প্রবাদই হচ্ছে:

"তরবারি ধারণের শক্তি আছে যে-হাতের, কেবল সেই হাতই ধারণ করতে পারে রাজদণ্ড !"

আমীর কাজগানের ছেলে রাজদণ্ডধারণের চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু চারিদিকে বিপদের মেঘ ঘনিয়ে উঠেছে দেখে হঠাৎ একদিন অদৃশ্য হলেন। তখন দিগ্বিদিক থেকে তাতারদের মধ্যে প্রধান হবার জন্য যাঁরা এগিয়ে এলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন তৈমুরের খুড়ো হাজী বার্লাস। অন্যান্য সামন্ত রাজা বা সর্দারেরা নিজের নিজের কেল্লায় ফিরে গিয়ে স্ব-সম্পত্তি রক্ষা ও পরস্বাপহরণের জন্যে সৈন্য সংগ্রহ করতে লাগলেন।

ঠিক এই সময়ে তৈমুরের সন্ন্যাসী পিতার মৃত্যু হল।

ওদিকে উত্তর-দিকের পর্বতমালার পরপার থেকে মহান খাঁয়ের টনক নড়ল। চেঙ্গীজ খাঁর বংশধরদের মধ্যে যাঁরা সম্রাটের মতন সম্মান লাভ করতেন, 'মহান খাঁ' বলে ডাকা হত তাঁদেরই। সমরখন্দ প্রভৃতি স্থানে যাঁরা শাসন করতেন, তাঁরা নিজের নিজের এলাকায় যতটাই স্বাধীনতা প্রকাশ করুন, আসলে তাঁদের সকলকার মাথার উপরে থাকতেন ঐ মহান খাঁ।

একদিন খবর পাওয়া গেল, মহান খাঁ সদলবলে আসছেন সমরখন্দের দিকে। বহু বৎসর আগে এ-অঞ্চলে রাজবিদ্রোহ হয়েছিল, সে কথা হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেছে; এবং সেই ওজর তুলে তিনি পেয়েছেন আজ রুদ্রমূর্তি ধারণ করবার সুযোগ।

শুনেই যত তাতার আমীরদের পিলে দস্তুরমতন চমকে গেল। তাঁরা তাড়াতাড়ি নানান-রকম দামী দামী উপঢৌকন পাঠিয়ে মহান খাঁয়ের মন রাখবার চেষ্টা করলেন।

হাজী বার্লাস প্রথমে খাঁয়ের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন; কিন্তু তারপরেই তাঁর সাহস গেল উপে! তিনি তৈমুরকে ডেকে বললেন, "চল, আমরা হিরাটের দিকে সরে পড়ি।"

কিন্তু তৈমুর বললেন, "আপনি যেখানে ইচ্ছে যান, আমি খাঁয়ের সঙ্গে দেখা করব।"

তৈমুর বুঝেছিলেন, জাট মোগলের সর্বেসর্বা এই খাঁ কেবল তাঁর পূর্ব-দাবি প্রতিষ্ঠার জন্যে এদিকে আসছেন না, তাঁর মনে প্রাপ্তির আশাও আছে বিলক্ষণ। তিনি আরো বুঝলেন যে, কয়েক শত অনুচর নিয়ে বারো হাজার জাট মোগলকে বাধা দিতে যাওয়া পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব তৈমুর স্থির করলেন, তিনি বাজী মাৎ করবেন কূট চালে।

নিজের সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি—অর্থাৎ ভালো ভালো ঘোড়া, সোনা-রুপো ও হীরা-মুক্তো নিয়ে জাট মোগলদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

মোগলদের অগ্রদূত রূপে প্রথমে সসৈন্যে এল তিনজন সেনানী। তারা তৈমুরের শ্বেত প্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়াতেই তৈমুর সাদরে তাদের অভ্যর্থনা করলেন। তারপর তাদের জন্যে হল ভোজের বিপুল আয়োজন। ভোজের পরে প্রচুর উপঢৌকন পেয়ে সেনানীরা পরম পরিতুষ্ট হল।

তারপর তৈমুর চললেন আসল খাঁয়ের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর নাম তোগলক।

তৈমুর তোগলকের সামনে গিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে, যথারীতি অভিবাদন করে বললেন, "হে মহান খাঁ, হে আমার পিতা, আমি হচ্ছি বার্লাস গোষ্ঠীর সর্দার, সবুজ শহরে আমার বসতি।"

তৈমুরের নির্ভীক ও বীরোচিত মূর্তি দেখে তোগলক বিস্মিত হলেন। তারপর দামী দামী ভেট পেয়ে তাঁর মেজাজ এমন নরম হয়ে গেল যে, তৈমুর সত্যসত্যই বার্লাস গোষ্ঠীর সর্দার কিনা, সে-সম্বন্ধে কোন খোঁজ নেওয়া তিনি দরকার মনে করলেন না।

তৈমুর মনে মনে হেসে বললেন, "হুজুরের জন্যে আমি আরো অনেক ভালো উপহার আনতে পারতুম, কিন্তু তিনটে কুকুর সে-সব জোর করে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে।"

তোগলক ক্ষাপ্পা হয়ে বললেন, "কে তারা?"

তৈমুর বললেন, "পিতা, তারা হচ্ছে আপনারই তিনজন সেনানী।"

তোগলক বললেন, "হ্যাঁ, তারা কুকুরই বটে; কিন্তু তারা হচ্ছে আমারই কুকুর আর তাদের লোভ হচ্ছে আমার চোখের বালির মতন।"

তিনি তখনই সেনানীদের কাছ থেকে সমস্ত ধনরত্ন কেড়ে আনবার হুকুম দিলেন।

কিন্তু যা হস্তগত করেছে তা হাতছাড়া করতে রাজি না হয়ে সেনানীরা পালিয়ে গেল এবং নতুন ফৌজ গঠন করে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করলে।

তোগলক বললেন, "তৈমুর, এখন উপায়?"

তৈমুর বললেন, "পিতা, নিজের দেশে ফিরে গিয়ে বিদ্রোহ দমন করুন।"

তোগলক তাই করলেন এবং যাবার সময়ে তৈমুরকে দশহাজার সৈন্যের সেনাপতি করে দিয়ে গেলেন। পূর্ববর্তী মোগল-যুগে পূর্বপুরুষরা এই সম্মানেরই অধিকারী ছিলেন।

ওদিকে ভাইপোর চালাকির কথা শুনে খুড়ো হাজী বার্লাস হলেন চটে আগুন! তৈমুর ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে চায়! স্নেহময় খুড়ো অন্যান্য সর্দারদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলেন, তৈমুরকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে এনে হত্যা করতে হবে।

কিন্তু ষড়যন্ত্র সফল হল না, বুদ্ধিমান্ তৈমুর ফাঁদে পা দিলেন না। হাজী বার্লাস তখন সদলবলে তৈমুরকে আক্রমণ করবার জন্যে সবুজ শহরে এসে হাজির হলেন। তৈমুরের অধিকাংশ সঙ্গীও হাজী বার্লাসের দলে যোগদান করলে। তৈমুর তখন নাচার হয়ে তাঁর স্ত্রীর ভাই কাবুলের আমীর হুসেনের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠালেন।

আমীর হুসেন ভগ্নীপতিকে সাহায্য করবার জন্যে আফগানি সৈন্যদের নিয়ে ছুটে এলেন। আট-নয় বৎসর এইভাবে কেটে গেল। তারপর আবার হঠাৎ একদিন এই ঘরোয়া যুদ্ধের মাঝখানে হল তোগলকের পুনরাবির্ভাব। হাজী বার্লাস দক্ষিণদিকে পালিয়ে গিয়ে

প্রাণ হারালেন ডাকাতের হাতে। আমীর হুসেন তোগলককে বাধা দিতে গেলেন, কিন্তু তিনিও যুদ্ধে হেরে পলায়ন করলেন।

তৈমুর কিন্তু মোগলদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলেন না। তোগলক খুশি হয়ে তাঁকে সমরখন্দের সর্দার করে দিয়ে গেলেন।

কিন্তু তৈমুর খুশি হতে পারলেন না, কারণ তাঁর মাথার উপরে প্রধান হয়ে রইলেন তোগলকের পুত্র ও সেনাপতি বিকিজুক।

উপায়ান্তর নেই দেখে তৈমুর তখনকার মতন মনের রাগ মনেই চেপে রইলেন বটে, কিন্তু কিছুকাল পরে যখন দেখলেন সেনাপতি বিকিজুক সমস্ত সমরখন্দ লুণ্ঠন করছেন, মেয়েদের ধরে বাঁদী করে জাট মোগলদের দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, এমন কি পূজনীয় সৈয়দদেরও বন্দী করতে ছাড়ছেন না, তখন তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না, জাট মোগলদের বিরুদ্ধে উত্তোলন করলেন বিদ্রোহের পতাকা।

তোগলক হুকুম পাঠালেন—"তৈমুরকে বধ কর।"

ঘোড়ায় চড়ে দেশ ছেড়ে তৈমুর চললেন মরুভূমির দিকে।

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতের দ্বারে প্রথম বার

মরুভূমি—আরক্ত, অনুর্বর, বিপুল শূন্যতার রাজ্য! তারই বুক-চেরা পায়ে-চলা পথে রাঙা মাটির প্রলেপ—রোদের তাতে পুড়ে শুকিয়ে, ফেটে চৌচির! দুপুরের বাতাস গরম ফুঁ দিয়ে হু-হু করে বালি ছড়িয়ে এমন উড়ন্ত যবনিকার সৃষ্টি করে যে, প্রভাত ও বিকাল ছাড়া অন্য কোন সময়ে তার ভিতর দিয়ে নজর চলে না।

কিন্তু এ আসল মরুভূমি নয়। কারণ এরই মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা যায় শুষ্ক নদীর বাঁকা রেখা—তারা এগিয়ে গিয়েছে বৃহত্তর নদী আমু-

দরিয়ার কোলের দিকে। এ-সব নদীর ধারে ধারে ছোট ছোট লতাগুল্ম ও শরবন দেখা যায়। মাঝে মাঝে পাওয়া যায় কূপ। সে-সব কূপের জল মানুষের ব্যবহারযোগ্য না হলেও, জন্তুরা তা পান করে সাগ্রহেই। এবং যেখানে যেখানে জল কতকটা চলনসৈ, সেখানেই তুর্কী-জাতীয় যাযাবররা তাঁবু ফেলে বসে থাকে—দলে-হালকা পথিকদের সাংঘাতিক অভ্যর্থনা করবার জন্যে!

স্থানীয় ভাষায় এই মরু-প্রান্তরের নাম হচ্ছে, 'রাঙা বালি'।

পলাতক তৈমুর নিলেন এই রাঙা বালির আশ্রয়। সঙ্গে তাঁর সহধর্মিণী আলজাই এবং জন-কুড়ি বিশ্বস্ত অনুচর। প্রত্যেকেই অশ্বারোহী ও সশস্ত্র।

দিন-কয় পথ চলবার পর এইখানেই তৈমুর তাঁর শ্যালক আমীর হুসেনের দেখা পেলেন। তিনিও পলাতক ও রাজ্যহারা। হুসেনেরও সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী বিখ্যাত সুন্দরী দিলসাদ আগা, এবং এ-দলেও কয়েকজন সৈনিক ছিল।

তৈমুর প্রথমে খিভা শহরের দিকে যাত্রা করলেন; কিন্তু সেখানকার শাসনকর্তা তাঁদের আশ্রয় না দিয়ে করলেন সসৈন্যে আক্রমণ!

তৈমুর ও হুসেন আত্মরক্ষার জন্যে তাড়াতাড়ি একটা পাহাড়ের বা গিরি-সঙ্কটের উপরে গিয়ে উঠলেন। শত্রুরা সংখ্যায় অনেক বেশি হলেও তৈমুরের অধীনস্থ তাতাররা একটুও ভয় পেলে না—কারণ ঘোড়ার পিঠে আসন পেতে ধনুক-বাণ ধরতে পারলে তাতার সৈনিকরা যমের সঙ্গেও লড়তে পিছপাও নয়!

তাতারদের এক কোমরে থাকে ছিলা-জোড়া ধনুক আর এক কোমরে বাণ-ভরা তূণ। তাদের ছোট ছোট ঢাল বাঁধা থাকে উপর-হাতে এবং তরবারি বা গদাও তারা সঙ্গে রাখে; কিন্তু অন্য অস্ত্রের চেয়ে তারা ধনুক-বাণ ব্যবহার করতেই বেশি ভালবাসে।

বিকট চিৎকার করতে করতে তাতাররা শত্রু-দলের ভিতর গিয়ে পড়ল এবং বাণ ছুঁড়তে লাগল বৃষ্টিধারার মতন। শত্রুরাও উত্তর দিতে ছাড়লে

না। দেখতে দেখতে দুই পক্ষের অনেকগুলো ঘোড়া হল আরোহীশূন্য।

তাতারদের মধ্যে একজন বীরের নাম এলচি বাহাদুর। তিনি শত্রুদের মাঝখানে গিয়ে এমন বেপরোয়ার মতন লড়াই করতে লাগলেন যে, তৈমুর নিজে গিয়ে হাত ধরে তাঁকে টেনে আনলেন।

আমীর হুসেনও পড়লেন মহা বিপদে। তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে শত্রুদের পতাকাবাহীর উপরে গিয়ে পড়ে তাকে বধ করলেন বটে, কিন্তু শত্রুব্যূহ ভেদ করে আর বেরিয়ে আসতে পারলেন না। তৈমুর তাড়াতাড়ি তাঁকে উদ্ধার করতে গেলেন এবং শত্রুরা তখন হুসেনকে ছেড়ে তাঁকেই আক্রমণ করলে। সেই ফাঁকে হুসেন সরে পড়লেন। তৈমুরের দুই হাতে যখন দুইখানা তরবারি শত্রুর রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে, অন্যান্য তাতার বীররা তখন তাঁর দুই পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

তৈমুর চিৎকার করে বললেন, "এইবারে সবাই দল বেঁধে এক সঙ্গে শত্রুদের আক্রমণ কর!"

হঠাৎ একটা তীরে আহত হয়ে হুসেনের ঘোড়া প্রভুকে পিঠ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। হুসেনের স্ত্রী বীরনারী দিলসাদ তখনি নিজের ঘোড়া ছুটিয়ে স্বামীর পাশে এসে দাঁড়ালেন। স্ত্রীর ঘোড়ায় চড়ে হুসেন আবার যুদ্ধে যোগদান করলেন।

এ-সব দিকে তখন তৈমুরের দৃষ্টি ছিল না; কারণ, তাঁর প্রধান শত্রু খিভার শাসন-কর্তাকে তখন তিনি সামনা-সামনি পেয়েছেন! তখনি বেজে উঠল তাঁর ধনুকের ছিলা, এবং সঙ্গে সঙ্গে গণ্ডদেশে আহত হয়ে শাসনকর্তা হলেন 'পপাত ধরণীতলে!' পর-মুহূর্তে অশ্বারোহণে নিপুণ তৈমুর ঘোড়ার পিঠ থেকে না নেমেই মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ে একটা পরিত্যক্ত বর্শা তুলে ভূপতিত শত্রুর বুকে দিলেন আমূল বসিয়ে!

নেতার শোচনীয় পরিণাম দেখে শত্রুরা পলায়ন করলে।

তৈমুর যুদ্ধে জয়লাভ করলেন বটে, কিন্তু তাঁর পক্ষে বেঁচে ছিল তখন সাতজন মাত্র সৈনিক এবং তারাও প্রত্যেকেই অল্প-বিস্তর আহত।

তৈমুর কঠোর হাস্য করে বললেন, "না, এখনো আমরা অদৃষ্ট-পথের

শেষে এসে হাজির হইনি !"

পাছে শত্রুরা আবার দলে ভারি হয়ে আক্রমণ করতে আসে, সেই ভয়ে তৈমুর রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে অন্ধের মতন অগ্রসর হতে লাগলেন।

তারপর আবার এল প্রভাত এবং আবার এল রাত্রি এবং আবার দিনের আলোর পর রাতের অন্ধকার ! এর মধ্যে আরো নতুন নতুন দুর্ভাগ্যেরও অভাব হল না।—

আমীর হুসেন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দল ছেড়ে স্বদেশের দিকে যাত্রা করলেন। তৈমুরের সঙ্গে রইল মাত্র একজন অনুচর ও দুইটি ঘোড়া। মালবহনের জন্যে একটি ঘোড়া রেখে বাকি ঘোড়াটি স্ত্রীকে দিয়ে তৈমুর পদব্রজে চললেন মরু-বালু দলন করে।

জীবনে এর আগে যিনি পায়ে হেঁটে পথ চলেন নি এবং এর পরে যাঁর উপাধি হবে 'পৃথিবী-জেতা', তাঁর দিকে তাকিয়ে আলজাই বললেন, "স্বামী, আমাদের অদৃষ্ট এর চেয়ে মন্দ হতে পারে না !"

বারো দিন কাটল পথে-বিপথে। তারপর হল রাঙা বালির শেষ ও নতুন দুর্ভাগ্যের আরম্ভ।

সে-অঞ্চলের সর্দারের নাম আলি বেগ। পলাতক তৈমুরকে দেখে সে বুঝলে, এঁকে হস্তগত করতে পারলে প্রচুর লাভের সম্ভাবনা। আলি বেগ তখনি তৈমুর ও তাঁর স্ত্রীকে একটা গোয়াল-ঘরে বন্দী করে রেখে জাট মোগলদের কাছে দূত পাঠালে।

কীট-পতঙ্গ ও দুর্গন্ধ ভরা জঘন্য গোয়াল-ঘর। রাজার জামাই ও সবুজ শহরের কর্তা তৈমুর এবং রাজার মেয়ে আলজাই তারই ভিতরে বসে মরুভূমির তপ্ত হাওয়ায় পুড়তে পুড়তে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে লাগলেন। এই ভাবে কাটল দুই মাস দুই দিন।

তৈমুর এমন কষ্টের কল্পনাও করে নি কোন দিন। বিকৃত স্বরে তিনি বললেন, "দোষী হোক আর নির্দোষই হোক—জীবনে কারুকে কখনো আমি বন্দী করে রাখব না !"

এদিকে তৈমুরের মূল্য কত হওয়া উচিত, তাই নিয়ে জাট-মোগলদের

সঙ্গে দর-কষাকষি করতে করতে আলি বেগ তার লাভের সুযোগ হারাতে বাধ্য হল।

আলি বেগের দাদা ছিলেন পারস্য-দেশের এক সর্দার। সমস্ত খবর শুনে তিনি বিরক্ত হয়ে ভাইকে চিঠি লিখলেন, "জাট-মোগলদের সঙ্গে হয়েছে সবুজ শহরের কর্তার ঝগড়া। এর মধ্যে তোমার মাথা গলানো উচিত নয়।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি তৈমুরের জন্যে পাঠিয়ে দিলেন অনেক মূল্যবান উপহার।

আলি বেগ অনিচ্ছাসত্ত্বেও তৈমুরকে মুক্তি দিলে। দাদার পাঠানো উপহারগুলি বুদ্ধিমানের মতন নিজের ভাগে রেখে তৈমুরকে সে দান করলে একটা বেতো ঘোড়া ও একটা বুড়ো উট।

এত দুঃখেও মিষ্টি হাসি হেসে আলজাই বললেন, "স্বামী, এখনো আমরা পথের শেষে আসি নি।"

শরৎ-কালের বৃষ্টি এল—এই সময়ে আমু নদীর তীরে এক নির্দিষ্ট স্থানে হুসেনের সঙ্গে তৈমুরের যোগদান করবার কথা।

কিন্তু তৈমুর একবার লুকিয়ে নিজের দেশটা দেখে আসবার লোভ সামলাতে পারলেন না। বিশেষ, একেবারে খালি-হাতে সঙ্গীহীন কাঙালের মতন কুটুম্বের কাছে যাবার ইচ্ছাও তাঁর হল না। হুসেন ছিলেন রীতিমত জাঁকী মানুষ। তিনি নিজেকে কেবল তৈমুরের চেয়ে বুদ্ধিমান নয়, উচ্চশ্রেণীর লোক বলেই মনে করতেন।

আলজাইকে কাছাকাছি একটা গ্রামে লুকিয়ে রেখে ছদ্মবেশী তৈমুর এসে হাজির হলেন সমরখন্দ শহরে।

কিন্তু সেখানকার গতিক সুবিধার নয়। জাট-মোগলদের দোর্দণ্ড-প্রতাপে সবাই সেখানে ভয়ে থরহরি কম্পমান। সমরখন্দের তাতারীরা চিরদিনই যোদ্ধা নেতার অনুগামী হতে অভ্যস্ত। মুসলমানদের মতন তাদের মধ্যে ধর্মান্ধতার প্রভাব ছিল না—তারা বীরধর্মে দীক্ষিত, যুদ্ধ ছাড়া আর কোন-কিছু নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইত না। যে নেতা তাদের বীর্যকে জাগ্রত ও বিজয়-গৌরবের পথে চালনা করতে পারতেন, তারা

হত তাঁরই বিশ্বস্ত অনুচর।

কিন্তু তৈমুর হচ্ছেন যুবক ও সহায়-সম্বলহীন। তাঁর অনুগামী হয়ে দুর্দান্ত জাট-মোগলদের বিষ-দৃষ্টিতে পড়বার জন্যে তাদের আগ্রহ দেখা গেল না। তবু কয়েকজন ডানপিটে লোক তৈমুরের সঙ্গী হতে রাজি হল।

ওদিকে এরই মধ্যে মোগলরা তৈমুরের পুনরাবির্ভাব আবিষ্কার করে ফেললে। তৈমুর সঙ্গীদের নিয়ে সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে চুপিচুপি সবুজ শহরের ভিতরে প্রবেশ করলেন।

তাঁর প্রিয় সবুজ শহর। এইখানেই তাঁর জন্ম এবং এইখানেই কেটেছে তাঁর স্বপ্নময় শৈশব ও আনন্দময় প্রথম যৌবন।

আমীর কাজগানের রণপ্রবীণ বাহাদুররা তখনো সবুজ শহরে বসে নিজেদের গৌরবোজ্জ্বল রক্তাক্ত অতীতের কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে। তৈমুরের আগমন-সংবাদ তাদের কাছে পৌঁছতে দেরি লাগল না। ছুটে এল এলচি বাহাদুর, জাকু বার্লাস প্রমুখ বীরবৃন্দ।

তারা বললে, "তৈমুর, তৈমুর! ভগবানের ধরণী যখন এখন বিপুলা, তখন আমরা আর সঙ্কীর্ণ শহরে চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকি কেন?"

তৈমুর দৃপ্ত কণ্ঠে বললেন, "থামো বচনবাগীশের দল। কী তোমরা করতে চাও? তোমরা কি বাজ-পাখির মতন শিকারের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে? না, তোমরা হচ্ছ কাক, জাট-মোগলদের উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে খেয়েই দিনের পর দিন কাটাবে?"

বাহাদুররা বললে, "ইয়ে আল্লা! আমরা কাক নই!"

নিজের ছোটখাটো দলটি নিয়ে তৈমুর চললেন হুসেনের সঙ্গে দেখা করতে। এ দলের অধিকাংশ লোকই সৈনিক বলে আত্মপরিচয় দিতে পারে না—তাদের কেউ হচ্ছে বন্য তুর্কীজাতীয় লোক, কেউ-বা বিপদ-প্রিয় আরব। উচ্চাকাঙ্ক্ষা বলতে তারা খালি বোঝে হানাহানি ও লুঠতরাজ। সৈনিক হিসাবে উচ্চ-শ্রেণীর না হলেও তৈমুর পা দিয়েছেন যে দুর্গম পথে, তারা তার পক্ষে যোগ্য সহযাত্রীই বটে।

এ-পথ দুর্বলের পথ নয়। মাইলের পর মাইল, এমনি পাঁচশত মাইল ধরে নতোন্নত পথ চলেছে সুদীর্ঘ পর্বত-শ্রেণীর ভিতর দিয়ে—সর্বাঙ্গে মেঘচুম্বী শিখরের পর শিখরের ছায়া। গিরিসঙ্কটের মধ্যবর্তী এক নদীর তীর ধরে এই উচল পথ ঊর্ধ্বে, ঊর্ধ্বে,—ক্রমে আরো ঊর্ধ্বে গিয়ে ডুবে গিয়েছে প্রায় দেড়ফুট পুরু তুষাররাশির মধ্যে এবং অবশেষে গিয়ে পড়েছে একেবারে আফগানিস্থানের বুকের উপরে!

মহাপর্বতের হিমানী-ক্ষেত্রের পর হিমানী-ক্ষেত্র! তুষারার্ত ঝঞ্ঝাবায়ু হা-হা রবে বয়ে যায় অধিত্যকার উপর দিয়ে—ধ্বনি-প্রতিধ্বনি জাগিয়ে পাহাড়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে! সেইখানে পড়ে যাত্রীদের তাঁবু। দিনের বেলায় কোনদিকে ভালো করে তাকানো যায় না—কারণ, তুষার-ক্ষেত্রের উপর তীব্র সূর্যকর পড়ে লক্ষ লক্ষ তীক্ষ্ণ ছুরির জ্বলন্ত শিখার মতন অন্ধ করে দেয় দৃষ্টিকে!

ঘোড়াদের গায়ে পশমী আবরণ, মানুষদের পরোনে নেকড়ে ও নকুলজাতীয় পশুর চর্মে প্রস্তুত পোশাক। মাঝে মাঝে স্থানীয় গিরি-দুর্গের ভিতর থেকে ভেসে আসে প্রহরী ও কুকুরের চিৎকার। মাঝে মাঝে লোভী আফগানীরা হিংস্র জন্তুর মতন এসে হানা দেয়। কিন্তু তারা জানত না যে কোন শ্রেণীর বেপরোয়া গোঁয়ারদের সঙ্গে পাল্লা দিতে যাচ্ছে! প্রত্যেক বারেই তৈমুরের দল তাদের হারিয়ে যথাসর্বস্ব কেড়ে নেয়!

অবশেষে হিন্দুকুশের তুষার-মুল্লুক ছাড়িয়ে তৈমুর কাবুলের উপত্যকার ভিতরে গিয়ে পড়লেন।

কাবুলের সিংহাসন দখল করেছেন তখন জাট-মোগলবংশের এক ব্যক্তি। আমীর হুসেন স্বরাজ্য ত্যাগ করে পলাতক।

মেঘ আর বিদ্যুৎ

কাবুল থেকে কান্দাহারের পথ। তৈমুর হয়েছেন দক্ষিণের যাত্রী।

তারপর আমীর হুসেনের সঙ্গে দেখা। হুসেনের দল তৈমুরের চেয়ে ভারি।

তুষারবর্ষী শীত—মানুষের দেহকে ভাসিয়ে বরফ করে দিতে চায়। তৈমুর ও হুসেন সদলবলে বিশ্রাম করতে লাগলেন।

তন্মধ্যে সিজিস্থানের এক সর্দার এসে তাঁদের বন্ধুত্ব প্রার্থনা করলেন। তাঁর প্রজারা বিদ্রোহী হয়েছে, তৈমুর ও হুসেন সর্দারের সঙ্গে যোগ দিয়ে বিদ্রোহ দমন করতে রাজি হলেন।

তৈমুর রাজি হলেন কেবল নতুন অ্যাডভেঞ্চারের লোভে। হুসেন রাজি হলেন এই ফাঁকে দক্ষিণ প্রদেশের প্রভু হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষায়।

এই তিন যোদ্ধার সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে সিজিস্থানের বিদ্রোহীরা দাঁড়াতে পারলে না। দুর্গের পর দুর্গ বিদ্রোহীদের হাতছাড়া হতে লাগল।

অতি-লোভী হুসেন ভাবলেন, দাঁও মারবার এই মস্ত সুযোগ! তিনি গ্রামের পর গ্রাম লুণ্ঠন করতে লাগলেন, চারিদিকে নিজের সৈন্য-দের ঘাঁটি বসালেন।

নির্বোধ হুসেন! ব্যাপার দেখে ক্ষাপ্পা হয়ে সিজিস্থানের সর্দার বিদ্রোহীদের সঙ্গে সমস্ত গোলযোগ মিটিয়ে ফেললেন এবং তারপর আক্রমণ করলেন তৈমুর ও হুসেনকেই।

তৈমুরের রণকৌশলে সিজিস্থানীরা পরাজিত হল বটে, কিন্তু তিনি নিজে হলেন আহত। একটা তীর এসে তাঁর হাতের হাড় ভেঙে দিলে, আর একটা এসে ঢুকল তাঁর পায়ের ভিতরে। হুসেনের নির্বুদ্ধিতার

জন্যে শাস্তি পেতে হল তৈমুরকেই।

সেই গিরিরাজ্যের মধ্যে আহত ও অকর্মণ্য তৈমুরকে বিশ্রাম করবার পরামর্শ দিয়ে, হুসেন নিজের সৈন্যদল নিয়ে উত্তর দিকে যাত্রা করলেন।

খবর পেয়ে স্বামীর সেবা করবার জন্যে এলেন আলজাই। জন্মযোদ্ধা তৈমুর বাধ্য হয়ে অস্ত্র ছেড়ে গার্হস্থ্য জীবন যাপন করতে লাগলেন। কোলে বসে খেলা করে ছেলে জাহাঙ্গীর, পাশে বসে মিষ্টি কথা বলেন সুন্দরী আলজাই, সামনের উপত্যকা দিয়ে আঙুরলতা দুলিয়ে বয়ে যায় ফুলগন্ধী বাতাস, রাতের চাঁদ উঠে তাঁদের পানে তাকায় আলোমাখা মুখে।

তৈমুরের কিন্তু শান্তি নেই--আলস্য তাঁর পক্ষে বিষ। বিপুল বিশ্ব জাগতে চায় যাঁর নখদর্পণে, ফুলের কুঞ্জে বসে দিবাস্বপ্ন দেখতে তাঁর ভালো লাগবে কেন?

কিন্তু উপায় নেই, দেহ অপটু। অশান্ত তৈমুরের মন করে ছটফট, চারিদিকে ঘোরাফেরা করেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।

কিছুকাল পরে অধীর স্বরে তিনি বললেন, "নিয়ে এস আমার ঘোড়া, নিয়ে এস আমার তরবারি, নিয়ে এস আমার বর্ম আর শিরস্ত্রাণ!"

তৈমুর আবার যোদ্ধার সাজ পরলেন। তিনি সিধে হয়ে দাঁড়ালেন বটে, কিন্তু হাঁটতে গেলেই তাঁকে খোঁড়াতে হয়। তাঁর পা আর সারল না, এবং তখন থেকেই তাঁর নাম হল তৈমুর লং বা খোঁড়া তৈমুর!

তৈমুরের হাতের ভাঙা হাড় তখনো জোড়া লাগে নি, তিনি ঘোড়ার লাগাম পর্যন্ত ধরতে পারেন না; কিন্তু তবু তাঁকে যাত্রা করতে হল।

শ্যালক হুসেন আবার এক কীর্তি করে বসেছেন। বোকার মতন তৈমুরের মানা না মেনে জাট-মোগলদের আক্রমণ করতে গিয়ে হেরে ভূত হয়েছেন। তৈমুর চলেছেন তাঁকেই সাহায্য করতে।

গিরিসঙ্কটের সামনেই এক নদী। সেইখানে ছাউনি ফেলে তৈমুর অপেক্ষা করছেন, এমন সময়ে একদিন এক ঘটনা।

পরিষ্কার রাত, ধবধবে চাঁদের আলো। আড়ষ্ট খঞ্জ পদকে কার্যক্ষম করে তোলবার জন্যে তৈমুর একাকী নদীর তীরে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন।

ভোরের আভাস জাগল পূর্বাকাশে—তখনো তৈমুর বিনিদ্র।

আচম্বিতে দেখা গেল, গিরিসঙ্কটের অন্য পাশ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে দলে দলে সশস্ত্র অশ্বারোহী। তৈমুর তখনি নিজের সৈন্যদের ডাক দিয়ে একলাই ছুটে গেলেন তাদের দিকে।

চিৎকার করে বললেন, "কে তোমরা? কোথা থেকে আসছ? কোথায় যাচ্ছ?"

উত্তর এল, "আমরা হচ্ছি প্রভু তৈমুরের ভৃত্য। আমরা তাঁরই খোঁজে চলেছি।"

সাবধানের মার নেই। তৈমুর বললেন, "আমিও তৈমুরের চাকর। তোমরা যদি প্রভুর কাছে যেতে চাও, আমার সঙ্গে এস।"

তিনজন লোক এগিয়ে এসেই তৈমুরকে চিনতে পেরে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে সসম্মানে তাঁকে অভিবাদন করলে।

তখন তৈমুরও চিনলেন। এরা তাঁরই—অর্থাৎ বার্লাস-গোষ্ঠীর তিন সর্দার।

তাদের মুখে খবর পাওয়া গেল, জাট-মোগলেরা আবার এমন অত্যাচার শুরু করেছে যে, সারা দেশের লোক ক্ষেপে উঠছে। দেশের লোক এখন দলপতিরূপে পেতে চায় আমীর তৈমুরকেই।

এত বড় সুযোগ তৈমুর ছাড়লেন না। যদিও এখনো দেহ তাঁর প্রায় পঙ্গু, তবু তিনি ছাউনি তুলে ধরলেন দেশের পথ।

আমু নদীর তীর ধরে যাত্রা করেছেন জাট-মোগলদের সেনাপতি বিকিজুক। সঙ্গে তাঁর বিশ হাজার সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্য।

আমু নদীর আর এক তীর ধরে অগ্রসর হয়েছেন তৈমুর। তাঁর অর্ধ-শিক্ষিত সৈন্যের সংখ্যা পুরো পাঁচ হাজারও হবে না।

আমু নদী ক্রমে সঙ্কীর্ণ হয়ে এল। তারপর একটি পাথরের সেতু। একমাস পরে বিকিজুক এইখানে এসে তাঁবু ফেললেন।

তৈমুর নদীর এ-তীরে মাত্র পাঁচশত লোক রেখে বাকি সৈন্য নিয়ে

লুকিয়ে নদী পার হলেন। তারপর পাহাড়ের আনাচে-কানাচে নিজের সৈন্যদের ছড়িয়ে দিয়ে সকলকে রাত্রির অন্ধকারে অর্ধচন্দ্রাকারে শত্রু-ব্যূহের দিকে অগ্রসর হতে বললেন। তাদের উপরে হুকুম রইল, তারা যেন সকলেই মশাল জ্বেলে এগিয়ে যায়।

গভীর রাত্রে জাট-মোগলরা সভয়ে দেখলে, তাদের তিন দিক বেষ্টন করে এক অগ্নিময় বিপুল অর্ধচক্র এগিয়ে আসছে। তারা ভাবলে, শত্রুরা সংখ্যায় অগণ্য!

ভোর হবার আগেই ভীত জাট-মোগলরা বিশৃঙ্খল হয়ে পালাতে আরম্ভ করলে! তৈমুর তখন আক্রমণ করলেন বিপুল বিক্রমে।

ইতিমধ্যে আমীর হুসেনও সসৈন্যে এসে পড়লেন। তিনি বললেন, "পরাজিত শত্রুর অনুসরণ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।"

তৈমুর বললেন, "ওরা এখনো পরাজিত হয় নি।"

অপটু দেহেও তৈমুর দ্বন্দ্বযুদ্ধে বিকিজুক ও অন্য দুইজন সেনাপতিকে স্বহস্তে হারিয়ে বন্দী করলেন। জাট-মোগলদের দুর্দশা দেখে সাহস সঞ্চয় করে দলে দলে তাতারী এসে তৈমুরের পক্ষে যোগদান করতে লাগল।

তারপরেই খবর এল মহান খাঁ তোগলক আর ইহলোকে বর্তমান নেই। পিতার গদীতে বসবার জন্যে যুবরাজ ইলিয়াজ তাড়াতাড়ি সমস্ত জাট সৈন্য নিয়ে তখনকার মতন স্বদেশের দিকে যাত্রা করলেন।

বিজয়ী তৈমুর তাঁর প্রিয় জন্ম নগর সবুজ শহর দখল করতে ছুটলেন। এখানেও তাঁর অপূর্ব কৌশলে জাট-মোগলরা হেরে গেল বিনা যুদ্ধেই।

তৈমুর এখানেও তাঁর সেপাইদের সবুজ শহরের চারিদিকে দূরে দূরে ছড়িয়ে দিলেন। তারপর তারা অসংখ্য গাছের ডাল ভেঙে ধুলো ঝাঁট দিতে অগ্রসর হল।

নগরের জাট-মোগলরা দূরে যেদিকে তাকায়, সেই দিকেই দেখে পুঞ্জ পুঞ্জ ধুলোর মেঘ! তারা ভাবলে, না-জানি কত সৈন্যই আসছে আমাদের আক্রমণ করবার জন্যে!

শহর ফেলে দিলে তারা পিঠ টান!

তৈমুর এক বিপুল বাহিনীকে হারিয়ে দিলেন আগুন-খেলা দেখিয়ে এবং একটি নগর দখল করলেন তুচ্ছ ধুলো রাশি উড়িয়ে!

তারপরেই তৈমুরের তারকা আর একবার হল নিম্নগামী।

নতুন মহান খাঁ ইলিয়াজ নিজের পরাজয় ভুললেন না। আবার তিনি সদলবলে এলেন তৈমুরকে শাস্তি দিতে।

এবারে জাট মোগলরা সংখ্যায় তাতারীদের চেয়ে কম বটে, কিন্তু তাদের শিক্ষা, অস্ত্রশস্ত্র ও অশ্ব ছিল তাতারীদের চেয়ে ঢের উন্নত।

তৈমুর নিজের সৈন্যদল তিন অংশে বিভক্ত করলেন—দক্ষিণ ভাগ, মধ্যভাগ ও বামভাগ। দক্ষিণ ভাগ ছিল সমধিক প্রবল এবং বামভাগ ছিল সব চেয়ে দুর্বল। তৈমুর ইচ্ছা করেই নিজে বামভাগের ভার নিয়ে দক্ষিণভাগে পাঠিয়ে দিলেন আমীর হুসেনকে। কথা রইল, দরকার হলেই হুসেন এসে তাঁকে সাহায্য করবেন।

এদিকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করে মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। হা-হা রবে গর্জন করছে ক্রুদ্ধ ঝটিকা! ভূমি কর্দমাক্ত, চলতে পা বসে যায়; নদী ক্ষেপে উঠেছে, চারিদিকে ছুটছে বন্যার প্রবাহ; ধনুকের ছিলা ভিজে গেছে—তাতারীদের প্রিয় অস্ত্র অচল।

তবু কেবলমাত্র তরবারি বর্শা ও কুঠার নিয়ে তৈমুর সদলবলে দুর্দান্ত সিংহের মতন জাট-মোগলদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অস্ত্রে অস্ত্রে ঝনৎকার, মেঘে মেঘে বিদ্যুৎ—পৃথিবীতেও অসি-বর্শার বিদ্যুৎ-চমক, অঙ্গহীন দেহ—দেহহীন মুণ্ড, ভূমিতলে রক্তহাসির উচ্ছ্বাস, জাট-মোগলদের জয়নাদ 'দার্ উ গুর!' তাতারীদের জয়নাদ—'আল্লা হো আকবর!' গতির ঝড়, আহতদের মৃত্যু-চিৎকার।

তৈমুর শত্রুদের পতাকা কেড়ে নিলেন। পতাকা হারিয়ে জাট-মোগলরা হতাশ ভাবে পশ্চাৎপদ হতে লাগল।

এই সময়ে চাই হুসেনের দলকে! হুসেন এলেই যুদ্ধজয়!

তৈমুরের দূত হুসেনের কাছে ছুটে গিয়ে বললে, "আমার প্রভু

আপনাকে আহ্বান করেছেন—শীঘ্র আসুন!"

হুসেন চটে গিয়ে দূতের গালে প্রচণ্ড এক চড় বসিয়ে দিয়ে আমীরী চালে বললেন, "তৈমুর আমাকে হুকুম দিতে চায়, আমি কি কাপুরুষ?"

দূতের মুখে সব শুনে তৈমুর অনেক কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করলেন। তারপর হুসেনের দুই আত্মীয়ের দ্বারা বলে পাঠালেন, "জাট-মোগলেরা পালাবার জন্য প্রস্তুত, এখন সকলে মিলে আক্রমণ করলে জয়ী হব আমরাই।"

হুসেন সক্রোধে বললেন, "আমি কি পশ্চাৎপদ হয়েছি? তবে আমাকে বার বার অগ্রসর হতে বলা হচ্ছে কেন? সবুর কর, আগে আমি আমার সৈন্যদের এক জায়গায় এনে জড়ো করি!"

হুসেন তখনো গেলেন না। জাট-মোগলদের সংরক্ষিত সৈন্যরা তৈমুরকে ফিরে আক্রমণ করলে। ফল, তৈমুরের পরাজয়।

তৈমুর প্রতিজ্ঞা করলেন, "হুসেনের সঙ্গে আর কখনো যুদ্ধযাত্রা করব না।"

হুসেন তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "চল, আমরা ভারতবর্ষের দিকে যাই।"

তৈমুর তখন অগ্নিশর্মা হয়ে আছেন। উত্তর দিলেন, "ভারতবর্ষে বা নরকে, তুমি যেখানে খুশি যাও, তাতে আমার কি?"

হুসেনের দোষে নিশ্চিত জয় তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেল। এজন্যে হুসেনকে তিনি জীবনে আর ক্ষমা করেন নি। তৈমুরের শত্রুতা যে কি নিষ্ঠুর, হুসেন অল্পদিন পরেই তা বুঝতে পেরেছিলেন।

তৈমুর আবার সমরখন্দে ফিরে এসে দেখলেন, নিয়তির ভাণ্ডারে তাঁর জন্যে আরো নিদারুণ দুঃখ সঞ্চিত হয়ে আছে :—

তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী আলজাইকে মৃত্যু এসে হঠাৎ কেড়ে নিয়ে গেল।

কিন্তু এখন শোকের সময় নেই। সারা দেশ ছেয়ে ছুটে আসছে বিজয়ী শত্রুরা পঙ্গপালের মতন! বাধা দিতে হবে, তাদের বাধা দিতে হবে!

মুকুট ও সিংহাসন

"মদ্য, নৃত্য ও সঙ্গীতের সময় এসেছে! নৃত্যের ক্ষেত্র হচ্ছে রণক্ষেত্র; সঙ্গীত হচ্ছে অস্ত্রের ঝনৎকার আর যোদ্ধার জয়নাদ; এবং মদ্য হচ্ছে শত্রুর রক্ত!"—এই হল তৈমুরের উক্তি।

কিন্তু এই অপূর্ব 'মদ্য, নৃত্য ও সঙ্গীত' উপভোগের শক্তি হল না তৈমুরের। মহান খাঁ ইলিয়াজের সঙ্গে লড়াই করতে পারে, তাঁর অধীনে এমন সৈন্য আড়াই শতের বেশি নেই। অতএব তৈমুর অসাধ্যসাধনের চেষ্টা করলেন না।

দিনের বেলায় যথাসময়ে নমাজ করা এবং মসজিদে গিয়ে কোরান পাঠ শ্রবণ করা হল তাঁর প্রধান কর্তব্য। রাত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বসে থাকেন দাবার ছকের সামনে। প্রতিপক্ষ না থাকলেও একলাই ঘুঁটি সাজিয়ে খেলা করেন। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত দাবা-খেলোয়াড়। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজে পাওয়া যেত না।

তৈমুর একদিন একা-একা দাবা খেলছেন, এমন সময় সমরখন্দ থেকে একদল মোল্লা এসে হাজির।

—"খবর?"

—"বড় শুভ খবর! ভগবান তাঁর ভক্তদের দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন।

—"তার মানে?"

—"অবিশ্বাসীদের হাতে সমরখন্দ, এখনো আত্মসমর্পণ করে নি। যদিও আমীর হুসেন আর তৈমুরের সাহায্য পায় নি, তবু সমরখন্দের যোদ্ধারা শত্রুদের বাধা দেবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে এসেছে। আজ চেষ্টার ফল ফলেছে।"

—"যুদ্ধে জয় হয়েছে ?"

—"বিনা যুদ্ধে জয় হয়েছে ! ভগবানের প্রেরিত কি এক মহামারীর কবলে পড়ে জাট-মোগলদের অধিকাংশ ঘোড়া মারা গিয়েছে !"

তৈমুরের মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠল। তিনি জানতেন, ঘোড়া হারালে জাট-মোগলদের আর কোন জারিজুরিই থাকে না—এমন কি তারা হারিয়ে ফেলে যুদ্ধ করবার সমস্ত শক্তিই।

মোল্লারা সানন্দে জানালেন, "জাট-মোগলরা অস্ত্রশস্ত্র কাঁধে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীতে এর আগে কেউ কোন দিন জাট সৈনিকদের পায়ে হেঁটে চলতে দেখে নি ! তাতার অশ্বারোহীরা সুযোগ পেয়ে শত্রু-দের কুকুরের মতন তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে !"

তৈমুর বুঝলেন, আবার তাঁর আলস্যের দিন হল গত। এসেছে তাঁর অপূর্ব 'মদ্য, নৃত্য ও সঙ্গীত' উপভোগের সময় !

খবর পেয়ে আমীর হুসেনও সমরখন্দে ছুটে এলেন। সমরখন্দের উপরে তাঁর দাবি সর্বাগ্রে। তিনি এখানকার ভূতপূর্ব আমীরদের নাতি। সমরখন্দের বাসিন্দারা মহোৎসবের ভিতর দিয়ে সাদরে গ্রহণ করলে তাঁকে।

খ্যাতি-প্রতিপত্তিতে তৈমুরও ছিলেন হুসেনের সমযোগ্য, কিন্তু তিনি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন নি। তাঁকে তুষ্ট রাখবার জন্যে হুসেন তাঁকে সবুজ শহর ও তাঁর আশ-পাশের অনেকখানি জায়গা ছেড়ে দিলেন।

চলতি নিয়ম অনুসারে চেঙ্গিজ খাঁয়ের এক বংশধরকে সিংহাসনে বসিয়ে হুসেন তাঁর নামেই রাজ্য চালাতে লাগলেন।

তৈমুর মুখে কোন প্রতিবাদ করলেন না ; কিন্তু মনে মনে জানতেন, হুসেনের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব বজায় থাকা অসম্ভব। হুসেন তাঁর শ্যালক হলেও আলজাইয়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সমস্ত আত্মীয়তার সম্পর্ক চুকে গিয়েছে। হুসেন তাঁকে ছোট-নজরে দেখেন, বহুবার তাঁকে অপমান বা অবহেলা করেছেন, বিপদে ফেলেছেন। তারপর হুসেনের জন্যে তাঁর শেষ-পরাজয়ের জ্বালা কখনো তিনি ভুলতে পারবেন না।

এক আকাশে হাজার হাজার ছোট তারা থাকতে পারে, কিন্তু কে

কবে শুনেছে একাধিক সূর্যের কথা ?

কিছুদিন পরেই ছোট-বড় এটা-ওটা-সেটা নিয়ে মনান্তর আর মতান্তর হতে লাগল। দুজনেই যেখানে প্রভু হতে চায়, সেখানে গৃহ-কলহ বাধতে কতক্ষণ ?

কি নিয়ে যে আসল ঝগড়া বাধল, ইতিহাসে লেখা নেই, কিন্তু আরম্ভ হল যুদ্ধ। কেউ নিলে হুসেনের পক্ষ, কেউ নিলে তৈমুরের পক্ষ এবং দুই পক্ষেই রক্ত-পিপাসা সমান প্রবল। দেশ জুড়ে জেগে উঠল অস্ত্র-ঝঞ্জনা এবং তারই মাঝে মাঝে হঠাৎ জাট-মোগলরা আবির্ভূত হয়ে দুই পক্ষেরই উপরে দুরন্ত ঈগলের মতন ছোঁ মেরে চলে যায় !

এই ভাবে কেটে গেল দীর্ঘ ছয় বৎসর !

বলা বাহুল্য, প্রথম-প্রথম তৈমুরের চেয়ে হুসেনের পক্ষই ছিল সমধিক প্রবল। কিন্তু বীরত্বে, সাহসিকতায়, বুদ্ধি-চাতুর্যে ও কৌশলে তৈমুরের সঙ্গে যে হুসেনের তুলনাই হয় না, তার প্রমাণ এর আগেও পাওয়া গিয়েছে বারংবার। দেখতে দেখতে তৈমুর কেবল দলে ভারিই হয়ে উঠলেন না, যুদ্ধের পরে যুদ্ধ জয় ও কেল্লার পর কেল্লা দখল করতে লাগলেন। এ-সব ছোট-ছোট যুদ্ধের আলাদা-আলাদা বর্ণনা দেবার দরকার নেই।

হুসেনের ব্যবহারও ছিল না ভদ্র ও মিষ্ট। সে জন্যেও অনেক সর্দার তার পক্ষ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

একদিন তৈমুর সদলবলে উপবিষ্ট। হঠাৎ একটি মানুষ নিতান্ত ঘরের লোকের মতন সভায় এসে, অন্যান্য সভাসদদের মাঝখানে গিয়ে বসে পড়লেন বিনাবাক্যব্যয়ে !

সবাই সবিস্ময়ে চিনলে, তিনি হচ্ছেন হুসেনের দলের এক মস্তবড় মাতব্বর ও মাথাওয়ালা লোক। তাঁর নাম সর্দার মঙ্গলী বোগা, জাতে মোগল—তৈমুরের এক প্রধান শত্রু ! তৈমুর কিন্তু ব্যাপারটা বুঝলেন ; কোনরকম বিস্ময় প্রকাশ না করে মঙ্গলীর দিকে দিলেন খাবারের থালা এগিয়ে।

খাবার খেয়ে মঙ্গলী বললেন, "আজ আমীর তৈমুরের নুন খেলুম। আজ থেকে আমি আর কারুর দিকে ফিরে তাকাব না।"

কিছুকাল পরে এই সর্দার মঙ্গলী বুদ্ধির জোরে তৈমুরকে একটি যুদ্ধে জয়ী করেছিলেন।

তৈমুরের তাতারীদের সঙ্গে কারা ইউসুফ নামে এক তুর্কী সর্দারের সৈন্যদের বিষম লড়াই বেধেছিল। তুর্কীরা এমন ভাবে তাতারীদের ঘিরে ফেললে যে, তৈমুরের জয়লাভ করবার কোন সম্ভাবনাই আর দেখা গেল না।

হঠাৎ মঙ্গলী করলেন কি, মাটির দিকে হেঁট হয়ে পড়ে এক মৃত তুর্কীর দেহ থেকে তার দাড়ি-গোঁফওয়ালা মাথা-কামানো মুণ্ডটা বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে নিজের বর্শাদণ্ডের আগায় বসিয়ে দিলেন।

তারপর শূন্যে বর্শাদণ্ড নাচাতে নাচাতে তাতারীদের দলে ঢুকে বিকট চিৎকার করে বললেন, "জয়, জয়! দেখ—দেখ, আমি কারা ইউসুফকে বধ করেছি! এই দেখ তার মুণ্ড!"

তাতারীরা বিপুল আনন্দে যেন ক্ষেপে উঠে দ্বিগুণ উৎসাহে লড়তে লাগল এবং সেনাপতির মৃত্যু-সংবাদ শুনে তুর্কীরা হতাশ হয়ে বেগে পালাতে আরম্ভ করলে। তারা এমন অন্ধের মতন পালাতে লাগল যে, তাদের দেহের ঠেলার চোটে অত্যন্ত জীবন্ত ও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ কারা ইউসুফকেও ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে পলায়ন করতে হল।

ছয় বছর পরে দেখা গেল, তৈমুরের দল যেমন ভারি, হুসেনের দল তেমনি হালকা। হুসেন শেষ-যুদ্ধ দিলেন ইতিহাসখ্যাত বাল্ক শহরে। সেখানেও বিজয়লক্ষ্মী হলেন তাঁর প্রতি বিমুখ।

তৈমুরের কাছে হুসেন তখন আর্জি জানালেন, "আমি পরাজয় স্বীকার ও রাজ্য ত্যাগ করছি। তুমি আমাকে মক্কায় যেতে অনুমতি দাও।"

তৈমুর নারাজ হলেন না।

তারপর কি হল সঠিক জানা যায় নি। তবে শোনা যায়, তৈমুরের দুইজন সেনানী প্রভুর মতামতের অপেক্ষা না রেখেই, গোপনে হুসেনকে

হত্যা করে। খুব সম্ভব, তৈমুর ব্যাপারটা আগেই জানতে পেরেছিলেন, কিন্তু বাধা দেবার চেষ্টা করেন নি।

তৈমুর বাল্ক শহর ত্যাগ করলেন না। স্থির করলেন, এই শহরে বসেই তিনি দূর করবেন ভবিষ্যতের সমস্ত অনিশ্চয়তা। তাঁর একমাত্র প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী পরলোকে, নিজেকে জাহির করবার এত বড় সুযোগ ত্যাগ করা হচ্ছে মূর্খতা। তিনি বুঝেছিলেন, হুসেনের অবর্তমানে তাতার সর্দাররা একত্র সমবেত হয়ে নতুন এক আমীর নির্বাচন করতে আসবেন।

বাল্ক হচ্ছে আফগানিস্তানের অতি পুরাতন শহর। ইতিহাস-পূর্ব যুগে এই নগরে পারসী-ধর্মপ্রবর্তক জোরোয়াস্তারের জন্ম ও মৃত্যু হয়েছিল। এক সময়ে এখানে যে বৌদ্ধধর্মেরও প্রভাব ছিল, একটি বুদ্ধ-মূর্তির ধ্বংসাবশেষ সে প্রমাণ করে দেয়। গ্রীকদের ইতিহাস বিখ্যাত ব্যাকট্রিয়ার রাজধানী হয়ে এই নগর ব্যাবিলনের মতই সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল। আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট খ্রীস্টপূর্ব ৩২৮ অব্দে এই নগর আক্রমণ ও অধিকার করেছিলেন। ১২২০ খ্রীস্টাব্দে মোগল দিগ্বিজয়ী চেঙ্গীজ খাঁর হস্তে বাল্ক পরিণত হয়েছিল ধ্বংসস্তূপে। তারপর তৈমুর আবার একে গড়ে তোলেন। লোকে একে ডাকে 'নগরমাতা' বলে।

চারিদিক থেকে বাল্ক শহরে এসে জড়ো হলেন দলে দলে তাতার সর্দার। মস্ত সভা বসল। চলল তর্কাতর্কি। তৈমুর কিন্তু সভায় যোগ না দিয়ে তফাতে বসে দেখতে লাগলেন, বাতাসের গতি কোন দিকে।

এই কিছুকাল আগে তৈমুর পথে-পথে ঘুরে বেড়াতেন নিরাশ্রয় ভবঘুরের মতন। তিনি বড় বংশের ছেলে হলেও তাঁর দেহে নেই রাজ-রক্ত। কাজেই তাঁর প্রতিপক্ষের অভাব হল না।

তৈমুরের দলভুক্ত সর্দাররা বললেন, "রাজ্যকে সুশাসিত করতে হলে একজন যোগ্যতম প্রধান ব্যক্তির দরকার। তৈমুরের চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি কেউ নেই।"

আর একদল বললেন, "প্রচলিত বিধি অনুসারে কোন তাতারই মুকুট ধারণ করতে পারবে না। সিংহাসনে বসাতে হবে চেঙ্গীজ খাঁয়ের

কোন বংশধরকে !"

মোল্লারা বললেন, "মোগলরা হচ্ছে অবিশ্বাসী—ইসলামের বিরোধী। পুরানো নিয়ম চুলোয় যাক—তৈমুর হচ্ছেন মুসলমান, তিনি বিধর্মীর অধীন হতে যাবেন কেন? চেঙ্গীজ খাঁয়ের তরবারির চেয়ে তৈমুরের তরবারি ছোট নয়!

তৈমুরের দলই জয়ী হলেন। আজ থেকে তিনি হলেন স্বাধীন নৃপতি। ভারতবর্ষ থেকে অ্যারাল সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিশাল রাজ্য হল তাঁর হস্তগত।

তৈমুরের দৃষ্টি ফিরতে লাগল পূর্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে! এইবার আরম্ভ হবে তাঁর দিগ্বিজয়ী-জীবন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাম্রাজ্য ও দুর্ভাগ্য

সৈনিক তৈমুর আজ আমীর তৈমুর!

এতকাল তিনি অস্ত্র ধারণ করেছেন সবল হস্তে। এবার কতখানি যোগ্যতার সঙ্গে তিনি রাজদণ্ড ধারণ করেন, তা দেখবার জন্যে সকলেই কৌতূহলী হল।

যারা ভেবেছিল রাজ্য-চালনায় অনভ্যস্ত এই নতুন রাজার অনভিজ্ঞতার সুযোগে ঐশ্বর্য-ভাণ্ডার দুই হাতে লুণ্ঠন করবে, দুদিন পরেই ভেঙে গেল তাদের সুখ-স্বপ্ন!

তৈমুরের হাত দরাজ বটে, কিন্তু তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি ফেরে রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগে। তাঁকে ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব!

এবং যারা ভেবেছিল বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তার খাতিরে তৈমুর এর-ওর-তার হাতে প্রচুর ক্ষমতা ছেড়ে দেবেন, তাদেরও হতে হল হতাশ!

তৈমুরের কাছে যে-কোন সময়ে যে-কোন বন্ধুর অবারিত-দ্বার ছিল

বটে, কিন্তু রাজ্য-চালনার বল্গা রইল একমাত্র তাঁর নিজের হাতেই। কোন বিশেষ প্রিয়পাত্রকেও তিনি রাজদণ্ড স্পর্শ করতে দিলেন না।

এবং যারা ভেবেছিল রাজদণ্ড লাভ করে তৈমুর তাঁর তরবারিকে আর কোষমুক্ত করবেন না, তাদেরও বড় আশায় পড়ল ছাই।

সিংহাসনের উপরে বসে তৈমুর দেখলেন, রাজ্যের উত্তরদিকে পার্বত্য অঞ্চলে জাট-মোগলেরা এখনো যখন-তখন হানা দিতে ছাড়ছে না— গ্রামের পর গ্রাম সমর্পিত হচ্ছে সর্বগ্রাসী অগ্নির লেলিহান শিখায়— হাজার হাজার রক্তাক্ত তরবারির উত্থান-পতনে দিকে দিকে উঠছে গগন-ভেদী হাহাকার!

তৈমুর বুঝলেন, আত্মরক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে প্রতিপক্ষকে আক্রমণের সুযোগ না দিয়ে আক্রমণ করা। জাট-মোগলেরা আক্রমণ করতে যেমন অভ্যস্ত, আত্মরক্ষা করতে তেমন নয়।

তৈমুর জাট-মোগলদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করলেন। তারা জাট-মোগলদের দেশে গিয়ে চতুর্দিকে করলে বিষম অশান্তির সৃষ্টি। তারা গ্রামের পর গ্রামে আগুন ধরিয়ে দিলে, সর্বত্রই চলতে লাগল লুণ্ঠন, হত্যা ও অত্যাচারের অবিরাম লীলা। জাট-সৈনিকরা বাধা দিতে এসে বারবার হল পরাজিত। জাট-মোগলরা পরের উপরে যে ঔষধ প্রয়োগ করত, এবারে নিজেরা সেই ঔষধ খেতেই বাধ্য হল। তখন দায়ে পড়ে তাঁরা হার মানলে এবং তৈমুরকে স্বীকার করলে।

তারপর তৈমুরের দৃষ্টি ফিরল প্রতিবেশী রাজা-রাজড়াদের দিকে। খিভা, উরগঞ্জ ও অ্যারাল সমুদ্রের অধিপতির নাম ছিল খারেজমের সুফী।

সুফীর সুন্দরী মেয়ের নাম খান জেদ। দূত-মুখে তৈমুর জানালেন, নিজের ছেলে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে তিনি রাজকন্যা খান জেদের বিয়ে দিতে চান।

এ প্রস্তাবে সুফীর বংশ-মর্যাদায় আঘাত লাগল। ভবঘুরে তৈমুর ভুঁইফোঁড় রাজা হয়েছেন বটে, কিন্তু আজও তিনি আভিজাত্যের গর্ব করতে পারেন না। অতএব সুফী বলে পাঠালেন, "তোমার ছেলের সঙ্গে

আমার মেয়ের বিয়ে অসম্ভব।"

অসম্ভব? আজ তৈমুরের কাছে কিছুই অসম্ভব নয়। তাঁর শতযুদ্ধজয়ী তরবারি সব অসম্ভবকেই সম্ভবপর করতে পারে।

সিংহাসন থেকে নেমে তৈমুর আবার পরলেন বর্ম এবং হাতে নিলেন চর্ম, তরবারি ও ধনুর্বাণ। সামন্ত-রাজারা সদলবলে ছুটে এসে দাঁড়ালেন তাঁর পতাকার তলায়। তৈমুর করলেন যুদ্ধযাত্রা।

প্রথমেই হল খিভার পতন। তারপর তৈমুর উরগঞ্জ অবরোধ করলেন।

সুফী বলে পাঠালেন, "তৈমুর, ঝগড়া কেবল তোমাতে-আমাতে। আমাদের ব্যক্তিগত ঝগড়ার জন্যে হাজার-হাজার লোক প্রাণ দেবে কেন? তার চেয়ে এস, আমরা দুজনেই দ্বন্দ্বযুদ্ধ করি।"

তৈমুর বললেন, "উত্তম! রাজি। তোমার নগরের প্রধান সিংহদ্বারের সামনেই আমাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হবে।"

সেনাপতিরা বললেন, "তোমার স্থান সিংহাসনে। তুমি দেবে হুকুম, আমরা করব হুকুম পালন। আমরা থাকতে তুমি তরবারি ধরবে কেন?"

তৈমুর বললেন, "তা হয় না। সুফীর কোন সেনাপতি আমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলে আমি তোমাদেরই কারুকে পাঠাতে পারতুম। কিন্তু আমাকে আহ্বান করেছেন একজন রাজা, সুতরাং আমাকে নিজেই যেতে হবে।"

তৈমুর ঘোড়া ছোটালেন। সৈফুদ্দীন নামে এক প্রাচীন সেনানী দৌড়ে গিয়ে তাঁর ঘোড়ার রাশ চেপে ধরে বললেন, "না প্রভু, একজন সাধারণ সৈনিকের মতন এমন করে আপনি যুদ্ধে যেতে পারবেন না।"

তাঁর এই অতি-ভক্ত অনুচরটিকে মুখে কোন জবাব না দিয়ে তৈমুর নিজের তরবারির উল্টো পিঠের দ্বারা তাঁকে আঘাত করতে গেলেন।

সৈফুদ্দীন আঘাত এড়াবার জন্যে তাড়াতাড়ি ঘোড়ার রাশ ছেড়ে সরে এলেন।

শত্রু নগরের প্রাচীরের উপরিভাগ তখন লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছে,—আমীর তৈমুর স্বয়ং একাকী এসেছেন প্রধান সিংহদ্বারের

সামনে। সকলেই অবাক ও হতভম্ভ!

তৈমুর হাঁক দিলেন, "ওহে, তোমাদের কর্তা সুফীকে খবর দাও। বল, আমীর তৈমুর তাঁর জন্যে অপেক্ষা করেছেন।"

অদ্ভুত সাহস ও বীরত্ব! শত শত বল্লম ও ধনুক উদ্যত হয়ে আছে তাঁর মাথার উপরে, কিন্তু তৈমুরের ভ্রূক্ষেপও নেই! আমীর তৈমুর আজও যুবকের মতনই ডানপিটে!

তৈমুর তাঁর ঘোড়া "বাদামি ছোকরা"র পিঠে চড়ে অনেকক্ষণ এদিক-ওদিক করলেন, কিন্তু সুফীর দাড়ীর প্রান্তটুকুও দেখা গেল না!

তৈমুর ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, "যে নিজের বাক্যরক্ষা করতে পারে না, সে নিজের প্রাণও রক্ষা করতে পারবে না!" তারপর ফিরে গেলেন নিজের দলে।

আমীরকে অক্ষত দেহে নিরাপদে ফিরে আসতে দেখে সৈন্যরা সমস্বরে জয়ধ্বনি করে উঠল—আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে বাজতে লাগল কাড়া-নাকাড়া এবং তূরী-ভেরী!

কিন্তু আর বেশিদিন তৈমুরকে নগর অবরোধ করে থাকতে হল না। তাঁর কথা ফলে গেল দৈব বাণীর মতন। সুফী হঠাৎ রোগশয্যায় শুয়ে প্রাণত্যাগ করলেন। নগরবাসীরাও করলে আত্মসমর্পণ। সুফীর মস্ত রাজ্য হল তৈমুরের হস্তগত, এবং রাজকন্যা খান জেদের পাণিপীড়ন করলেন তৈমুর-পুত্র জাহাঙ্গীর।

সে-সময়ে ও-অঞ্চলে ভারত-সীমান্তের হিরাট-শহরের নাম-ডাক ছিল অসাধারণ। মস্ত-বড় শহর, তার মধ্যে বাস করে আড়াই লক্ষ মানুষ। তখনকার দিনে এত-বেশি জনসংখ্যার জন্যে গর্ব করতে পারে পৃথিবীতে এমন শহর দুই-তিনটির বেশি ছিল না—লণ্ডন ও প্যারিসেরই লোকসংখ্যা ছিল ষাট হাজারের মধ্যে। হিরাটের মধ্যে বিদ্যালয় ছিল কয়েক শত, স্নানাগার ছিল তিন হাজার এবং দোকান ছিল প্রায় দশ হাজার।

হিরাটের অধিপতির উপাধি 'মালিক'। তৈমুর দূত পাঠিয়ে জানতে

চাইলেন, মালিক তাঁর সামন্ত-রাজা হতে রাজি আছেন কিনা ?

না, মালিক রাজি নন। উল্টে তৈমুরের দূতকে তিনি করলেন বন্দী।

নগ্ন অসি হস্তে তৈমুর আবার সসৈন্যে বেরিয়ে পড়লেন। হিরাটের পতন হতে দেরি লাগল না।

এই হিরাটের যুদ্ধে তৈমুরের দেহের দুই জায়গায় বিদ্ধ হয়েছিল দুইটি তীর। অধিকাংশ সেনাপতির মতন তৈমুর কখনো নিজে নিরাপদ জায়গায় দাঁড়িয়ে সৈন্য চালনা করতেন না। যুদ্ধ যেখানে ভয়াবহ, তৈমুরকে দেখা যেত সেইখানেই।

হিরাট জয়ের পরে তৈমুরের রাজ্য হল চারিদিকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। 'সবুজ শহর' সুন্দর নগর বটে, কিন্তু এত-বড় রাজ্যের রাজধানী হবার উপযোগী নয়। তৈমুর তখন সমরখন্দকে নিজের রাজধানী বলে ঘোষণা করলেন।

অতি প্রাচীন নগর এই সমরখন্দ। তৈমুরের আগে আরো দুইজন বিশ্ববিখ্যাত দিগ্বিজয়ী এখানে এসে আস্তানা গেড়েছিলেন—আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট ও চেঙ্গীজ খাঁ।

সমরখন্দের খ্যাতি অসামান্য হলেও তার নানা দিক তখন পরিণত হয়েছিল ধ্বংসস্তূপে। তৈমুর নিজের হাতে সমরখন্দকে আবার নতুন করে গড়ে তোলবার চেষ্টায় নিযুক্ত হলেন।

নতুন-নতুন পাথরে বাঁধানো প্রশস্ত রাজপথ, মনোরম তরু-বীথি, রঙিন উদ্যান ও অপূর্ব সব প্রাসাদের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে সমরখন্দ হয়ে উঠল বিচিত্র এবং মোহনীয়।

এমন কি নগরের রং পর্যন্ত গেল বদলে! তাতারীদের প্রিয় হচ্ছে নীল রং—যা থাকে অসীম আকাশে, অনন্ত সাগরে ও মেঘচুম্বী গার-শিখরে। তৈমুর নতুন সমরখন্দেরও গায়ে মাখিয়ে দিলেন সেই রং। তার নতুন নাম হল 'নীল নগর'।

তৈমুরের প্রথম পুত্র জাহাঙ্গীরের একটি ছেলে হল।

তৈমুর নিজেও দ্বিতীয় বিবাহ করলেন শ্যালক হুসেনের পরমা সুন্দরী

বিধবাকে! তার নাম সেরাই খানুম। এটা ছিল প্রাচীন মোগলদের চিরাচরিত নিয়ম। পরাজিত ও নিহত রাজাদের সহধর্মিণীদের বিবাহ করতেন বিজয়ী রাজারা।

বংশগৌরবে সেরাই খানুমের তুলনা ছিল না। তাঁর ধমনীতে ছিল চেঙ্গীজ খাঁয়ের রক্ত। তিনি তৈমুরের উপযুক্ত সহধর্মিণী—অশ্বপৃষ্ঠে প্রায়ই যেতেন গভীর অরণ্যে শিকার করতে।

কিন্তু তৈমুরের অশান্ত মন সিংহাসনের নরম গদীর উপরে কোনদিনই তুষ্ট থাকতে পারত না। রাজধানীর মধ্যে তাঁর দেখা পাওয়া যেত খুবই কম। তাঁর খবর আসত দূর দেশ থেকে। তিনি প্রকাণ্ড সেনাদল নিয়ে ফিরতেন আজ এ-দেশে, কাল সে-দেশে—কখনো পূর্বে, কখনো পশ্চিমে—কখনো খোরাসানের পথে, কখনো কাস্পিয়ানের তটে।

অবশেষে তিনি একদিন ছুটলেন উত্তর দিকে—গোবি মরুভূমির দিকে। সেখানে শেষ-মোগল কামারুদ্দীন তাঁর কাছে পরাজিত হয়ে পলায়ন করলেন। মোগলদের সব আশা নির্মূল হয়ে গেল এবং তৈমুরের রাজ্য পরিণত হল সাম্রাজ্যে!

বিজেতা তৈমুর যশোগৌরবে সমুজ্জ্বল হয়ে দেশে ফিরে এলেন। সমরখন্দের নিকটবর্তী এক পথের কাছে এসে দেখলেন, তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে এক বিপুল জনতা।

জনতার ভিতর থেকে বেরিয়ে তৈমুরের সামনে এসে দাঁড়ালেন সব-চেয়ে প্রাচীন ওমরাও সৈফুদ্দীন। তাঁর মাথা হেঁট, মুখ নীরব।

তৈমুর বললেন, "দুঃসংবাদ আছে? বলতে ভয় হচ্ছে?"

সৈফুদ্দীন বললেন, "যুবরাজ জাহাঙ্গীর আর ইহলোকে নেই।"

জাহাঙ্গীরকে তৈমুর প্রাণের চেয়ে ভালোবাসতেন। কিন্তু তাঁর প্রৌঢ় মুখের একটি মাংসপেশীও কুঞ্চিত হল না। কেবল বলতেন, "সৈফুদ্দীন, তোমার ঘোড়ায় চড়ো। সৈন্যগণ, রাজধানীর দিকে যাত্রা কর।"

* * * *

তৈমুর এতদিনে অসংখ্য যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন। কিন্তু জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর

পর থেকে তিনি যে-সব যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছেন, সেই-সব যুদ্ধই আজ পৃথিবীতে তাঁকে অমর করে রেখেছে।

সপ্তম অধ্যায়

হৈম সংঘ

১৩৭০-১৩৮০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে চেঙ্গীজ খাঁয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মহা-সাম্রাজ্যের অধিকাংশই মানচিত্রের উপর থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু তৈমুরের সাম্রাজ্যের উত্তরে ও পূর্বে চেঙ্গীজের বংশধররা তখনো বিরাট এক ভূভাগের উপরে শাসনদণ্ড পরিচালনা করতেন। একে ডাকা হত 'হৈম সংঘ' নামে।

কেবল এর শাসনকর্তারা ছিলেন মোগলবংশীয়। অধীন জাতিদের মধ্যে নানাদেশীয় যাযাবরদের সঙ্গে ছিল অসংখ্য রুসীয়, বুলগেরীয়, আর্মেনিয়ান ও বেদে প্রভৃতি। আধুনিক রুসিয়ার অধিকাংশই ছিল এই হৈম সংঘের অধীনে।

শাসক-সম্প্রদায় বা মোগলরা ছিল অর্ধ-পৌত্তলিক। তাদের তৈমুরের তাতারদের জাত-ভাই বলা যায়। তাদের প্রধান দুই নগর ছিল ভোল্গা নদীর তীরবর্তী সরাই এবং কাস্পিয়ান সাগর-তটস্থ অস্ট্রোকান। সুদীর্ঘ দেড় শত বৎসর কাল ধরে ইউরোপের শিয়রে তারা জেগেছিল দারুণ দুঃস্বপ্নের মতন। পূর্ব-ইউরোপ তাদের হস্তগত ছিল তো বটেই, তার উপরে তারা পোল্যাণ্ডেও এসে হানা দিয়েছিল।

মস্কোর রাজকুমার মিট্রি একবার মাত্র দেড় লক্ষ রুসিয় সৈন্য নিয়ে এই মোগলদের আক্রমণ করে হারিয়ে দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু এ সৌভাগ্য বেশি দিন স্থায়ী হয় নি।

এই সময়ে মোগল-সম্রাট ছিলেন উরুস খাঁ।

উরুস খাঁয়ের এক নিকট-আত্মীয়ের নাম তোক্তামিস। সম্ভবত সিংহাসনের পথ নিষ্কণ্টক করবার জন্যেই একদিন তিনি উরুস খাঁয়ের পুত্রকে হত্যা করে তৈমুরের কাছে পালিয়ে গেলেন।

মোগলদের দূত তৈমুরের কাছে গিয়ে জানালে, "পূর্ব ও পশ্চিমের প্রভু মহামহিমময় উরুস খাঁ আমাকে পাঠিয়েছেন। তৈমুর, হয় তুমি তোক্তামিসকে আমাদের হাতে সমর্পণ কর, নয় কর অস্ত্রধারণ।"

তৈমুরের চোখে জাগছে তখন পৃথিবী-বিজয়ের স্বপ্ন। তিনি বুঝলেন এ-স্বপ্ন সফল করতে গেলে মোগলদের সঙ্গে একদিন-না-একদিন তাঁকে শক্তিপরীক্ষা করতে হবেই। এ সুযোগ তিনি ছাড়লেন না।

তৈমুর বললেন, "দূত, তোক্তামিস আমার আশ্রিত। তাঁকে আমি ত্যাগ করব না। উরুস খাঁকে জানিও, আমি অস্ত্রধারণ করতে প্রস্তুত।"

দূত ফিরে গেল। তৈমুর তোক্তামিসকে 'পুত্র' বলে ডাকলেন। এবং হৈম সংঘের মোগলদের কাছ থেকে দুটি শহর কেড়ে নিয়ে তোক্তামিসের হাতে সমর্পণ করলেন। উপরন্তু তাঁকে অনেক সৈন্যসামন্ত, অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ-সম্পত্তিও উপহার দিতে ভুললেন না।

তোক্তামিস হৈম সংঘের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন, কিন্তু পরাজিত হলেন।

তৈমুর আবার তাঁকে নতুন সৈন্য দিলেন। তোক্তামিস আবার করলেন যুদ্ধযাত্রা। কিন্তু আবার হেরে ভূত হয়ে, কোনরকমে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে এলেন তৈমুরের কাছে।

এমনি সময়ে উরুস খাঁয়ের মৃত্যু হল এবং তোক্তামিস যুদ্ধে হেরেও লাভ করলেন হৈম সংঘের সিংহাসন!

রাজধানী সরাই শহরে গিয়ে তোক্তামিস প্রথমেই মস্কো ও রুসিয়ার রাজাদের কাছ থেকে কর চেয়ে পাঠালেন।

এরই দুই বছর আগে মিট্রির নায়কতায় রুসিয়রা হয়েছিল যুদ্ধে জয়ী। তারা কর দিতে রাজি হল না।

মোগলরা বাঁধ-ভাঙা বন্যার মতন রুসিয়ার উপরে ভেঙে পড়ল।

রুসিয়ার গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর দিগ্বিদিকব্যাপী অগ্নি-শিখায় পুড়ে ছাই হয়ে গেল—লক্ষ লক্ষ লোক হল হত ও আহত এবং মস্কো হল তোক্তামিসের হস্তগত। সমগ্র রুসিয়া রক্তাক্ত হয়ে আবার মোগলদের অধীনতা স্বীকার করলে।

তোক্তামিস এখন আর পলাতক ও পরের গলগ্রহ নন—হচ্ছেন অর্ধ ইউরোপ-এশিয়ার সম্রাট! তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতার কোনই মূল্য নেই।

সমরখন্দের আশ্চর্য ঐশ্বর্য স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ তাঁর হয়েছে। সেখানে তৈমুরের আশ্রয়ে বেশ কিছুকাল বাস করে তিনি যে বিলাসিতার আস্বাদ পেয়েছেন, মোগল-সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসেও তা ভুলতে পারলেন না।

তৈমুর তখন রাজধানী থেকে বহুদূরে—কাস্পিয়ান সমুদ্রের তীরে।

ঠিক সাতদিনে নয়শত মাইল পার হয়ে রাজধানী সমরখন্দ থেকে এক অশ্বারোহী বার্তাবহ এসে উপস্থিত!

কি খবর? না, তোক্তামিসের মোগলবাহিনী সমরখন্দের অনতিদূরে এসে হাজির হয়েছে!

তৈমুর বিদ্যুৎ-বেগে তখনি যুদ্ধযাত্রা করলেন।

তৈমুরের পুত্র ওমর শেখ প্রাণপণে যুদ্ধ করেও মোগলদের কাছে হেরে গিয়েছেন, তাতার সৈন্যেরা পলাতক। শত্রুরা বোখারা পর্যন্ত এসেছে —সেখানকার রাজপ্রাসাদ পুড়িয়ে দিয়েছে। সুযোগ দেখে উরগঞ্জের সুফীরা এবং চিরশত্রু জাট-মোগলরা আবার বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।

কিন্তু ঘটনাক্ষেত্রে তৈমুরের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্য-পরিবর্তন!

তোক্তামিস সদলবলে সরে পড়লেন। সুফী জাটদের দেশ প্রায় সমভূমিতে পরিণত করে তৈমুর সেখানকার বাসিন্দাদের বন্দী করে সমরখন্দে নিয়ে এলেন।

তৈমুর বললেন, "নিমকহারাম তোক্তামিস অকারণে আমার রাজ্য আক্রমণ করেছে—আমার প্রজাদের উপরে অত্যাচার করেছে। এর প্রতিশোধ চাই।"

আমীর-ওমরাওরা জিজ্ঞাসা করলেন, "কি প্রতিশোধ সম্রাট ?"

—"আমি তোক্তামিসকে দমন করব, তার রাজ্য আক্রমণ করব।"

—"সম্রাট, সে যে অসম্ভব! তোক্তামিসকে ধরতে হলে হাজার হাজার মাইল ব্যাপী মরুভূমির মধ্যে ছুটে বেড়াতে হবে। সে যে কোথায় লুকিয়ে আছে কেউ তা জানে না। আমাদের উচিত, আবার তার দেখা না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা।"

—"কিসের জন্যে অপেক্ষা করব? বিশ্বজয়ের সময় এসেছে এখন আর অপেক্ষা নয়। তাঁবু ওঠাও! যাত্রা কর!"

বেজে উঠল তূরী ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ, দামামা ডিমি-ডিমি-ডিমি। উড়ল নিশান, ছুটল অশ্বারোহী, কাঁপল পৃথিবীর প্রাণ! কাতারে কাতারে তাতারের দল চলল এক বিস্ময়কর কীর্তি স্থাপন করতে।

বুদ্ধিমান আমীর-ওমরাওরা সভয়ে ভাবলেন, তাঁরা আজ যাত্রা করেছেন বিরাট এক শ্মশানের দিকে—যেখানে বাস করে কেবল মৃত্যু, মড়ক ও দুর্ভিক্ষ!

তাঁদের ধারণা নিতান্ত ভ্রান্ত নয়। তৈমুরের কয়েক শতাব্দী পরে এই ভয়াবহ পথে পা বাড়িয়ে নেপোলিয়ন বিজয়ী হয়েও তাঁর বিরাট বাহিনীকে রেখে গিয়েছিলেন রুসিয়ার তুষার-সমাধির মধ্যে!

পিটার দি গ্রেট রুসিয়ারই সম্রাট। ১৬১৬ খ্রীস্টাব্দে এই পথে তুর্কীদের বিরুদ্ধে তিনি মস্ত একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। তাদের একজনও ফিরে যায় নি।

তারও এক শতাব্দী পরে আর একদল রুসিয় সৈন্য কাউণ্ট পেরো-ভস্কির অধীনে এই পথে যাত্রা করে। বিনা যুদ্ধেই অধিকাংশ সৈন্য হারিয়ে সেবারেও কাউণ্টকে হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হয়।

আর আজও বিজ্ঞানের এই সর্বাঙ্গীন উন্নতির যুগে রুসিয়ার তুষার-মরুর মধ্যে দুর্ধর্ষ জার্মানদের যে কি হাহাকার করতে হয়েছে, আমাদের কারুর তা শুনতে বাকী নেই।

সুতরাং আমীর-ওমরাওরা অকারণে ভয় পান নি।

কিন্তু তৈমুর ফিরলেন না। তাঁর তিনটি মূলমন্ত্র ছিল।

প্রথম : নিজের রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ করব না।

দ্বিতীয় : আত্মরক্ষা নয়, আক্রমণ করা।

তৃতীয় : যত-শীঘ্র সম্ভব, শত্রুর উপরে গিয়ে পড়া।

তৈমুর বলতেন, "যথাস্থানে যথাসময়ে দশ হাজার লোক না পেলে দশজন লোক নিয়েও হাজির হওয়া ভালো! শত্রুরা পূর্ণশক্তি সঞ্চয় করবার আগেই তাদের আক্রমণ করা উচিত।"

তৈমুরের আগে আলেকজাণ্ডার ও তৈমুরের পরে নেপোলিয়নও এই যুদ্ধরীতির অনুসরণ করেছিলেন।

তোক্তামিস যুদ্ধ করবেন নিজের দেশে। তাঁকে রুসিদের জন্যে ভাবতে হবে না এবং তাঁর সৈন্য তৈমুরের তুলনায় অসংখ্য। কিন্তু তবু তৈমুর ভয় পেলেন না—ছুটে চললেন ঝড়ের মতন। তৈমুর অগ্রসর হন, তোক্তামিস যুদ্ধ করে না, খালি পিছিয়ে যান; এবং পিছিয়ে যেতে যেতে সমস্ত গ্রাম, শহর, খাদ্য, শস্য পুড়িয়ে দিয়ে যান; অর্থাৎ নেপোলিয়নের সময়ে এবং গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মান আক্রমণের দিনে রুসিয়রা যে প্রথা অবলম্বন করেছে এবং এখন পৃথিবীর সমস্ত সামরিক জাতিই যে প্রথার উপকারিতা বুঝতে পেরেছে, তার প্রথম সৃষ্টি হয় সেই তৈমুরের যুগেই চতুর্দশ শতাব্দীতে।

দিনের পর দিন, হপ্তার পর হপ্তা! চলেছে তাতার সৈন্যশ্রেণী এবং তাদের সঙ্গে চলেছে এমন সব প্রকাণ্ড শকট, যেগুলোর এক-একখানা চাকাই হচ্ছে মানুষের মাথার সমান উঁচু! এই সব গাড়ির ভিতরে আছে আবশ্যকীয় সমস্ত জিনিস এবং খাদ্যদ্রব্য—ময়দা, বার্লি ও শুকনো ফলমূল প্রভৃতি। প্রত্যেক সৈন্যের সঙ্গে আছে দুটো করে ঘোড়া। প্রত্যেক সৈনিকই অশ্বারোহী।

রীতিমত মরুভূমি—বালিয়াড়ির পর বালিয়াড়ি, ঝোড়ো হাওয়া সেই মরু-সাগরে সৃষ্টি করে বালুকার তরঙ্গ! বেজে ওঠে সাতফুট লম্বা তাতার তুরী, তারই সঙ্কেত-ধ্বনি শুনে সৈন্যরা তাঁবু ফেলে বা তাঁবু তোলে।

মরু-বালুকার পর এল বৃক্ষহীন তৃণপ্রান্তরের দেশ। এ প্রান্তর যেন অনন্ত—কোথাও ছায়া নেই, আশ্রয় নেই, লোকালয় নেই—এমন কি শত্রুও নেই!

মাঝে-মাঝে শত্রুর চিহ্ন দেখা যায়। উট, ঘোড়া বা মানুষের পায়ের দাগ, নির্বাপিত আগুনের চিহ্ন বা মানুষের মাংসহীন কঙ্কাল!

প্রত্যেক সৈনিকের বরাদ্দ ছিল মাসে ষোলো সের ময়দা। কিন্তু অবশেষে ফুরিয়ে গেল ময়দা। ঘোড়াদের ঘাসের অভাব হল না বটে, কিন্তু মানুষেরা মূল কুড়িয়ে বা পাখির ডিম সংগ্রহ করে কোনরকমে বেঁচে রইল মাত্র।

আমীর-ওমরাওরা মাথা নেড়ে বিষণ্ণভাবে বলতে লাগলেন, "এ আমরা আগেই জানতুম! এখন আর ফিরে যাবারও উপায় নেই—এই-বারে সবাইকে মরতে হবে অনাহারে।"

তৈমুরের মুখে কিন্তু চিন্তার রেখা নেই। তিনি দেখলেন, এই মাঠ-ভূমিতে গাছপালা নেই বটে, কিন্তু পাঁচ-ছয়-সাত ফুট উঁচু এক জাতের তৃণ আছে।

তখন তাঁর হুকুমে এক লক্ষ সৈন্য ত্রিশ মাইল জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে বিপুল এক মণ্ডলের সৃষ্টি করলে এবং ক্রমেই এগিয়ে এসে তারা মণ্ডলের আকার ছোট করে আনতে লাগল। তখন একলক্ষ লোকের গগনভেদী চিৎকারে তুরী-ভেরী-দামামার ধ্বনিতে ভয় পেয়ে সেই সুদীর্ঘ তৃণদলের ভিতর থেকে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল পালে পালে খরগোস, মৃগ, বরাহ, নেকড়ে, ভাল্লুক ও 'এলফ' বা মহিষের মতন বড় বড় হরিণ! ক্ষুধার্ত তাতারদের সেই সাংঘাতিক মণ্ডলের মধ্যে থেকে একটি মাত্র খরগোসও বাইরে পালাতে পারলে না!

খাদ্যের দুর্ভাবনা দূর হল তৈমুরের অদ্ভুত বুদ্ধিবলে। মাংস ভালো ভাবে রক্ষা করতে পারলে এখন বেশ কিছুকাল আহার্যের অভাব হবে না। শত্রুরা তাদের অনাহারে মারতে চায়, কিন্তু তৈমুরের প্রতিভা ব্যর্থ করে দিলে তাদের সেই অপচেষ্টা!

তৈমুর বললেন, "সৈন্যগণ, আজ তোমাদের ছুটি। খাও-দাও, আমোদ কর।"

সারি সারি তাঁবু পড়ল। বহুদিন পরে সৈনিকরা পেট ভরে খেয়ে হাসিখুশি নাচগানে মেতে উঠল।

পরদিনেই আবার ছয় ফুট বড় ডঙ্কা গম্ভীর স্বরে বেজে উঠে সকলকে জানিয়ে দিলে—"আর বিশ্রাম নয়—যাত্রা কর, যাত্রা কর, যাত্রা কর।"

এইবার সামনে আছে আর এক ভয়ানক দেশ, লোকে যার নাম রেখেছে 'ছায়াচরের মুল্লুক'।

অষ্টম অধ্যায়

মস্কো

নদীর স্রোতে ভেসে যাচ্ছে জলজ গাছপালা; পায়ের তলায় শৈবাল-দলের পিচ্ছিল স্পর্শ কিংবা সঙ্কটময় জলাভূমি; কোথাও শৈলপৃষ্ঠে আশ্রয় নিয়েছে রক্তবর্ণ লতা। এ হচ্ছে স্তব্ধতার স্বদেশ। বৃক্ষমালার উপর দিয়ে উড়ে যায় বাজপাখিরা; কিন্তু সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শোনা যায় না গীতকারী পাখিদের কণ্ঠস্বর; আকাশের নীলিমা অম্লান নয়, ময়লা; দূরে দূরে কুয়াশা ভেদ করে দেখা যায় পৃথিবীর গায়ে আবের মতন মাটির স্তূপ—সেগুলো হচ্ছে চিরমৌন মানুষের সমাধি।

ভ্রমণকারী ইবন বতুতা লিখেছেন: "এ হচ্ছে ছায়াচরের মুল্লুক; এখানে যারা বাস করে, কেউ তাদের দেখা পায় না। এখানে গ্রীষ্মের দিন এবং শীতের রাত্রি হচ্ছে সুদীর্ঘ।"

তৈমুরের সেনাদল মনে করলে, তারা এমন কোন দেশে এসে পড়েছে যেখানে মানুষের বসতি নেই। এ মরুভূমি নয় বটে, কিন্তু মানুষের চিহ্ন-হীন এ দেশ হচ্ছে মরুর চেয়ে ভয়াবহ। গুপ্তচররা ছুটে গেল, কিন্তু

একজন মাত্র মানুষকে আবিষ্কার করতে পারলে না কোথাও!

তৈমুর তাঁর পুত্র ওমর সেখকে ডেকে বললেন, "বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে তুমি এগিয়ে যাও। যেমন করে পারো, হৈম সংঘের খবর আনো।"

দিন-কয় পরে খবর এল, সুদূরের বৃক্ষহীন প্রান্তরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় সত্তরটি ভস্ম-স্তূপ পাওয়া গেছে। দুই-এক দিনের ভিতরে অনেক লোক সেখানে যেন ছাউনি ফেলে আগুন জ্বেলে রান্নাবান্না করেছিল!

এই সামান্য সূত্রকেই তৈমুর মনে করলেন আসামান্য! ছোট্ট আর একদল সৈন্য নিয়ে তখনি তিনি ছুটলেন সেই দিকে। পথে পড়ল সুমেরুগামী টোবল নদী। তৈমুর সাঁৎরে নদী পার হয়ে ছেলের সঙ্গে যোগ দিলেন।

তারপর তৈমুরের চরেরা দৈবগতিকে হঠাৎ একদিন প্রধান দল থেকে বিচ্ছিন্ন দশজন শত্রু-সৈন্যকে গ্রেপ্তার করে ফেললে। বন্দীদের মুখ থেকে খবর পাওয়া গেল, তোক্তামিস সসৈন্যে যাত্রা করেছেন পশ্চিম দিকে।

আরো কিছুদিন একই লুকোচুরি খেলা চলল। তৈমুর বুঝলেন, এ বড় সহজ শত্রু নয়। এরা দেখা দেয় না, কিন্তু লুকিয়ে সব লক্ষ্য করে।

এরা পিছিয়ে যায়, কিন্তু যে কোন অসতর্ক মুহূর্তে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মতন ঘাড়ের উপরে লাফিয়ে পড়তে পারে। দরকার হলে এরা ঘোড়ার পিঠে চড়ে এক দিনে একশো মাইল পার হয়ে যায়।

তবু তিনি দমলেন না, থামলেন না। তোক্তামিসকে হাঁপ ছাড়বার ছুটি না দিয়ে ঝড়ের মতন এগিয়ে চললেন—একেবারে উরাল নদীর ওপারে।

তোক্তামিস দেখলেন, নাছোড়বান্দা তৈমুরের হাত ছাড়ানো অসম্ভব। জনহীন খাদ্যহীন দিগ্বিদিকহারা মরু-প্রান্তর, বেগবতী নদীর পর নদী, তুষারের ঝটিকা, বর্ষার প্রবল ধারা,—তবু তৈমুর আসছেন তাঁর পিছনে পিছনে। অবশেষে হতাশ হয়ে তোক্তামিস সসৈন্যে ফিরে দাঁড়ালেন।

তৈমুর তো তাইই চান। এত কষ্টের পর তাঁর আঠারো সপ্তাহ ধরে আঠারো শত মাইল ব্যাপী পথ-চলার শেষ হল। আজ এস্পার কি ওস্পার। হয় জয়, নয় মৃত্যু!

নিজের দলের দিকে ফিরে তৈমুর হুকুম দিলেন, "সৈন্যগণ, ঘোড়া থেকে নেমে পড়! বাকি যা খাবার আছে, সব খেয়ে শেষ করে ফেল! তারপর অস্ত্র ধর, যুদ্ধ কর!"

যুদ্ধ আরম্ভ হল। শত্রুরা সংখ্যায় বেশি, কিন্তু তাতাররা তখন মরিয়া। তারা জানে, এ যুদ্ধে জয়লাভ করতে না পারলে তাদের একজনকেও আর দেশে ফিরতে হবে না। মৃত্যুপণ করেই তারা লড়তে লাগল। তারা শত্রুর কাছে দয়াও চাইবে না, শত্রুকে দয়াও করবে না।

বহুক্ষণ যুদ্ধের পর তোক্তামিসের দল সংখ্যাধিক্যের জন্যে যখন প্রবল হয়ে উঠেছে, তৈমুর তখন নিজের রক্ষীদল নিয়ে পর্বত-প্রাচীরের মতন শত্রুদের উপরে ভেঙে পড়লেন। তাঁর বিষম চাপ সহ্য করতে না পেরে তোক্তামিস নিজের ফৌজ ফেলে পলায়ন করলেন। নায়ককে হারিয়ে শত্রুদের সমস্ত শৃঙ্খলা ভেঙে গেল—তাতারদের হাজার হাজার তরবারি করলে রক্তসাগর সৃষ্টি!

সেইদিন হল ইউরোপবিখ্যাত মহা-পরাক্রান্ত হৈম সংঘের পতন! যুদ্ধক্ষেত্রে একলক্ষ মৃতদেহ ফেলে বাকি মোগলরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করলে। তাতাররা ছুটল তাদের পিছনে পিছনে।

তারপর আরম্ভ হল লুণ্ঠন। ডন নদীর দুই তীরে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে চলল হত্যা, অত্যাচার ও লুণ্ঠনের নিষ্ঠুর লীলা। বাঁদী করবার জন্যে যে কত হাজার নারীকেও বন্দী করা হল তার আর সংখ্যা নেই। তাতাররা গরু, মেষ ও উট এবং ক্ষেতের ফসল কিছুই ছাড়লে না। আর এত সোনা-রুপো হীরে-জহরত নিয়ে এল যে, প্রত্যেক তাতার সৈনিকের পেটের ভাবনা ঘুচে গেল জীবনের মতন!

আট মাস পরে বিজয়ী তৈমুর আবার নিজের রাজধানী সমরখন্দে ফিরে এলেন।

কিন্তু এর পরেও তোক্তামিসের জ্ঞান হল না। তিন বৎসর যেতে না-যেতেই তিনি আবার কাস্পিয়ান সাগরের উত্তর তটে দস্যুতা শুরু করলেন।

তৈমুর জ্বালাতন হয়ে লিখে পাঠালেন : "তোক্তামিস, তোমার বুকের ভিতরে কোন শয়তান আছে ? তুমি নিজের সীমানার মধ্যে শান্ত হয়ে থাকতে পারো না কেন ? তুমি কি গত যুদ্ধের কথা ভুলে গিয়েছ ? তুমি আমার শত্রুতাও দেখেছ। অতএব স্পষ্ট করে বলে পাঠাও তুমি আমার শত্রু হবে, না বন্ধু হবে ?"

তবু তোক্তামিসের হুঁস হল না, আবার এলেন যুদ্ধ করতে। যুদ্ধ হল এবং এবারের যুদ্ধে তৈমুর হেরে যেতে যেতে কোনক্রমে বেঁচে গেলেন। রণক্ষেত্রের এক চিত্রে দেখতে পাই—কোণ-ঠাঁসা, রক্তাক্ত তৈমুরের তরবারি ভেঙে গিয়েছে, তাঁর অল্প কয়েকজন সঙ্গী ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়িয়ে চারিপাশ দিয়ে তাঁকে আগলে রেখে লড়াই করছে প্রাণপণে।

অবশেষে সাহায্য এল। তৈমুর আহত সিংহের মতন আবার আক্রমণ করলেন, মোগলরা আবার পালিয়ে গেল। এবং অনেকে তৈমুরের পক্ষে এসেও যোগ দিলে। এর পর থেকে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আর তোক্তামিস ও হৈম সংঘের নাম খুঁজে পাওয়া যায় না।

তৈমুর এবার সাক্ষাৎ যমের মতন রুসিয়ার দিকে ছুটে বেড়াতে লাগলেন,—আগুনের কবলে পড়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেল কত শহর, কত গ্রাম এবং আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ হয়ে উঠল মর্মভেদী মৃত্যু-হাহাকারে !

মস্কো-নগরে বসে রুসিয়ার গ্র্যাণ্ড প্রিন্সরা ভয়ে থর-থর করে কাঁপতে কাঁপতে সৈন্যশ্রেণী সাজাতে লাগলেন—তাঁরা জানতেন জয়ের কোনই আশা নেই, কিন্তু তবু তাঁদের যুদ্ধ করতে হবে !

মস্কোর পথে পথে বেরুলো ভীত নর-নারীর মিছিল। খ্রীস্ট-জননীর মূর্তি নিয়ে মিছিলের জনতা অগ্রসর হয় এবং পুরুষ ও নারীরা নতজানু হয়ে রাস্তার ধুলোয় বসে পড়ে জোড়হাতে সক্রন্দনে বলে ওঠে—

"ভগবানের মা, ভগবানের মা, রুসিয়াকে রক্ষা কর !"

কবি হাফিজ ও সর্দার আক বোগা

"ভগবানের মা, রুসিয়াকে রক্ষা কর।"

মস্কো শহরের পথে পথে, আবালবৃদ্ধ-বনিতার মুখে মুখে জাগছে এই কাতর প্রার্থনা!

রুসরা দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত দেখে বুঝেছে, অস্ত্রের দ্বারা তৈমুরকে বাধা দিতে যাওয়া পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। তাই তারা হল দেবতার দ্বারস্থ।

রুসরা বলে, ভগবানের মা তাদের প্রার্থনা ঠেলতে পারেন নি। কারণ, রুসিয়ার সর্বময় কর্তা তোক্তামিসকে দমন করেই তৈমুর আবার নিজের দেশে ফিরে গেলেন। মস্কো শহরে তখন বাসিন্দার সংখ্যা ছিল মাত্র পঞ্চাশ হাজার। এমন একটা ছোট শহর তৈমুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করল না।

মস্কো বাঁচল, কিন্তু রুসিয়ায় মোগল-সাম্রাজ্যের পতন হল। তৈমুর শত্রুর বেশে রুসিয়ায় গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর আবির্ভাবের ফলেই রুসরা স্বাধীন ভাবে মাথা তুলে দাঁড়াবার প্রথম সুযোগ পায়।

রুসিয়ার পর পারস্যের পালা।

পারস্যের গৌরব-সূর্য তখন অস্তমিত। বহুকাল ধরে সৌভাগ্যের উচ্চশিখরে অলস ভাবে বসে থেকে তখন সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলেছে পারস্যের পুরুষত্ব। তার যশ আছে, কিন্তু আত্মরক্ষার ক্ষমতা নেই। সম্রাট, আমীর-ওমরাও ও রাজপুত্রেরা বিপুল বিলাসে কালযাপন করেন, খোসামুদে কবিদের রচিত প্রশস্তি তাঁদের আত্মপ্রসাদকে আরো বাড়িয়ে তোলে, বড় বড় শহরের পথে পথে আরামে ঘুরে বেড়ায় রেশমী

পোশাক-পরা ভিখারীরা।

এরই মধ্যে কবি হাফিজের মুরুব্বি পারস্য-সম্রাটের মৃত্যু হল। সমস্ত ইরান দেশ তখন খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে এক একজন রাজকুমারের অধীন হয়ে পড়ল।

১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দ। শীতের ম্লান সূর্যের আলোকে আচম্বিতে একদিন দেখা গেল, ইরানের বুক মাড়িয়ে ইস্পাহানের দিকে এগিয়ে আসছে তৈমুরের দুর্দান্ত তাতার-বাহিনী।

ইস্পাহানের কর্তারা বাধা দিলেন না, বরং হাসিমুখে এগিয়ে এলেন তৈমুরকে সাদর অভ্যর্থনা করতে।

তৈমুর বললেন, "ইস্পাহানীদের জীবন ভিক্ষা দিলুম। যদি নিষ্ক্রয়ের টাকা পাই, শহরও লুট করা হবে না।"

ইস্পাহানী আমীর-ওমরাওরা বললেন, "অবশ্য, অবশ্য! নিষ্ক্রয় দেওয়া হবে বৈকি!"

কিন্তু ইস্পাহানের সাধারণ বাসিন্দারা কর্তাদের এই কাপুরুষতা সমর্থন করলে না। এক ডানপিটে কামার কোমর বেঁধে দাঁড়িয়ে সকলকে উত্তেজিত করে তুললে। ইস্পাহানীরা ক্ষাপ্পা হয়ে তাতারীদের আক্রমণ করলে। শহরের পথে পথে ছুটল রক্তস্রোত। তিন হাজার তাতারী মারা পড়ল।

বিষবৃক্ষের ফল ফলতে দেরি হল না। বজ্রকঠিন স্বরে তৈমুর বললেন, "হত্যা কর! প্রত্যেক তাতারীর হাতে আমি একটা করে ইস্পাহানী মুণ্ড দেখতে চাই।"

তারপর দেখা গেল ইস্পাহানের রাস্তায় রাস্তায় সাজানো রয়েছে সত্তর হাজার নরমুণ্ডের পাহাড়!

ইস্পাহানের পরে এল সিরাজ নগরের পালা। কিন্তু সিরাজের বুদ্ধিমান বাসিন্দারা ইস্পাহানের দুর্দশা দেখে তাড়াতাড়ি চুকিয়ে দিলে নিষ্ক্রয়ের টাকা।

সিরাজে থাকতেন কবি হাফিজ। তাঁর নাম ফিরত দেশে দেশে।

তৈমুর কাব্যের ভক্ত ছিলেন না। কিন্তু কৌতূহলী হয়ে একদিন কবিকে ডেকে পাঠালেন। কবিকে আসতে হল।

হাফিজ একটি কবিতায় এই মর্মে লিখেছিলেন—"সিরাজের সুন্দরী কন্যার পায়ের তলায় আমি বোখারা কি সমরখন্দ বিলিয়ে দিতে পারি।"

তৈমুর কঠোর স্বরে বললেন, "এ কবিতা তুমি লিখেছ?"

কবি বললেন, "রাজার রাজা, ওটি আমারই রচনা বটে।"

তৈমুর বললেন, "কত যুদ্ধ করে কত কষ্টের পর আমি সমরখন্দ জয় করতে পেরেছি। আর তুমি কিনা এক কথায় তুচ্ছ এক নারীর পায়ে সমরখন্দ বিলিয়ে দিতে চাও?"

কবি হেসে বললেন, "হুজুর, এমনি অমিতব্যয়িতার ফলেই আজ আমি ভিখারীর মতন দীন হয়ে আপনার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি!"

কবির জবাব শুনে তৈমুর খুশি হলেন। হাফিজের ভাগ্যে জুটল নিষ্ঠুর তিরস্কার নয়, প্রচুর পুরস্কার!

বলা বাহুল্য, দেখতে দেখতে কয়েকটি ছোটখাটো যুদ্ধের পর সমস্ত ইরান দেশ হল তৈমুরের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। মধ্য-এশিয়ায় ও ইরান দেশে কেউ আর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না (১৩৮৮ খ্রীস্টাব্দে)।

তৈমুরের বয়স এখন তিপ্পান্নো বৎসর। কেবল লোক দেখাবার জন্যে মাথার উপরে তিনি এখনো চেঙ্গীজের এক বংশধরকে রেখে পালন করছেন বটে, কিন্তু এই খাঁ-খানান হচ্ছেন তাঁর হাতের ক্রীড়াপুত্তলী মাত্র। তিনি গদীর উপরে বসে নিশ্চিন্ত মনে ভালো ভালো খাবার-দাবার খান, শিকারে যান বা খেলাধুলো আমোদপ্রমোদ নিয়ে মেতে থাকেন।

কি-রকম সব দুর্ধর্ষ লোক ছিলেন তৈমুরের সহচররা, এখানে তাদের একটু পরিচয় দিলে মন্দ হবে না।

নাম তাঁর সর্দার আক বোগা—লম্বায়-চওড়ায় চেহারাখানি তাঁর দানবের মতন বিরাট, তাঁকে দেখলেই বুকটা ভয়ে ধড়াস ধড়াস করতে

থাকে। তাঁর প্রকাণ্ড ঢাল লোহায় তৈরি এবং ভারি ধনুকখানি হচ্ছে পাঁচ ফুট লম্বা।

একদিন ইরান দেশের এক পল্লীগ্রামে কোন গৃহস্থের বাড়ির সামনে একলা বসে আক বোগা গোগ্রাসে পোলাও-কালিয়া কোপ্তা-কাবাব ধ্বংস করছেন, এমন সময়ে গাঁয়ের জনৈক মুরুব্বি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে খবর দিলে, পুকুরের ধারে চল্লিশ-পঞ্চাশজন ইরানী সৈনিকের উদয় হয়েছে।

আক বোগা নিশ্চিন্ত ভাবে মাংসের হাড় চিবোতে চিবোতে বললেন, "বহুৎ আচ্ছা! যাও, গাঁয়ের লোকজন নিয়ে এস, তারপর খানা খেয়ে আমি ওদের সঙ্গে লড়াই করব।"

মুরুব্বি বললে, "হুজুর, ওরা দলে ভারি, আপনি পালিয়ে গেলেই ভালো করবেন।"

আক বোগা বললেন, "আরে না, না, আমি আক্রমণ করে ওদের ঘোড়াগুলো কেড়ে নেব। ইরানীরা শেয়ালের পাল, আমার মতন নেকড়ে-বাঘকে দেখলেই চম্পট দেবে।"

মুরুব্বি বোকা নন, বোগা-সাহেবকে চটাতে ভরসা করলে না, গাঁয়ের জনকুড়ি লোককে কোনরকমে ডেকে আনলে।

আক বোগা খাওয়া-দাওয়া সেরে মুখ মুছতে মুছতে নিজের ঘোড়ার উপরে চড়ে এগিয়ে গেলেন এবং ইরানীদের দেখেই বিকট হৈ-হৈ রবে চিৎকার করে উঠলেন।

ইরানী সৈনিকরা সবিস্ময়ে নিজের নিজের ঘোড়ার উপরে উঠে বসল।

তাই দেখেই গাঁয়ের লোকেরা দিলে টেনে লম্বা!

কিন্তু আক বোগা পালাবার ছেলে নন, তিনি একাই ঘোড়া ছুটিয়ে মাথার উপরে বন-বন করে তরবারি ঘোরাতে ঘোরাতে চ্যাঁচাতে লাগলেন, "হা রে রে রে রে, যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি!"

কিন্তু ইরানীরা যুদ্ধ দেবার নামও করলে না। তারা ভাবলে, এ লোকটা হচ্ছে দলের অগ্রদূত মাত্র, একা কখনো চল্লিশ-পঞ্চাশ জনকে আক্রমণ করতে আসে? আক বোগা যত জোরে হৈ-হৈ করেন, তারাও

তত বেগে ছুটে পালায়!

আক বোগা শেষটা হতাশ ভাবে গ্রামে ফিরে এসে ঘৃণা-ভরা কণ্ঠে বললেন, "ইরানীরা হচ্ছে শেয়ালের পাল; কিন্তু এই গাঁয়ের লোকগুলো হচ্ছে ভীতু খরগোস।"

দশম অধ্যায়

ভারতবর্ষ

তৈমুর আজ বনস্পতির মতন; তাঁর মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে আর সকলের মাথার উপরে।

আশপাশের রাজা-রাজড়ারা ভয় পেয়ে একসঙ্গে জোট বাঁধলেন। তাঁদের মধ্যে প্রবীণ হচ্ছেন বোগদাদ এবং মিশরের সুলতান।

বোগদাদ প্রাচীন শহর, তার প্রতিষ্ঠা ৭৬৩ খ্রীস্টাব্দে। আরব্য-উপন্যাসে অমর হারুন-অল-রশিদের রাজধানী রূপে বোগদাদ সুখ-সৌভাগ্যের চরম শিখরে আরোহণ করেছিল। তৈমুরের সময়ে বোগদাদের সুলতান ছিলেন আমেদ।

সুলতান আমেদ জানতেন, বোগদাদের ঐশ্বর্য তৈমুরকে লুব্ধ করে তুলবেই। তাই তিনি আগে থাকতেই তৈমুরকে খুশি রাখবার জন্যে দামী দামী ভেট পাঠিয়ে দিলেন।

কিন্তু তৈমুর কি এত সহজে খুশি হবার ছেলে? হাত বাড়ালেই যেখানে সাত রাজার ধন মাণিক পাওয়া যায়, সেখানে দু-একখানা রঙিন কাঁচের টুকরো পেয়ে তুষ্ট হতে পারে কে? তৈমুর বোগদাদ দখল করবার জন্যে যাত্রা করলেন।

যুদ্ধ অবশ্য হল। কিন্তু সুলতান আমেদ ছিলেন সৌখিন ব্যক্তি। ফুলের বাগানে আরামে বসে ঠাণ্ডা সরবৎ পান করতেন আর কবিতা

লিখতেন। জন্ম-যোদ্ধা তৈমুরের সামনে দাঁড়িয়ে তরবারি চালনা করবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। সুতরাং যুদ্ধের নামে হল প্রহসনের অভিনয়। সুলতান দারুণ আতঙ্কে অন্তঃপুরের ছেলেমেয়েদের পিছনে ফেলেই সিরিয়ার মরুভূমি পার হয়ে দামাস্কাস শহরে গিয়ে হাজির হলেন। দামাস্কাস তখন মিশরের সুলতানের অধীন।

তৈমুর সমরখন্দে ফিরে এলেন। কিন্তু এত বড় হয়েও তিনি তৃপ্ত হতে পারলেন না—তাঁর মন তখন হারিয়ে গিয়েছে উচ্চাকাঙ্ক্ষার অসীমতার মধ্যে।

তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল ভারতবর্ষ।

প্রধান প্রধান সর্দারগণের ইচ্ছা নয় যে ভারতবর্ষে যান। এমন কি তৈমুরের পৌত্র মহম্মদ সুলতানও বললেন, "ভারতের পথে অনেক বাধা। প্রথমত, বড় বড় নদী; দ্বিতীয়ত, দুরারোহ পর্বত ও দুর্ভেদ্য অরণ্য; তৃতীয়ত, বর্মধারী সৈন্য; এবং চতুর্থত, নরহত্যাকারী হস্তিদল।"

একজন ভারত-ফেরত ওমরাও বললেন, "ওখানকার জলহাওয়া ভারি খারাপ, আমাদের সৈন্যরা দুর্বল ও রুগ্ন হয়ে পড়বে।"

কিন্তু আর একদল বলল, "ভারত হচ্ছে রত্নাকর। ভারতের ঐশ্বর্য পেলে আমরা বিশ্বজয় করতে পারব।"

আর একদল বললেন, "ভ্রমণকারী ইবন বতুতার মতে পৃথিবীর মধ্যে বড় রাজা আছেন ছয়জন: কনস্তান্তিনোপলের সম্রাট, চীনের সম্রাট, তাতারের অধিপতি, ভারতের বাদশাহ, বোগদাদের নরপতি ও মিশরের সুলতান। আমীর তৈমুর যদি সর্বশ্রেষ্ঠ হতে চান তবে তাঁকে এঁদের সকলকে বশীভূত করতে হবে।"

তৈমুরেরও মনের বাসনা তাই। অনন্ত আকাশে থাকে একমাত্র সূর্যই। তিনিও হতে চান দুনিয়ার সর্বেসর্বা। এর জন্যে পৃথিবী যদি রক্তে ডুবে যায়,—ডুবে যাক। সে রক্তসাগরে সাঁতার দেবার শক্তি তাঁর আছে।

তৈমুর বললেন, "আমি ভারতবর্ষে যাত্রা করব। ভারতের ধনরত্ন এনে আমি সমরখন্দের পায়ে ঢেলে দেব। আমি তাতার যোদ্ধা, আমাকে

বাধা দেয় কে? তাতারীর তরবারি হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তরবারি। তোমরা কি সে কথা বিশ্বাস কর না?"

উৎসাহিত হয়ে সর্দাররা একবাক্যে বললেন, "হ্যাঁ প্রভু, আমরা বিশ্বাস করি।"

"তবে প্রস্তুত হও।"

এক লক্ষ তাতার যোদ্ধা বিপুল আগ্রহে রণসজ্জায় সজ্জিত হতে লাগল।

যে ভারতবর্ষ আক্রমণ করার জন্যে এত পরামর্শ, এত আয়োজন, তার অবস্থা কল্পনাতীত রূপে শোচনীয়।

আর্য ভারতবর্ষের অখণ্ড হিন্দু সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত ও হর্ষবর্ধনের শৌর্যকাহিনী তখন পরিণত হয়েছে অতীতের সুখস্বপ্নে। মুসলমানরাও এসে যে সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাও তখন জরাজীর্ণ ও দুর্বল হয়ে পড়েছে। মোগলবংশীয় উন্মত্ত সম্রাট মহম্মদের খামখেয়ালীতে সাম্রাজ্যের গৌরব-সূর্য হয়েছে অস্তমিত। তিনি জীবিত থাকতেই সাম্রাজ্যের ভগ্নদশা আরম্ভ হয়। তাঁর সুযোগ্য খুড়তুতো ভাই ফিরোজ শা (১৩৫১-৮৮ খ্রীস্টাব্দ) বুদ্ধিমান ও সুশাসক হয়েও এবং প্রাণপণে চেষ্টা করেও সাম্রাজ্যকে অধঃপতনের কাল থেকে রক্ষা করতে পারলেন না। ফিরোজ শার মৃত্যুর পর সাম্রাজ্য গেল রসাতলে।

সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে বিদ্রোহী মুসলমান ও হিন্দু যোদ্ধারা ছোট-বড়-মাঝারি খণ্ডরাজ্য স্থাপন করলেন। দিল্লির সম্রাট বলতে আর ভারতের সম্রাট বোঝায় না—দিল্লি তখন ভারতের একপ্রান্তে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য মাত্র। ভারতের একাধিক রাজা তখন দিল্লির অধিপতির চেয়ে শক্তিশালী। ধরতে গেলে দিল্লিশ্বর নাসিরুদ্দীন মামুদের রাজ্য বা শক্তি তখন সীমাবদ্ধ ছিল দিল্লি নগরের চার দেওয়ালের মধ্যেই। মোগল-সাম্রাজ্যেরও শেষ দিকে দিল্লিশ্বরের অবস্থা হয়েছিল এই রকম।

তখনো ভারতবর্ষে কয়েকটি ছোট-বড় রাজ্য ছিল। কিন্তু সেগুলি

দিল্লি থেকে এত দূরে অবস্থিত ছিল যে, পশ্চিম ভারতবর্ষের রাজনীতির সঙ্গে তাদের কোনরকম সম্পর্ক ছিল না বললেই হয়। অথচ ভারতীয় রাজনীতির প্রধান রঙ্গমঞ্চই ছিল পশ্চিম ভারতবর্ষে—কারণ সেকালে ঐখানেই ভারতের ভাগ্য-পরিবর্তন হয়েছে বারংবার, এবং একমাত্র এই কারণেই দিল্লিশ্বর তখনো ছিলেন সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বপ্রধান ব্যক্তি।

দিল্লিশ্বরের আমীর-ওমরাওরা যখন আপন আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরস্পরের সঙ্গে ঘরোয়া বিবাদে নিযুক্ত, আচম্বিতে তখন সংবাদ এল, দিগ্বিজয়ী তৈমুরের আবির্ভাব হয়েছে ভারতবর্ষে।

তৈমুরের পৌত্র পীর মহম্মদ সিন্ধুনদ পার হয়েছেন। দিল্লিশ্বরের সৈন্যরা পরাজিত হয়ে মুলতান নগরের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেও আত্মরক্ষা করতে পারে নি। পীর মহম্মদ মুলতান অধিকার করেছেন (১৩৯৮ খ্রীস্টাব্দ)।

এর পরে আরম্ভ হল, রক্তাক্ত নাটকের অভিনয়।

একাদশ অধ্যায়

দিল্লি

সমরখন্দের আমীর তৈমুর,—যাঁর রক্তাক্ত তরবারির সামনে হৈম সংঘ, পারস্য, আফগানিস্থান ও মেসোপটেমিয়ার পতন হয়েছে, তিনিই আসছেন আজ একতাহীন, শৃঙ্খলাহীন, শক্তিহীন, প্রায় অরাজক ভারতবর্ষের রত্নভাণ্ডার লুণ্ঠন করতে!

দুর্বল দিল্লিশ্বর নাসিরুদ্দীনের সিংহাসনই কেবল কেঁপে উঠল না, উত্তর-পশ্চিম ভারতের সমস্ত হিন্দু-মুসলমানের প্রাণও কেঁপে উঠল দুরু-দুরু করে। কারণ তৈমুরের কীর্তি কাহিনী কারুরই অজানা ছিল না।

তৈমুর—তৈমুর ! ভগবানের চাবুক তিনি, প্রহার করেন নির্বিচারে, হিন্দু-মুসলমান ক্রীশ্চান সকলকেই বলি দিয়ে দেশে দেশে তিনি নরমুণ্ডের পিরামিড রচনা করেছেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি নৃশংসেরও চেয়ে নৃশংস ! গজনীর মামুদের সংহার-মূর্তি ভারতবর্ষ তখনো ভুলতে পারেনি, সুতরাং তৈমুরের নামে লোকের হৃৎকম্প হওয়া আশ্চর্য নয়।

পৌত্র পীর মহম্মদ মুলতান দখল করলেন। কিছুদিন পরে তৈমুরও করলেন তাঁর সঙ্গে যোগদান। তারপর নব্বই হাজার তাতার অশ্বারোহী নিয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন—লক্ষ্য তাঁর দিল্লি।

কিন্তু ভারতবর্ষ দুর্বল হলেও দিল্লির পথ নিষ্কণ্টক হল না। মুসলমান, রাজপুত ও জাট-নায়করা নানাস্থানে এই বিদেশী দিগ্বিজয়ীকে বাধা দেবার জন্যে দলবদ্ধ হলেন, কিন্তু তাঁরা কেহই আত্মরক্ষা করতে পারলেন না। পাক-পাটান, দীপালপুর, শিরা, ফতেবাদ ও তোহানা প্রভৃতি স্থানে যেখানেই অস্ত্রে অস্ত্রে সংঘাত বাধল, ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের রক্তধারায় মাটি হয়ে উঠল পিচ্ছিল। কত শহর ও গ্রাম পরিণত হল সমতল ক্ষেত্রে, বাসিন্দাদের নিক্ষেপ করা হল নগ্ন অস্ত্রের মুখে, চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেল আগুন ও ধোঁয়ায়। হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে লোক ছুটে চলল দিল্লির দিকে—হতভাগ্যরা ভাবলে, পালিয়ে তারা ভগবানের চাবুককে ফাঁকি দিতে পারবে !

যুদ্ধ যা হল তা নামে মাত্র যুদ্ধ, তৈমুরের সামনে কেউ দাঁড়াতেও পারলে না, সুতরাং এ-সব যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েও লাভ নেই। অধঃপতিত ভারতবর্ষের পঙ্গু পুরুষত্বের গগনভেদী আর্তনাদ ক্রমে দিল্লির কাছ পর্যন্ত গিয়ে হাজির হল।

দিল্লিশ্বরের ডান হাতের মতন ছিলেন তখন মাল্লু খাঁ। কিছু সৈন্য সংগ্রহ করে তিনি দিল্লি থেকে বেরিয়ে তৈমুরকে বাধা দিতে এলেন।

এর পর যে বিয়োগান্ত দৃশ্যের অভিনয় হল তা বড়ই মর্মন্তুদ। তৈমুরের সঙ্গে ছিল একলক্ষ হিন্দু-বন্দী। দিল্লির সৈন্যেরা আসছে শুনে নির্বোধরা আনন্দ প্রকাশ না করে থাকতে পারলে না।

তৈমুর ভাবলেন, একলক্ষ সক্ষম বন্দী বিদ্রোহী হলে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা। তিনি তখনি হুকুম দিলেন, "ওদের সকলকে হত্যা কর।"

সঙ্গে সঙ্গে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত অস্ত্রে অস্ত্রে হল ঝকমক বিদ্যুৎ-সঞ্চার এবং দেখতে দেখতে একলক্ষ মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ল রক্তরাঙা মাটির উপরে। তাদের কাতর কান্না আজও জেগে আছে ভারতের প্রাণে।

ইতিমধ্যে মাল্লু খাঁ আবার পশ্চাৎপদ হয়ে দিল্লির ভিতরে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

এর পর দুই পক্ষই চরম যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল।

তাতার সৈন্যরা আবার ভয় পেলে, কারণ তারা দেখলে তাদের বিরুদ্ধে দলে দলে হাতি প্রস্তুত হচ্ছে। সেই সব অদ্ভুত, বিরাটদেহ জীবের শুঁড়ে শুঁড়ে বাঁধা নগ্ন তরবারি এবং তাদের পৃষ্ঠদেশে ছোটখাটো দুর্গের মতন সৈনিকে পরিপূর্ণ হাওদা। তাদের বিশ্বাস হল, এদের সঙ্গে লড়াই করা অসম্ভব।

সঙ্গের জ্যোতিষীরা গ্রহ-নক্ষত্র বিচার করে বললেন, "হুজুর, মানুষ কখনো এমন আজগুবি জানোয়ারের সামনে দাঁড়াতে পারে না।"

তৈমুর অটল। ১৩৯৮ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি সসৈন্যে যমুনা নদী পার হয়ে ব্যূহ সাজাতে লাগলেন। হাতিদের বাধা দেবার জন্যে ব্যূহের সামনে স্থাপন করলেন পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা দলে দলে মহিষ।

দিল্লিশ্বর নাসিরুদ্দিন ও তাঁর যোদ্ধা মন্ত্রী মাল্লু খাঁয়ের সঙ্গে ছিল মাত্র চল্লিশ হাজার পদাতিক ও দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য।

তাতাররা বুঝলে সংখ্যায় তারা দ্বিগুণ। সুতরাং তাদের উৎসাহ বেড়ে উঠল।

ভারতীয় সৈনিকরা আক্রমণ করলে। নিপুণ সেনাপতি তৈমুরের আদেশে তাতারদের দক্ষিণ-পাশের সেনাদল ভারতীয়দের বামপাশ ক্রমে ক্রমে ঘিরে ফেলে পিছনদিকে গিয়ে হাজির হল। তখন ভারতীয়রা আক্রান্ত হল একসঙ্গে সম্মুখ ও পিছন থেকে।

ভারতের পক্ষে ফল হল মারাত্মক। দিল্লিশ্বরের সমস্ত সৈন্য প্রাণভয়ে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে দেরি করলে না। এমন কি যাদের জন্যে এত দুর্ভাবনা, সেই হাতীর দলও পালিয়ে গেল ভীত গরুর মতন।

পরদিনই তৈমুর দিল্লি নগর অধিকার করলেন।

যুদ্ধ থেমে গেল বটে, কিন্তু দিল্লির বিষের পাত্র তখনো পূর্ণ হল না।

বিজয়ী ও দাম্ভিক তাতারদের দুর্ব্যবহারে উত্যক্ত ও মরিয়া হয়ে দিল্লির হিন্দু বাসিন্দারা বিদ্রোহ ঘোষণা করলে। বহু পরিবারের হিন্দু নারীরা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে দিলেন আত্মাহুতি এবং পুরুষরা মৃত্যুপণ করে তরবারি হাতে নিয়ে তাতারদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দিল্লির পথে পথে জাগল যোদ্ধাদের সিংহনাদ ও আর্তনাদ। কিন্তু অসংখ্য তাতারী সৈনিকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নাগরিকরা প্রাণদান ছাড়া আর কিছুই করতে পারলে না। দিল্লির পথে পথে সাজানো হল নরমুণ্ডের পিরামিড। বাকি হিন্দুরা হল বন্দী। কথিত আছে, এমন তাতারী ছিল না, যে অন্তত বিশজন হিন্দু গোলাম সংগ্রহ করে নি।

পনেরো দিন ধরে দিল্লি লুট করে অগাধ ঐশ্বর্যের মালিক হয়ে তৈমুর স্বদেশের দিকে যাত্রা করলেন। যাত্রাপথে তৈমুরকে প্রায় প্রতিদিনই যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকতে হল। মীরাট, হরিদ্বার, কাংগ্রা ও জামু প্রভৃতি স্থানে তিনি যে কত হিন্দু সংহার করলেন, তার হিসাব থাকলে পৃথিবী আজও শিউরে উঠত। বেশ বোঝা যাচ্ছে, মুসলমানের চেয়ে হিন্দুরাই তৈমুরকে বেশি বাধা দিয়েছিল। তৈমুর অসংখ্য ভারতীয় শিল্পী ও কারিকরকেও বন্দী করে নিয়ে গেলেন—সমরখন্দে উচ্চশ্রেণীর শিল্পীর অভাব ছিল বলে।

ঐতিহাসিকরা বলেন, একবারমাত্র যুদ্ধযাত্রা করে তৈমুর ভারতবর্ষকে যতটা দুর্দশাগ্রস্ত করে গিয়েছিলেন, ততটা আর কেউ পারেনি; এদিক দিয়ে গজনীর কুবিখ্যাত দস্যু ও হত্যাকারী মামুদ পর্যন্ত তাঁর কাছে ম্লান হয়ে পড়বেন।

তৈমুরের পিছনে পড়ে রইল মরুভূমির মতন দীন উত্তর-ভারতবর্ষ।

সমস্ত দেশ জুড়ে জাগল দুর্ভিক্ষ ও মড়কের হাহাকার, পথ-ঘাট-মাঠ ছেয়ে রইল লক্ষ লক্ষ কাঙালে, নগরের পর নগর হয়ে গেল ভারতের বুক থেকে অদৃশ্য। এমন-কি দিল্লি নগরও পড়ে রইল বিরাট এক ধ্বংস-স্তূপের মতন—শহরের ভিতরে মানুষের বসবাস রইল না বললেও চলে। ইতিহাসে পড়ি, তৈমুরের প্রস্থানের পর দীর্ঘ দুই মাসের ভিতরে দিল্লি নগরে একটিমাত্র পাখিকেও উড়তে দেখা যায় নি!

কোন কোন ঐতিহাসিকের মত হচ্ছে, সমগ্র এশিয়ার একেশ্বর হবার জন্যে তৈমুরের বাসনা ছিল যে, তখনকার প্রাচ্যদেশের সর্বপ্রধান সাম্রাজ্য চীনকেও তিনি অধিকার বা বশীভূত করবেন। চীনে যাবার পথের পাশেই পড়ে উত্তর ভারতবর্ষ। পিছনে বা পাশে শত্রু রেখে পাছে তাঁকে বিপদগ্রস্ত হতে হয়, সেই ভয়েই আগে থাকতে ভারতকে তিনি পঙ্গু করে রাখলেন। এবং জয়ী হয়েও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের দিকে দৃষ্টিপাত না করে স্বদেশে ফিরে গেলেন। কারণ যাহাই হোক, তৈমুরের ভারত আক্রমণ যে তাঁর যোদ্ধা-জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত অধ্যায় মাত্র, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

১৩৯৯ খ্রীস্টাব্দের ২০শে মে তারিখে আমীর তৈমুর সমরখন্দে ফিরে এলেন এবং তার এক হপ্তা পরেই দেখি, ভারত-বিজয়কে স্মরণীয় করবার জন্যে তিনি এক বিরাট মসজিদ প্রতিষ্ঠায় নিযুক্ত হয়েছেন। অন্তত দুই লক্ষ নরহত্যা করে তিনি যে দেশে ফিরে এসেছেন, এজন্যে তাঁর মনে একটিও দুঃখের রেখা পড়ল না, সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তপাতের কথা ভুলে তিনি তাঁর মসজিদকে অপূর্ব করে তোলবার উপায় চিন্তা করতে লাগলেন।

মসজিদের বাইরের দেওয়াল যখন সম্পূর্ণ হল, ভিতরের সূক্ষ্ম কারুকার্যের জন্যে তখন নিযুক্ত করা হল ভারত থেকে বন্দী-করে-আনা দুই শত শিল্পীকে। মাত্র তিন মাসের মধ্যেই তারা গড়ে ফেললে চারিশত আশীটি পাথরের থাম, ভিতর-দিককার ছাদ ও অলঙ্কৃত পিতলের দরজাগুলি। মন্দির-নির্মাণ সমাপ্ত!

হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল, সমরখন্দের ক্ষুদ্র বাজার রাজধানীর উপযুক্ত

নয় এবং বাজারে আনাগোনা করবার পথটিও বড় সংকীর্ণ। তখনি তিনি হুকুম দিলেন—"বড় করে তোলো বাজারকে, তৈরি কর দীর্ঘ ও চওড়া একটি রাজপথ! সময় দিলুম বিশ দিন।"

যথাসময়ে হুকুম তামিল করবার লোকের অভাব হল না। তৈমুরের হুকুম—যমের হুকুম!

আমীর তৈমুরের বয়স এখন চৌষট্টি বৎসর। যদিও তাঁর দেহ আগেকার মতই বলিষ্ঠ আছে, তবু মাঝে মাঝে এখন তিনি পীড়িত হয়ে পড়েন। এখন তাঁর বিশ্রাম করবার সময়, কিন্তু বিশ্রাম সহ্য হয় না তাঁর ধাতে। আজও তিনি সেই দৃপ্ত তৈমুর—একা যিনি শত্রু-দুর্গের সিংহ-দ্বারের সামনে ছুটে গিয়েছিলেন দ্বন্দ্বযুদ্ধ করবার জন্যে। কেউ যুদ্ধে আহ্বান করলে এখনো তিনি শান্ত ও নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকতে পারেন না।

এশিয়া মাইনর থেকে তাঁর সামন্ত রাজাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর পুত্রদের অধীনস্থ দেশে নতুন নতুন শত্রুর আবির্ভাব হয়েছে। বোগদাদ নগর শত্রুর করতলগত হয়েছে। এ-সব হচ্ছে নতুন যুদ্ধের আহ্বান।

তৈমুর সাড়া দিতে কালবিলম্ব করলেন না। দেশে ফেরবার চার মাস পরেই আবার তিনি করলেন যুদ্ধযাত্রা। সমরখন্দ তিন বছর তাঁর মুখ দেখতে পেলে না।

বারো অধ্যায়

"বজ্র" বেয়াজিদ ও খঞ্জ তৈমুর

তৈমুরের বিরুদ্ধে তখন একজোট হয়ে দাঁড়িয়েছে নানাদেশী শত্রু—তুর্কী, মামেলুক, সারকাস্থান, জর্জিয়া, টার্কোম্যান ও আরব। এরা সবাই যোদ্ধার জাত এবং এদের মধ্যে তখন সব-চেয়ে প্রবল ও দুর্ধর্ষ ছিল তুর্কীগণ।

কিন্তু ভয় পাবার ছেলে নন তৈমুর। তিনি স্থির করলেন, প্রথমেই যাত্রা করবেন বোগদাদের দিকে।

তুরস্কের প্রথম সুলতান উপাধিধারী বেয়াজিদের নাম তখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দিকে দিকে। জার্মানীর রাজা ও রোমের সম্রাট সিগিসমাণ্ড এবং ইউরোপীয় ক্রীশ্চানদের সম্মুখ-যুদ্ধে বিষম ভাবে হারিয়ে দিয়ে তিনি তখন তৈমুরের চেয়ে অল্প খ্যাতি অর্জন করেন নি। এই বেয়াজিদের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তৈমুরের দুই প্রধান শত্রু—টার্কোম্যানদের কারা ইউসুফ ও বোগদাদের সুলতান আমেদ।

প্রথমটা তৈমুরের ইচ্ছা ছিল না যে, বেয়াজিদের সঙ্গে শত্রুতা করবেন। তিনি খুব ভদ্রভাবে লিখে জানালেন যে, সুলতান বেয়াজিদ যদি ইউরোপ নিয়ে খুশি হন, তাঁর তাতে আপত্তি নেই। তাঁর সঙ্গে তৈমুরের ঝগড়া করবারও ইচ্ছা নেই। কিন্তু তাঁর শত্রু ইউসুফ ও সুলতান আমেদকে যদি তিনি ত্যাগ করেন তাহলে বড় ভালো হয়।

বেয়াজিদের ডাকনাম ছিল 'বজ্র'। এবং বজ্রেরই মতন কঠিন ভাবে তিনি জবাব দিলেন, "ওরে রক্তাক্ত কুক্কুর, ওরে—খোঁড়া তৈমুর! তুর্কীরা বন্ধুদের তাড়িয়ে দিতে বা শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে ভয় পেতে অভ্যস্ত নয়। এ কথা তুই ভালো করেই জেনে রাখিস!"

তৈমুরও চুপ করে থাকবার পাত্র নন। তিনি লিখলেন, "মাতঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করবার আগে পতঙ্গের উচিত, নিজের কথা ভেবে দেখা। আপনি আমার কথা না শোনেন, তাহলে পরে আপনাকে অনুতাপ করতে হবে।"

বেয়াজিদ জবাবে লিখলেন: "ওরে খোঁড়া তৈমুর! আমার অনেক দিনের সাধ তোর সঙ্গে লড়াই করব। ভগবান আজ সেই সুযোগ দিয়েছেন। এর পরেও তুই যদি আমার দিকে এগিয়ে না আসিস, তবে আমিই এগিয়ে যাব তোর দিকে! তোকে হারিয়ে ভূত করব, তারপর তোর বউকে কেড়ে নেব!"

তৈমুর রাগে জ্বলে উঠে প্রতিজ্ঞা করলেন, বেয়াজিদকে তিনি ভালো করেই শিক্ষা দেবেন।

দূতের মধ্যস্থতায় দুজনের মধ্যে এমনি পত্র ব্যবহার চলেছে, ইতিমধ্যে দুটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বড় বড় ঘটনা ঘটে গেল।

প্রথমটি হচ্ছে, তৈমুরের দ্বারা তুর্কীরা ছাড়া অন্যান্য শত্রু দমন ও সিরিয়া অধিকার।[1]

এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে, বেয়াজিদের দ্বারা ক্রীশ্চানদের প্রধান রাজধানী কনস্তান্তিনোপল অবরোধ।

কনস্তান্তিনোপলের পতন হলেই পৃথিবী-বিখ্যাত রোম-সাম্রাজ্যের শেষ-চিহ্ন লুপ্ত হয়ে যাবে। মুসলমানদের সঙ্গে ধর্মযুদ্ধ ও কনস্তান্তিনোপলকে রক্ষা করবার জন্যে ইউরোপের চারিদিক থেকে ক্রীশ্চানরা ছুটে এসেছেন। কিন্তু মহাবীর্যবান বেয়াজিদ এমন ভাবে শহর ঘিরে রইলেন যে, ক্রীশ্চানদের কোন জারিজুরিই আর খাটল না। ধর্মযুদ্ধের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে অধিকাংশ ক্রীশ্চান বীরই কনস্তান্তিনোপল ছেড়ে সরে পড়লেন।

শহরের ভিতরে দারুণ খাদ্যাভাব। উপবাসী বাসিন্দারা শহরের পাঁচিল টপকে বাইরে গিয়ে শত্রু তুর্কীদের কাছেই ভিক্ষা মাগতে শুরু করলে। কনস্তান্তিনোপল আত্মসমর্পণ করবার জন্যে প্রস্তুত—এমন সময়ে খবর এল, সিরিয়া জয় করে খোঁড়া তৈমুর আসছেন 'বজ্র' বেয়াজিদের সঙ্গে দেখা করতে!

'বজ্র'র পিলে গেল চমকে! তৈমুরের এতটা ভরসা হবে তিনি তা কল্পনাও করতে পারেন নি। তিনি ডাকলেন,—আমি ইউরোপ-বিজেতা বজ্র, একটা খোঁড়া তাতারের এত স্পর্ধা!

তারপরেই বোধ হয় 'বজ্র'র মনে পড়ে গেল,—আমি ইউরোপ-বিজয়ী বটে, কিন্তু এই খোঁড়া তাতার ঘৃণ্য হলেও নগণ্য নয়, সেও এশিয়া-বিজয়ী।

তখনি 'বজ্র'র হুকুম হল—"কনস্তান্তিনোপলের চারিধার থেকে তাঁবু তোলো! সওয়াররা ঘোড়ায় চড়, পদাতিকরা ছুটে চল! ইউরোপের যেখানে যত তুর্কী বীর আছে, সবাইকে ডাক দাও! শিয়রে তাতার শত্রু—এখন কনস্তান্তিনোপলের কথা ভুলে যাও!"

কনস্তান্তিনোপল ছেড়ে, ইউরোপ ছেড়ে, তুর্কীরা ছুটল আবার এশিয়া মাইনরের দিকে। এর ফলে কনস্তান্তিনোপলের ক্রীশ্চানরা নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করেছিল আরো পঞ্চাশ বৎসর!

এর মধ্যেই বেয়াজিদের কবল থেকে আর আত্মরক্ষা করা অসম্ভব দেখে কনস্তান্তিনোপলের ক্রীশ্চান সম্রাট ম্যানুয়েল করুণ ভাবায় তৈমুরের কাছে এক আবেদন জানালেন, "হে তৈমুর, তুমি আমাকে রক্ষা কর!"

সম্রাট ম্যানুয়েল মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন —ইতিহাসে তা "শেষ ক্রুসেড" নামে বিখ্যাত। অথচ তিনিই মুসলমান বেয়াজিদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে অনুরোধ করছেন মুসলমান তৈমুরকে!

প্রথম দৃষ্টিতে ব্যাপারটা হাস্যকর বলে মনে হয়। কিন্তু এর দুটি কারণ থাকতে পারে। ম্যানুয়েল জানতেন, হয়তো তৈমুরের চেয়ে বড় শত্রু বেয়াজিদের আর কেউ নেই। অথবা হয়তো তৈমুরের মধ্যে ধর্মান্ধতা ততটা প্রবল ছিল না।

কিন্তু ম্যানুয়েল সাহায্য ভিক্ষা না করলেও তৈমুর তুর্কীদের আক্রমণ করতে আসতেনই। কারণ তৈমুর জানতেন, লোকে বেয়াজিদকে তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। এটা তাঁর পক্ষে অসহনীয়। তাঁর সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষা হচ্ছে পৃথিবীতে একমাত্র সূর্য বলে গণ্য হবেন তিনিই স্বয়ং। কেউ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইলে রাগে তিনি পাগল হয়ে উঠতেন! প্রমাণ, যে-সব দেশ সহজে তাঁর বশীভূত হয়েছে, তাদের উপরে তিনি কোন অত্যাচারই করেন নি। কিন্তু যে-সব দেশের লোক তাঁর সঙ্গে লড়াই করতে চেয়েছে, তাদের নগর-গ্রামকে তিনি পরিণত করেছেন সমতল ক্ষেত্রে এবং তাদের মুণ্ডগুলো কেটে নিয়ে তৈরি করেছেন ভয়াবহ পিরামিড! তার উপর বেয়াজিদ তাঁকে চূড়ান্ত অপমান করেছেন এবং ইতর ভাষায় গালাগালি দিয়েছেন।

সম্রাট ম্যানুয়েল কেবল তৈমুরকে নয়, বেয়াজিদকেও জানালেন, তিনি যদি তৈমুরকে পরাস্ত করতে পারেন, তাহলে বিনাযুদ্ধেই

কনস্তান্তিনোপলকে তাঁর হাতে সমর্পণ করা হবে।

পঞ্চদশ শতাব্দী এখন সবে পৃথিবীতে পদার্পণ করেছে—অর্থাৎ ১৪০২ খ্রীস্টাব্দ।

ইউরোপবিজয়ী বেয়াজিদ চারিদিক থেকে নিজের যুদ্ধপ্রবীণ সৈন্যদল সংগ্রহ করতে লাগলেন। তাঁর ফৌজের মধ্যে কেবল তুর্কীরাই ছিল না। ইউরোপের পরাজিত সামন্ত-রাজারাও তাঁর আহ্বানে বা আদেশে সৈন্য প্রেরণ করতে বাধ্য হলেন। সার্ভিয়ার রাজা পাঠালেন বিশ হাজার অশ্বারোহী—তাদের সর্বাঙ্গ কঠিন লৌহবর্মে আবৃত, দেখা যায় কেবল তাদের চোখগুলো। এল হাজার হাজার গ্রীক, হাজার হাজার রুমানিয়ান এবং আরও নানা দেশের অসংখ্য ক্রীশ্চান। বেয়াজিদের সৈন্য-সংখ্যার সঠিক হিসাব নেই। কেউ বলেন এক লক্ষ বিশ হাজার, কেউ বলেন দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার।

এশিয়া মাইনরের আঙ্গোরা (তুরস্কের বর্তমান রাজধানী) শহরে গিয়ে বেয়াজিদ ছাউনি ফেললেন। সিভা থেকে এদিকে আসবার জন্যে আছে একমাত্র পথ। অতএব বেয়াজিদ আন্দাজ করলেন, এই পথেই তৈমুরের সঙ্গে তাঁর দেখা হবে।

তুর্কীদের প্রধান শক্তি, পদাতিক সৈন্য। আঙ্গোরার উপকণ্ঠে কিছু-দিন বিশ্রাম করবার অবসর পেলে তারা হবে আরো তেজীয়ান, আরো বলবান! কিন্তু তৈমুরকে সসৈন্যে আসতে হবে বহু যোজনব্যাপী দুর্গম পথ অতিক্রম করে। সুতরাং তাঁর সেই পথশ্রান্ত সৈন্যদের আক্রমণ ও পরাস্ত করবার জন্যে বেশি বেগ পেতে হবে না। সুলতান বেয়াজিদ নিজের জয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়ে হুকুম দিলেন, "সৈন্যগণ, তোমরা খাও-দাও, ফূর্তি কর!"

ইউরোপবিজয়ীর সঙ্গে এশিয়াবিজয়ীর শক্তি-পরীক্ষা! সমস্ত পৃথিবী ফলাফল দেখবার জন্যে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল।

তেরো অধ্যায়

আঙ্গোরার যুদ্ধ

ইউরোপের সঙ্গে এশিয়ার শক্তি-পরীক্ষা। ও নতুন দৃশ্য নয়। স্মরণাতীত কাল থেকেই এ দৃশ্যের অভিনয় হয়েছে বারংবার। এবং প্রাচীন ও মধ্য-যুগের ইতিহাসেও এজন্যে অমর হয়ে আছে পার্সী দরায়ুস, গ্রীক আলেকজাণ্ডার, হুন আটিলা ও মোগল চেঙ্গীজ খাঁয়ের নাম। বেয়াজিদও এই অভিনয়ে যোগ দিয়ে সফল হয়েছেন।

কিন্তু ইউরোপ বিজেতার সঙ্গে এশিয়া বিজেতার শক্তি-পরীক্ষার কথা আগে শোনা যায় নি। সুতরাং সারা পৃথিবী যে এই অপূর্ব পরীক্ষার ফলাফল দেখবার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকবে, এ হচ্ছে খুবই স্বাভাবিক কথা।

আগেই বলা হয়েছে, নিজের জয়ের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে বেয়াজিদ আঙ্গোরা শহরের কাছে ছাউনি ফেলেছেন। তিনি স্থির করেছেন, বহুদূর থেকে আগত তৈমুরের পথশ্রান্ত সৈন্যদের বিশ্রামের অবকাশ না দিয়েই আক্রমণ ও পরাজিত করবেন।

বেয়াজিদ বসে বসে অপেক্ষা করছেন—অপেক্ষাই করছেন! এক দিন, দুই দিন, তিন দিন! সিভা শহর থেকে এদিকে আসবার একমাত্র পথে বিরাজ করছে কেবল ধূ-ধূ শূন্যতা। ক্রমে সাত দিন কেটে গেল। তবু তৈমুরের দেখা নেই। গুপ্তচররা চারিদিক থেকে ফিরে এসে বললে, —তৈমুর সসৈন্যে সিভা থেকে বেরিয়ে পড়েছেন বটে, কিন্তু তিনি যে এখন কোথায়, কেউ তা জানেনা।

শত্রু যুদ্ধযাত্রা করেছে, অথচ একবারে অদৃশ্য! বেয়াজিদ এমন বেয়াড়া ও আজব ব্যাপার কল্পনায় আনতে না পেরে হতভম্ব হয়ে গেলেন।

তাঁর সৈন্যরা হালিজ নদীর ধারে ব্যূহ রচনা করে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে। কিন্তু তারা কার সঙ্গে যুদ্ধ করবে? শত্রু কোথায়?...বেয়াজিদ হাউনি ভুলে ব্যূহ ভেঙে নানাদিকে ছুটোছুটি করতে লাগলেন।

তারপর তৈমুরের খবর পাওয়া গেল। তিনি সিভার পথ ধরেন নি। হালিজ নদীর অন্য তীর দিয়ে যাত্রা করে একেবারে আঙ্গোরা নগর অবরোধ করে বসেছেন। এই আঙ্গোরাই ছিল তুর্কীদের প্রধান আশ্রয় —ওখানেই জমা করা ছিল তাদের যা-কিছু রসদ!

তৈমুরকে খোঁজবার জন্যে আশ্রয় ছেড়ে দূরে এসে পড়ে কি অন্যায়ই যে করেছেন, এতক্ষণে বেয়াজিদ তা ভালো করেই বুঝলেন। কিন্তু এখন আর অন্য উপায় নেই, এখান থেকে আঙ্গোরা সাত দিনের পথ—এখন এই দীর্ঘ পথই করতে হবে তাঁকে অতিক্রম। প্রথম চালে জিতে গেলেন তৈমুর।

তৈমুরকে বাধা দেবার জন্যে বেয়াজিদ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন। কিন্তু যতই অগ্রসর হন ততই তাঁর চক্ষু স্থির হয়ে যায়। তৈমুর সমস্ত গ্রাম ও শস্যক্ষেত লুণ্ঠন করেছেন—কোথাও এককণা খাবার নেই। পথিমধ্যে যত জলাশয় বা উৎস ছিল, তাতাররা সব নষ্ট করে দিয়েছে—কোথাও একফোঁটা জল নেই। এমন কি আঙ্গোরা শহরের সুমুখ দিয়ে যে নদীটি বইত, তৈমুর বাঁধ দিয়ে তারও মোড় ফিরিয়ে দিয়েছেন। সে নদী বইছে এখন তাতার সৈন্যদের পিছন দিকে। দ্বিতীয় চালেও তৈমুরের জিৎ।

তুর্কীরা এসেছে শুনে তৈমুরও আঙ্গোরা ছেড়ে এগিয়ে এলেন। তখন যুদ্ধ করা ছাড়া বেয়াজিদের আর কোন উপায় রইল না। তাঁর সৈন্যরা পথশ্রান্ত, দারুণ পিপাসায় প্রাণ তাদের কণ্ঠাগত। এ অবস্থায় যুদ্ধ করা সম্ভব নয়---কিন্তু তাঁকে যুদ্ধ করতেই হবে।

দুই পক্ষের সৈন্যদলের সম্মুখভাগ পনেরো মাইল দীর্ঘ। তুর্কীরা হৈ হৈ রবে করতাল ও জয়ঢাক বাজাতে বাজাতে অগ্রসর হল, কিন্তু তাতাররা দাঁড়িয়ে রইল স্তব্ধ হয়ে। সূর্য তখন প্রখর।

তৈমুর তখনও ঘোড়ায় চড়া দরকার মনে করলেন না—প্রাথমিক যুদ্ধের ভার রইল সেনাপতিদের হাতেই। পৌত্র রাজকুমার মহম্মদ ছিলেন সেনাদলের মধ্যভাগের কর্তা। এখানে বর্মাবৃত হস্তিদলও ছিল। তৈমুর ভারতবর্ষ থেকে যুদ্ধে হাতি ব্যবহার করার পদ্ধতি শিখে এসেছেন।

তাতার ফৌজের দক্ষিণ ভাগ রক্ষা করছেন তৈমুরের সব চেয়ে নিপুণ সেনাপতি নুরউদ্দিন। বেয়াজিদের পুত্র সুলেমান অশ্বারোহী সৈন্যদের নিয়ে সর্বপ্রথমে সেইদিক আক্রমণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাতারদের স্তব্ধতা ভঙ্গ হল। তারা শত্রুদের উপরে নিক্ষেপ করতে লাগল ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ও জ্বলন্ত "ন্যাপথা"।

তুর্কীরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাতাররা আক্রমণ করলে প্রবল পরাক্রমে। সে আক্রমণ সইতে না পেরে অনেক তুর্কী রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে গেল। সেই সময় তাতারদের বামপার্শ্বও তুর্কীদের উপর ভেঙ্গে পড়ল সমুদ্রতরঙ্গের মতন। দুদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে তুর্কী অশ্বারোহীদের অবস্থা হয়ে উঠল বিষম শোচনীয়।

তখন তৈমুর তাঁর পৌত্রকেও বাছা বাছা সৈন্য নিয়ে তুর্কীদের অধীনস্থ সার্ভিয়ান অশ্বারোহীদের আক্রমণ করবার জন্যে হুকুম দিলেন। কাড়া-নাকাড়ার তালে তালে অস্ত্রে অস্ত্রে উঠল সে কি ঝনৎকার?

হাজার হাজার তরবারির বিদ্যুৎ-দীপ্তিতে চক্ষু হতে চায় অন্ধ এবং যোদ্ধাদের বিজয়-হুঙ্কারে কাঁপতে থাকে যেন আকাশ-বাতাস!

খানিক পরে দেখা গেল, তুর্কীদের দক্ষিণ পার্শ্ব একেবারে ভেঙে গিয়েছে। সার্ভিয়ার রাজা পিটার নিহত এবং তাতার রাজকুমার মহম্মদ আহত (পরে আহত মহম্মদের মৃত্যু হয়)।

এতক্ষণ পরে সুসময় বুঝে মধ্যভাগের সেনাদল নিয়ে স্বয়ং তৈমুর অগ্রসর হলেন। তুর্কীদের বিখ্যাত 'ওসমানলি' পদাতিকরা তৈমুর-চালিত তাতার অশ্বারোহীদের আক্রমণ সহ্য করতে পারলে না—তারা প্রাণ নিয়ে পলায়ন করতে লাগল।

বেয়াজিদ যেন পাগলের মতন হয়ে উঠলেন! নিজের রক্ষী-সৈন্যদের

নিয়ে স্বহস্তে কুঠার ধারণ করে তিনি যুদ্ধ করতে লাগলেন—কিন্তু বৃথা! রক্ষী-সৈন্যরা কেউ পালাল না বটে, কিন্তু একে একে সবাই মারা পড়ল এবং বেয়াজিদ হলেন বন্দী।

এর পরের দৃশ্য হচ্ছে তৈমুরের তাঁবুর ভিতরে। পুত্র সা রুখের সঙ্গে তৈমুর দাবা-বোড়ে খেলছেন। এমন সময়ে বন্দী বেয়াজিদকে নিয়ে তাতার সৈন্যদের প্রবেশ।

তৈমুর হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালেন।

বেয়াজিদের আত্মগর্বে আঘাত লাগল। তিনি বললেন, "ভগবান যাকে মেরেছেন, তাকে দেখে উপহাসের হাসি হাসা ভদ্রতা নয়।"

তৈমুর ধীরে ধীরে বললেন, "আমি কেন হাসছি জানো? তোমার মতন অন্ধ আর আমার মতন খঞ্জের উপরেই ভগবান দিয়েছেন কিনা পৃথিবী শাসনের ভার!" তারপর গম্ভীর স্বরে বললেন, "তোমার হাতে বন্দী হলে আজ আমার কি হাল হত সেটাও অনুমান করা কঠিন নয়।"

বেয়াজিদ এ কথার জবাব দিতে পারলেন না। তৈমুর হুকুম দিলেন, "সুলতানের বন্ধন খুলে দাও!"

বেয়াজিদ প্রার্থনা জানালেন তাঁর পুত্রদের খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্যে।

রণক্ষেত্র থেকে সুলতানের এক পুত্র—মুসাকে এনে হাজির করা হল। আর এক পুত্র যুদ্ধে মারা পড়েছেন। বাকি ছেলেরা পালিয়ে যেতে পেরেছেন।

ওদিকে নুরউদ্দিন পলাতক তুর্কীদের পিছনে ধাবিত হয়ে বেয়াজিদের রাজধানী রুসা পর্যন্ত দখল করে ফেললেন। সুলতানের সমস্ত ধনরত্ন হল তৈমুরের হস্তগত।

বেয়াজিদ যথেষ্ট আদর-যত্ন পেলেন বটে, কিন্তু মুক্তি পেলেন না। এক বৎসর আগে তৈমুরকে যে অপমানকর পত্র লিখেছিলেন, আজ তারই ফলভোগ তাঁকে করতে হল। কিন্তু ইউরোপ-বিজেতা বেয়াজিদকে এই চরম অধঃপতনের যন্ত্রণা বেশিদিন সহ্য করতে হয় নি। মাস-কয়েক পরে বন্দী অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

আঙ্গোরার যুদ্ধের ফলে তুর্কীদের বিষ-দাঁত একেবারে ভেঙে গেল। এরপর দীর্ঘকাল তারা আর মাথা তুলতে পারে নি। পূর্ব রোম-সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্তান্তিনোপলও করলে নিশ্চিত পতন থেকে আত্মরক্ষা।

দুর্ধর্ষ তুর্কী সুলতানের এই কল্পনাতীত পরাজয়ে সমগ্র ইউরোপ হল বিস্ময়ে হতভম্ব। ইউরোপীয় রাজা-রাজড়ারা ভয়ও কম পেলেন না—কি জানি, যদি তৈমুরের ইউরোপ বেড়াবার সখ হয়, তাহলেই তো সর্বনাশ! ফ্রান্স, স্পেন, গ্রীস ও ইংলণ্ডের রাজারা তাঁকে খুশি করবার জন্যে অভিনন্দন পাঠাতে দেরী করলেন না। মিশরও নত হয়ে তাঁর প্রাধান্য স্বীকার করলে।

কিন্তু তৈমুরের ইউরোপ-ভ্রমণের ইচ্ছা হল না! ইউরোপের তখনকার রাজারা তাঁর কাছে ছিলেন নগণ্য, তাদের রাজ্যে এমন কোন আকর্ষণ বা গৌরবজনক বস্তু নেই, তৈমুরের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে যা করতে পারে জাগ্রত। বেয়াজিদের দেশ থেকেই তিনি আশাতীত ঐশ্বর্য লাভ করলেন। এবং তাইতেই তুষ্ট হয়ে স্বদেশে ফিরে এলেন সসৈন্যে।

কিন্তু তাঁর চিত্তকে অধিকার করে রইল আর-এক উচ্চাকাঙ্ক্ষা। তাঁর জীবনের সমস্ত স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়েছে, বাকি আছে কেবল একটি—

"আমি হচ্ছি সমগ্র ধরণীর একমাত্র অধীশ্বর আমীর তৈমুর—পৃথিবীতে আমার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রেখে যাব না!"

তৈমুরের সামনে জেগে আছে আর একটিমাত্র দেশ! তাকে দমন করতে পারলেই তাঁর সমস্ত কর্তব্য সমাপ্ত হয়!

তৈমুরের বয়স এখন ৬৯ বৎসর। তাঁর দৃষ্টি-শক্তি ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে। তিনি জানতেন, তাঁর পরমায়ু শেষ হয়ে এসেছে। মহাপ্রস্থানের আহ্বান আসবার আগেই তিনি তাড়াতাড়ি শেষ যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন!

চোদ্দ অধ্যায়

চীনের পথে অচিন দেশে

বজ্রের দর্প চূর্ণ ! উনসত্তর বৎসরের ভার জীবনের উপর নিয়ে তৈমুর স্তিমিত দৃষ্টিতে একবার অতীতের দিকে তাকিয়ে দেখলেন—যেমন করে শেষ দৃষ্টিপাত করে অস্তাচলের সূর্য পূর্ব-আকাশের দিকে।

যাদের সঙ্গে তরবারি হাতে করে তিনি যাত্রাপথে বেরিয়েছিলেন, তারা সবাই হয়েছে আজ অনন্ত পথের পথিক। যাদের সাহায্যে তিনি বড় বড় যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন সেই সৈয়ুদ্দীন, জাকু বার্লাস ও আক বোগা প্রমুখ সবাই করেছে আজ মহাপ্রস্থান। সর্বপ্রথম পুত্র এবং তাঁর ছেলে মহম্মদও পরলোকে। চিরকালের জন্যে হারিয়েছেন তিনি জীবনের প্রথম সঙ্গিনী আলজাইকেও। তিনি আজ পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তির অধিকারী, কিন্তু অধিকতর শ্রেষ্ঠ কোন শক্তিধর তাঁর কাছ থেকে একে একে কেড়ে নিয়েছেন সবচেয়ে প্রিয় সহধর্মিণী, আত্মজ, বন্ধু ও স্বজন! তিনি আজ একাকী, অত্যন্ত একাকী। অন্যান্য বংশধরও আছেন, সেনাপতিও আছেন, কিন্তু তাঁর অবর্তমানে এই বিরাট ও অতুলনীয় সাম্রাজ্যের শাসনদণ্ড গ্রহণ করতে পারেন এমন যোগ্য ব্যক্তি আর একজনও নেই। তাঁর চারিদিক ঘিরে বিপুল জনতা,—কিন্তু তিনি একাকী, বড় একাকী!

তিনি আর কি দেখলেন ?

দেখলেন—নিজের হাজার হাজার ক্রোশব্যাপী অতি-দীর্ঘ যাত্রাপথ —কিন্তু তার মধ্যে কোথাও নেই জীবনের মহোৎসব। সেই দূরদূরান্তরে বিস্তৃত ধূ-ধূ পথ জুড়ে ঢেউ খেলিয়ে বয়ে যাচ্ছে কেবল রক্তের রাঙা নদী! তার দুই পাশে জেগে আছে মরুভূমির পর মরুভূমি—সেখানে ফল-ফুল-

তরু-লতা-শস্য জন্মায় না, সেখানে নেই ছায়াময় গ্রাম, সমৃদ্ধ নগর, সমাজ-সংসারের কলরব, তার বদলে সেখানে দেখা যায় শুধু গগনস্পর্শী অগ্নিশিখা ও কুণ্ডলী-পাকানো ধূম্ররাশি এবং বীভৎস নরমুণ্ডের পাহাড়ের পর পাহাড়!

অতীতের দিকে তাকিয়ে তৈমুর কি দুঃখিত, লজ্জিত, অনুতপ্ত হলেন?

একটিমাত্র যুদ্ধের পর রণক্ষেত্রের দৃশ্য দেখে ভারত-সম্রাট অশোক চিরদিনের মতন অস্ত্র ত্যাগ করেছিলেন।

কিন্তু তৈমুর অশোক নন।

স্তিমিত চক্ষে অগ্নিবর্ষণ করে বৃদ্ধ তৈমুর ঘোড়ায় চড়ে আবার গর্জন করে উঠলেন, "অস্ত্র ধর, অস্ত্র ধর! এস বীর তাতারীরা, চল আবার দিগ্বিজয়ে!"

সবাই বিস্ময়ে সচকিত! সম্রাট তৈমুর যার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে পারেন, পৃথিবীতে এমন দেশ আর কোথায় আছে?

তৈমুর বললেন, "আমরা প্রায় সমগ্র এশিয়া জয় করেছি, বাকি আছে কেবল চীনদেশ। আমরা এমন সব মহা-মহা রাজার গর্ব চূর্ণ করেছি যে পৃথিবী চিরদিন আমাদের স্মরণ করে রাখবে। কত যুদ্ধে তোমরা আমার সঙ্গী হয়েছ, কিন্তু তোমাদের পরাজয়ের কলঙ্ক মাখতে হয়নি কখনো। চীনদেশের পৌত্তলিকদের সাধ্য নেই, তোমাদের সামনে দাঁড়ায়! আমার সঙ্গে চল সেই দেশে!"

যে চেঙ্গীজ খাঁয়ের বংশধরদের সাম্রাজ্যকে অবলম্বন করে তৈমুর করেছিলেন আত্মপ্রতিষ্ঠা, সেই মহান সম্রাট, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দিগ্বিজয়ী চেঙ্গীজও জীবন-সন্ধ্যায় বেরিয়ে ছিলেন দক্ষিণ চীনের পথে, নিজের দিগ্বিজয়-ব্রত সম্পূর্ণরূপে সফল করবার জন্যে। পথেই তাঁর মৃত্যু হয়। চেঙ্গীজ হয়েছিলেন পৃথিবীর সর্বেসর্বা। কিন্তু মহাকালের পরিহাসে তাঁর শেষ-ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি। আত্মপ্রসাদে স্ফীত হয়ে তৈমুরও কি ভেবেছিলেন, চেঙ্গীজ যা পারেন নি, সেই কার্যে সফল হয়ে তিনি চেঙ্গীজেরও যশকে ম্লান করে দেবেন? সম্ভব!

মহাকাল? ও হচ্ছে পৌত্তলিক অভিধানের কথা, তৈমুর তা নিয়ে মাথা ঘামালেন না।

"অস্ত্র ধর! অস্ত্র ধর! চেঙ্গীজ অক্ষম হয়েছিলেন, আমরা সক্ষম হব।"

অস্ত্রধারীর অভাব হল না। সমরখন্দের সিংহদ্বার দিয়ে বহির্গত হল দুই লক্ষ সৈনিক—দুই লক্ষ মৃত্যুদূত! তাঁর প্রিয় সমরখন্দের বাইরে এসে তৈমুর ঘোড়ার পিঠে বসে মুখ ফিরিয়ে নিজের রাজধানীকে আর একবার দেখবার চেষ্টা করলেন। নীলাকাশকে স্পর্শ করতে চাইছে তার শত শত গম্বুজ ও মিনার। কিন্তু তিনি কিছুই দেখতে পেলেন না।—তাঁর দৃষ্টি হয়ে এসেছে অতি-ক্ষীণ! তাঁর চোখের পাতা এমনি ঝুলে পড়েছে যে হঠাৎ দেখলে মনে হয়, তিনি নিদ্রিত। তৈমুর আবার অশ্ব-চালনা করলেন, কিন্তু কিছু বললেন না মুখে।

নভেম্বর মাস—শীত ফেলছে হু-হু করে শীতল শ্বাস। কিছুদিন যেতে-না-যেতেই আরম্ভ হল বরফ-পাত। তারপরই জাগল তুষারের ঝড়। যে দুই লক্ষ বীর পদভারে পৃথিবীর বুক কাঁপাচ্ছিল তালে তালে, তাদের শীত-জর্জর পাগুলো পড়ল এলিয়ে। নদীর জল দেখা যায় না, সে গায়ে দিয়েছে বরফের চাদর। রাস্তাগুলো অচল হয়ে উঠেছে পুঞ্জ পুঞ্জ তুষারে। কত সৈন্য মরল, কত ঘোড়া মরল।—শিলাপাত, তুষার-পাত; যুবক যোদ্ধাদের দেহ আর বয় না—কিন্তু বৃদ্ধ যোদ্ধা তৈমুর চলেছেন, চলেছেন, চলেছেন! সত্তর বছরের উদ্দাম পথিক!

কোথায় চলেছেন? কার আহ্বানে?···

শেষটা তাঁকেও থামতে হল—ওত্রার শহরে গিয়ে।

সেনাপতিদের ডেকে তিনি বললেন, "ঐ উত্তরগামী পথ—ঐ হচ্ছে চীনের পথ! আপাতত বাকি শীতকালটা এইখানেই কাটিয়ে দেব। কিন্তু মনে রেখো, বসন্তকাল এলেই আবার যাত্রা করতে হবে।"

বসন্তকাল। তৈমুরের আদেশ কেউ ভোলে নি। সৈন্যরা আবার যাত্রা আরম্ভ করলে। ১৪০৫ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাস। উত্তরগামী চীনের পথে।

আবার মেঘধ্বনি করলে কাড়া-নাকাড়া, আবার আকাশে উড়ল পতাকার পর পতাকা, প্রতি রাত্রে আবার বাজতে লাগল বেণু-বীণা—দিগ্বিজয়ী তৈমুরের প্রশস্তি গাইবার জন্যে।

কিন্তু এ হচ্ছে মৃত দিগ্বিজয়ীর প্রশস্তি-গান!

পৃথিবীপতি তৈমুর পৃথিবী ত্যাগ করেছেন ওত্রার নগরে। ভগবানের চাবুক ফিরে গিয়েছে ভগবানের কাছে। তৈমুরের সুসজ্জিত শ্বেত অশ্ব সমতালে পা ফেলে, বৃহৎ বাদশাহী পতাকার ছায়া মেখে অগ্রসর হচ্ছে, কিন্তু আজ তার পৃষ্ঠে নেই সেই বিশ্ববিখ্যাত আরোহী।

শেষ-দৃশ্যে দেখি—

শয্যাশায়ী তৈমুর। পাশে বসে সাম্রাজ্ঞী সরাই মুল্ক খানুম। চারিদিকে দাঁড়িয়ে মন্ত্রী, সেনাপতি, আমীর, ইমান ও চিকিৎসক প্রমুখ।

তৈমুর ক্ষীণ স্বরে বললেন, "আমাকে হারিয়ে তোমরা পাগলের মতন ছুটোছুটি হাহাকার কোরো না। তাহলে সব বিশৃঙ্খল হয়ে যাবে। বীরের মতন তরবারি ধরে থাকো—একতা-বদ্ধ হও। চীনদেশে যাত্রা কর—"

তৈমুরের আদেশ। সেনাদল নিয়ে সেনাপতিরা চীনদেশের দিকে ছুটলেন।

বেশিদূর যেতে হল না। দ্রুতগামী অশ্বে চড়ে দূত এসে দেশের খবর দিলে। এরি মধ্যে তৈমুরের বংশধরদের মধ্যে রাজ্য নিয়ে বিপ্লব উপস্থিত হয়েছে।

চীন আর ভগবানের চাবুকের মার খেলে না। সেনাদল নিয়ে সেনাপতিরা আবার ফিরলেন সমরখন্দের দিকে।

তৈমুর বড় হতে চেয়েছিলেন চেঙ্গীজ খাঁয়ের চেয়ে। কিন্তু চেঙ্গীজ খাঁ কেবল দিগ্বিজয় এবং তৈমুরের চেয়ে বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন করেন নি, সেই সাম্রাজ্যের ভিত্তি এমন সুদৃঢ় করেও গিয়েছিলেন যে, তার আকার ক্রমেই বৃহত্তর হয়ে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল।

আর তৈমুরের দিগ্বিজয়ের ফলে পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়ানো রইল ধ্বংসস্তূপের পর ধ্বংসস্তূপ এবং তাঁর মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাম্রাজ্যও

গেল ধ্বংসের পথে! তৈমুর কেবল ধ্বংস করেই গেলেন, স্থায়ী কিছু সৃষ্টি করে যেতে পারলেন না। তাঁর নাম আজও তাই পৃথিবীর কাছে মহামারীর মতই ভয়ানক।

তৈমুরের পুত্র ও পৌত্ররা স্থানীয় শাসনকর্তার মতন এখানে-ওখানে রাজদণ্ড চালনা করেই তুষ্ট ছিলেন। তাঁরা কেউ তৈমুরের ভয়াবহ তরবারি ধারণ করতে সাহসী হন নি—তাঁরা ছিলেন সাহিত্য ও চারুশিল্পের পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু তৈমুরের মৃত্যুর শতাব্দীকাল পরে তাঁর বংশের মধ্যে আবার নেচে উঠেছিল প্রচণ্ড তাতারের উত্তপ্ত রক্তধারা! এবং দিল্লির সিংহাসনে বসে ভারতে মোগল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ বাবর করলেন তাঁর পূর্বপুরুষ মহান তৈমুরের স্মৃতি-তর্পণ।

এইতেই বোঝা যায়—রক্ত একবার জাগে, আবার ঘুমিয়ে পড়ে, আবার জেগে ওঠে।

●

হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডের 'অমানুষিক মানুষ' ও 'ভগবানের চাবুক' বই দুখানি প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন 'দেবসাহিত্য কুটির' প্রকাশন সংস্থার অন্যতম কর্ণধার শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার। আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।